রকিব হাসান

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম

১৫

ভলিউম ১৫

তিন গোয়েন্দা

৫৫, ৫৬, ৫৭

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
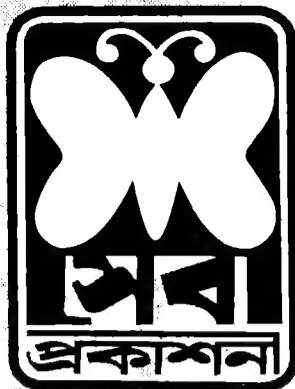
ISBN 984-16-1271-2
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-15
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী

বাহান্ন টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বইঃ

তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্ণদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(ভূটকি বাহিনী, টাইম ট্রাভেল, ভূটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+ভূটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুষ্ট মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-

পুরনো ভূত

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে ছোট্ট মোটরবোট। ছোট একটা দ্বীপের কাছে ভাসছে ওটা। দ্বীপের পশ্চিম ধারে ঠেলে বেরিয়ে থাকা বিশাল এক পাথুরে টিলার কাছে।

'দেখতে একেবারে রক অভ জিব্রালটার,' মন্তব্য করলো রবিন।

'অনেকটা,' কিশোর বললো। 'তবে ছোট, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেক,' মুসা বললো। 'ওটা পাথরের চাঙড় হলে এটা নুড়ি।'

রকি বীচের মাইল দশেক উত্তরে সাগরে মাছ ধরতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। সাগরের নিচে এখানটায় কেল্প-এর জঙ্গল, তার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে প্রচুর ব্যাস ফিশ। লোভনীয় টোপ ফেলেছে শিকারীরা, তবে তাতে শিকারের কোনো আগ্রহ দেখতে পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টায় গোটা তিনেক মাঝারি আকারের মাছ ধরতে পেরেছে।

'বলেছিলাম না জেনোয়া রীফে যেতে,' টোপ বদলাতে বদলাতে বিরক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'এখানকার ছবি কেন যে তুলতে বললেন আংকেল!' রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ডের কথা বললো সে।

'আমিও বুঝলাম না,' টোপটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আবার পানিতে ফেলে বললো রবিন। 'বললো, মঙ্গলবারে, অর্থাৎ আজকে র‍্যাগনারসন রকে মাছ ধরতে এলে যেন সাথে করে ক্যামেরা নিই। ভালো ছবি তুলতে পারলে বেশি দামে কিনে নেবে। কিসের ছবি তুলতে হবে তা-ও বলেনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। হাসলো। বললো, দেখলেই নাকি বুঝতে পারবো কিসের ছবি তুলতে হবে।'

'টাকাটাই হলো বড় কথা, মাছ নয়,' কিশোর বললো। 'ফাণ্ড একেবারে শূন্য এখন আমাদের, টাকা দরকার। ছবি তুলে জোগাড় করতে না পারলে আবার গিয়ে ইয়ার্ডে কাজ করতে হবে।'

'মেরিচাচীর কাজ!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'আর পারবো না। কোমর এখনও নড়াতে পারি না। তার চেয়ে ব্যাস ধরে বাজারে নিয়ে বিক্রি করা অনেক সহজ।'

'এই, দেখ দেখ!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। মাইলখানেক লম্বা র‍্যাগনারসন রক দ্বীপের দিকে দেখালো।

পুব পাশ ঘুরে বেরিয়ে আসছে একটা ভাইকিং শিপ। জাহাজটার পাশে ঝোলানো বর্মগুলোতে বিকেলের রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে। সামনের গলুইয়ে খোদাই করা রয়েছে ভয়ংকর এক ড্রাগনের মাথা। বুনো চেহারার দাড়িওয়ালা যোদ্ধাদের

মাথায় শিংওয়ালা হেলমেট। পরনে ভারি রোমশ জ্যাকেট। হাতে ঝকঝকে তলোয়ার আর খাটো কুড়াল। মাস্তুল আর উঁচু খুঁটিগুলোতে পতাকা উড়ছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে যোদ্ধারা, রণনিনাদ।

'এইটাই!' তুড়ি বাজিয়ে বললো কিশোর।

ক্যামেরা বের করে ফেলেছে রবিন।

এগিয়ে আসছে ভাইকিং শিপ। আরও কাছে এলে দেখা গেল আসলে ওটা একটা মোটরবোট, ভাইকিং জাহাজের মতো করে সাজানো হয়েছে। ছয়-সাতজন যোদ্ধাও ভাইকিং জলদস্যুর সাজে সেজেছে। হাতের তলোয়ারগুলো রাংতা লাগানো কাঠের নকল তলোয়ার। নকল দাড়ি। গোয়েন্দাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নকল অস্ত্র নেড়ে হাসলো ওরা, হুল্লোড় করে উঠলো। দ্বীপের একটা খাঁড়ির দিকে চলে গেল জাহাজটা।

'কি এসব?' অবাক হয়ে বললো মুসা।

'জানি না,' রবিন বললো। 'তবে কয়েকটা ভালো ছবি তুলেছি।'

'আমার মনে হয়...'

কথাটা শেষ করতে পারলো না কিশোর। দ্বীপের পাশ ঘুরে ছুটে এলো আরেকটা বোট।

'ওটা আবার কি?' হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে মুসা।

এই নৌকাটা লম্বা, নিচু, দাঁড়টানা নৌকা আর ক্যানূর মিশ্রণ। বড় বড় তক্তা দিয়ে তৈরি। অস্বাভাবিক চেহারার এই নৌকার চালক ছয়জন মাল্লা। ইনডিয়ানদের পোশাক পরা। মাথায় চামড়ার ফেটি, হরিণের চামড়ার পোশাক।

'ওটা চুমাশ ক্যানূ,' কিশোর বললো। 'চুমাশ ইনডিয়ানদের। সান্তা বারবারায় এখনও বেশ বড় একটা গ্রাম আছে ওদের। মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে। ওরকম নৌকা নিয়েই বেরিয়ে পড়ে বার সাগরে, তিমি আর সীল ধরে। শান্ত স্বভাব। চ্যানেল আইল্যাণ্ডেও থাকে ওদের কেউ কেউ।'

'জানি,' মুসা বললো। 'তবে র‍্যাগনারসন রকে থাকে বলে জানতাম না।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'থাকে না। উপকূলের উজানে বড় বড় দ্বীপগুলোতে কিছু কিছু থাকে।'

'যেখানে খুশি থাকুক, বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার,' রবিন বললো। 'নৌক্যটা সোজা করো জলদি। ঠিকমতো তুলতে পারছি না।'

ক্যানূ আর ইনডিয়ানদের ছবি তুলতে লাগলো সে। বর্শা দুলিয়ে ওরাও গিয়ে নামলো সেই খাঁড়িটাতে, 'জলদস্যুরা' যেটাতে নেমেছে। বেধে গেল কৃত্রিম লড়াই, দ্বীপের দখল নিয়েই বোধহয়। দুই দলের কোমরেই পতাকা গোঁজা। ভাইকিংদের শাদা, ইনডিয়ানদের লাল। টেনে টেনে সেগুলো খুলে নিয়ে দৌড় দিলো উঁচু চূড়াটার দিকে, বর্শার মাথায় বেঁধে বসিয়ে দেবে। যারা আগে বসাতে পারবে তাদেরই জিত।

সাংঘাতিক মজা পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে দুটো দলকেই। রবিন আর মুসা ইনডিয়ানদের পক্ষে, আর কিশোর ভাইকিংদের। একের পর এক

ছবি তুলে যাচ্ছে রবিন। দ্বীপের পশ্চিম ধারে বেধেছে লড়াই। আরও ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরলো সে।

'আরেকটু এগোও,' বললো সে। 'বুঝতে পেরেছি, কেন চেয়েছেন বাবা। পত্রিকায় ফিচার করবে। ভালো চলবে বুঝতে পারছি। সে-জন্যেই বেশি দামে ছবি কিনতে চেয়েছে।'

'তোলো,' কিশোর বললো। 'বেশি করে তোলো। সমস্ত লড়াইটাই ধরে রাখা চাই। ইস্, ভিডিও ক্যামেরা হলে ভালো হতো।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোটটাকে খাঁড়ির কাছে নিয়ে চললো মুসা। ছবি তুলেই চলেছে রবিন। ফিল্ম শেষ হলে আবার ভরে নিচ্ছে। অবশেষে শেষ হলো লড়াই। শাদা পতাকা বসিয়ে দিয়ে চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাইকিংরা। ইনডিয়ানদের লাল পতাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে দলামোচড়া করছে। হাসাহাসি করছে দুটো দলই, একে অন্যের পিঠ চাপড়াচ্ছে।

শাটার টেপা বন্ধ করলো রবিন। দ্বীপের দিকে তাকিয়ে ওরাও হাসছে। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো কিশোর, 'সর্বনাশ! সরো, সরো!'

ঝট করে পেছনে ফিরে তাকালো অন্য দু'জনও।

তৃতীয় আরেকটা নৌকা আসছে ওদেরকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে।

দুই

আস্তে করে ধাক্কা দিলো ছোট মোটরবোটটা। খাঁড়ির অল্প ঢেউয়ে দুলছে। ধাক্কা দিলো আরেকবার।

'ভেসে এসেছে,' মুসা বললো। 'এঞ্জিনও বন্ধ।'

'লোকজনও তো কেউ নেই,' বললো রবিন। 'দেখ, নোঙরের দড়িটা ছেঁড়া।'

দড়ির মাথাটা পরীক্ষা করে দেখলো মুসা। 'না, কেটে দেয়া হয়নি। পাথরে কিংবা জেটির কাঠে ঘষা লেগে লেগে ছিঁড়েছে।'

কিশোর কিছু বলছে না। দ্রুত চোখে পরীক্ষা করছে শূন্য বোটটাকে। আচমকা ঝটকা দিয়ে হাত তুলে দেখালো সেন্টার সীটের কাছের রেইলটা। 'দেখ দেখ, রো-লক আর সীটে কি লেগে আছে!'

অন্য দু'জনও দেখলো। কালচে দাগ লেগে রয়েছে ধূসর ধাতু আর সীটের কিনারে। রঙটা আসলে কালচে লাল, কিন্তু বিকেলের আলোয় শুধু কালো লাগছে।

'খা-খাইছে!' তোতলাতে শুরু করলো মুসা, 'দে-দে-দেখতে···'

'রক্ত!' বলে উঠলো রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হাত-টাত কেটে ফেলেছিলো বোধহয়। কিংবা উপুড় হয়ে পড়ে রো-লকে লেগে কপাল কেটে গিয়েছিলো।'

দড়ি ধরে টেনে নৌকাটাকে কাছে নিয়ে এলো মুসা। ভালো করে দেখার জন্যে। সেন্টার সীটের কাছে একটা ট্যাক্‌ল্ বক্স। এক বালতি পানিতে ভাসছে মরা অ্যানকোভিজ-মাছ ধরার টোপ। খোলা একটা লাঞ্চ বক্সে রয়ে গেছে কিছু

স্যাণ্ডউইচ আর একটা আপেল। একটা বড় লাইফ জ্যাকেট পড়ে আছে, ওদের গায়েও ওরকম জ্যাকেট।

'সবই রয়েছে,' ধীরে ধীরে বললো কিশোর। 'শুধু বড়শিটা বাদে।'

'কিশোর,' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'সীটের তলায় দেখ কি পড়ে আছে। হ্যাট?'

বোটের কিনার ধরে টেনে টেনে সীটটা কাছে নিয়ে এলো মুসা। হ্যাটটা বের করে আনলো। মাছ ধরতে বেরোলে ওরকম জিনিস মাথায় দেয় লোকে। হ্যাটের একপাশে একটা ফুটো, কালচে লাল দাগ লেগে রয়েছে।

'নিশ্চয়ই জখম হয়েছে,' ভারি গলায় বললো কিশোর। 'ব্যাপারটা যখন ঘটেছে নৌকাটা তখন কোথায় ছিলো?'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। 'কোথায় ছিলো তাতে কি এসে যায়?'

রবিন বুঝতে পেরেছে। বললো, 'অনেক কিছু এসে যায়। খোলা সাগরে থাকলে একরকম হবে, ডাঙায় বাঁধা থাকলে আরেক রকম।'

'আর লোকটা তখন একা ছিলো কিনা সেটাও জানা দরকার,' যোগ করলো কিশোর। 'কাছাকাছি অন্য নৌকা থাকলে লোকটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। নৌকাটা দড়ি ছিঁড়ে ভেসে চলে এসেছে হয়তো। অথবা এমনও হতে পারে খোলা সাগরে মাথায় আঘাত পেয়ে পানিতে পড়ে গেছে লোকটা।'

চোখে শঙ্কা ফুটলো দুই সহকারী গোয়েন্দার।

'আর যদি নৌকায় অন্য কেউ থেকে থাকে...'

'খুন করেছে ভাবছো!' রক্ত সরে গেছে মুসার মুখ থেকে।

'এখনই কিছু ভেবে বসাটা ঠিক নয়।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে বোটটার দিকে তাকিয়ে রইলো তিনজনে। তারপর রবিন বললো, 'ভাইকিং কিংবা ইনডিয়ানদের কারো হতে পারে নৌকাটা। হাত-টাত কেটে ফেলেছে হয়তো।'

'হতে পারে। সেটা জানা দরকার,' কিশোর বললো।

নোঙরের দড়িটা চেপে ধরলো সে আর রবিন। নিজেদের বোট স্টার্ট দিলো মুসা। ভেসে আসা নৌকাটাকে টেনে নিয়ে চললো তীরের কাছে। চূড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে এখনও হৈ-চৈ করছে যোদ্ধারা। ছেলেদের আসতে দেখে হাত নাড়লো কেউ কেউ। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো একেকজন একেক কথাঃ

'ছবি তোলো! ছবি তোলো!'

'ওপরে উঠে এসো! পোজ দিচ্ছি!'

'শুধু আমাদের ছবি তোলো! ইনডিয়ানদের!'

'না না, আমাদের! ভাইকিংদের! আমরা জিতেছি!'

'খেতে এসো আমাদের সঙ্গে!'

হেসে মাথা নাড়লো তিন গোয়েন্দা।

'এই বোটটা কি আপনাদের কারো?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না!' জবাব দিলো ভাইকিঙেরা।

'বোটফোট বাদ দাও!' ইনডিয়ানরা বললো। 'ছবি তোলো আমাদের!'

নানারকম পোজ দিয়ে দাঁড়ালো জলদস্যু আর ইনডিয়ানেরা। কেউ বর্শা ঠেকালো শত্রুর বুকে। কারো কুড়াল শত্রুর পিঠে, তলোয়ার শত্রুর গলায় ধরা।

হেসে ক্যামেরা তুলে আরও কয়েকবার শাটার টিপলো রবিন। খাঁড়ির কাছে সৈকতে তাঁবু খাটানো হয়েছে কয়েকটা। বড় একটা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছে কিছু মহিলা আর ছেলেমেয়ে। সাথে করে আনা খাবার বের করছে। পিকনিক করতে এসেছে ওরা। এপাশ থেকে ওপাশে ক্যামেরার চোখ ঘুরিয়ে আনলো রবিন, আরও কিছু ছবি তুললো গাছপালাহীন দ্বীপটার।

'হয়েছে, চলো,' তাড়া দিলো মুসা পশ্চিম দিকে তাকিয়ে। 'বেশি সময় নেই আর। মাছ ধরতে না পারলে ফাণ্ডে টাকা পড়বে না।'

'চলো,' রবিন বললো।

'কিন্তু আগে এই নৌকাটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' কিশোর বললো। 'মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে হয়তো মানুষটার।'

'রেডিওতে পুলিশকে জানিয়ে দিলেই তো হয়,' পরামর্শ দিলো মুসা। 'ওই যে, অনেক বোট ভেড়ানো রয়েছে দ্বীপে। কারো না কারো কাছে রেডিও আছেই।'

'গুড আইডিয়া।' যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'শুনছেন? ওই বোটগুলো আপনাদের?'

মাথা ঝাঁকালো কয়েকজন।

'রেডিও আছে?'

'না,' জবাব দিলো একজন ইনডিয়ান।

'আমারটা ভেঙে গেছে,' জবাব দিলো আরেক ভাইকিং।

শেষ ছবিটা তুলে ক্যামেরা নামালো রবিন, 'ফিল্ম শেষ। আর একটাও তোলা যাবে না। এই কিশোর, কি করবে? মাছ, নাকি তীরে ফেরা?'

'ওসব কিছুই করবে না ও,' তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'নৌকাটা নিয়ে যাবে।'

'তাই তো করা উচিত,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'কে জানে, সাহায্যের জন্যে অস্থির হয়ে আছে হয়তো মানুষটা!'

নৌকার দড়িটা ওদের বোটের সঙ্গে বাঁধলো মুসা। টেনে নিয়ে ফিরে চললো মূল ভূখণ্ডের দিকে। অনেক দূরে চলে এসেছে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। নীল সাগরের বড় বড় ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে ছুটছে বোট। আর কোনো কাজ না পেয়ে মরা ব্যাসগুলো পরিষ্কার করতে বসলো রবিন।

'আর কিছু না হোক,' বললো সে। 'রাতের খাওয়াটা ভালোই জমবে।'

বিকেল চারটের পর রকি বীচ ম্যারিনাতে পৌঁছলো ওরা।

'এই দেখো,' স্টীয়ারিং ধরে রেখেছে এখনও মুসা। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেচার না?'

রবিন আর কিশোর ফিরে তাকালো দেখার জন্যে।

'হ্যাঁ। সাথে আরও লোক রয়েছে,' রবিন বললো।

লম্বা পাবলিক ডকে যেখানে বেশির ভাগ নৌকা বাঁধে লোকে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। ইউনিফর্ম পরা

আরও তিনজন পুলিশ রয়েছে তাঁর সাথে। সবুজ পোশাক পরা একজন মহিলাকে ঘিরে রয়েছে চারজনে। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে মহিলার লাল চুল। চীফ কথা বলছেন তাঁর সাথে। সাগরের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছলেন তিনি।

'কে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো মুসা।

'জানি না,' জবাব দিলো রবিন। 'আমাদের দিকেই তো নজর দেখছি।'

সাগরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে মহিলার। বড় বড় হয়ে গেছে নীল চোখ।

'আমাদের দিকে নয়, বুঝলে,' কিশোর বললো। 'তাকিয়ে রয়েছে খালি নৌকাটার দিকে। চিনতে পেরেছে মনে হয়।'

'হ্যাটটাও চিনতে পারবে বোধহয়,' অনুমান করলো মুসা।

রক্ত মাখা হ্যাটটা টেনে বের করলো সে। দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠলেন মহিলা, যেন ভূত দেখেছেন। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন চীফের বাহুতে।

তিন

ডকের একটা বেঞ্চে মহিলাকে শুইয়ে দিলেন ফ্লেচার। বেঞ্চটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'সরো তো, বাতাস লাগুক,' চীফ বললেন। 'বোটটা কোথায় পেলে?'

খুলে বললো রবিন আর মুসা। ওরা চুপ করতেই চোখ মেললেন মহিলা। উঠে বসে বললেন, 'আমি যাবো ওখানে!'

তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন ফ্লেচার। 'শান্ত হোন, মিসেস বোরিনস। বিশ মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হবো আমরা,' মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

আবার শুয়ে পড়লেন মিসেস বোরিনস। নীল চোখের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে সবার মুখের ওপর।

ছেলেদেরকে জানালেন চীফ, 'কাল রাতে মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন মিস্টার বোরিনস। সকাল সাড়ে আটটায় ফিরে আসার কথা। মাঝে মাঝেই ওরকম রাতে মাছ ধরতে যান তিনি। সাথে করে টর্চ নিয়ে যান, রেডিও নিয়ে যান, তীর থেকে বেশি দূরে যান না। ঠিক সময়ে ফিরে আসেন। কিন্তু আজ সকালে আসেননি। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুলিশকে খবর দিয়েছেন মিসেস বোরিনস। আমরা এখানে এসে দেখলাম মিস্টার বোরিনসের গাড়িটা জায়গামতোই আছে, তালা দেয়া। তাঁর কোনো চিহ্ন নেই। কাল রাতের পর তাঁর বোটটাকেও কেউ দেখেনি।'

ডকে বাঁধা শূন্য বোটটা পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগলেন মিসেস বোরিনস। দ্বিধান্বিত। 'ডেনি ওখানে কি করছিলো? একা এতো দূরে কখনও যেতো না। সাঁতার জানে না। সে-জন্যেই সব সময় সাথে করে লাইফ জ্যাকেট নিয়ে যায়।'

'এতো দূরে সত্যি গিয়েছেন কিনা, জানি না মিসেস বোরিনস,' চীফ বললেন। 'র‍্যাগনারসন রকের দিকে জোরালো স্রোত বয়ে যায় প্রায়ই। হয়তো তাতে পড়েই ভেসে গিয়েছিলো নৌকাটা।'

'তাহলে ডেনি কোথায়?' মহিলার প্রশ্ন।

চুপ হয়ে গেল সবাই। জবাব নেই।

'সেটাই বের করবো আমরা,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন অবশেষে চীফ। 'সহজ কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে এর। হয়তো তীরে চলে এসেছেন তিনি। তারপর কোনোভাবে দড়ি ছিঁড়ে ভেসে চলে যায় ওটা।'

'তাহলে বাড়ি ফিরলো না কেন সে? গাড়িটাই বা নিলো না কেন?'

'সেটাও জানার চেষ্টা করবো। কোস্ট গার্ডকে জানিয়ে দিয়েছি, এতোক্ষণে হয়তো খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। পুলিশও খুঁজবে। তবে তার আগেই হয়তো ফিরে আসবেন তিনি।'

'হয়তো? হয়তো কেন?'

তিনজন পুলিশের দিক থেকে ছেলেদের দিকে ফিরলেন মহিলা, তারপর আবার তাকালেন চীফের দিকে। গোয়েন্দাদের মনে হলো আবার বেহুঁশ হয়ে যাবেন তিনি। 'তার মানে আপনি শিওর হতে পারছেন না। হ্যাটের দাগটা রক্তের, তাই না?'

স্বীকার করলেন চীফ, 'হ্যাঁ।'

'আর বোটে যে লেগে রয়েছে,' পিয়ারে বাঁধা শূন্য বোটটার দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস বোরিনস। 'সেটাও রক্ত!' মাথা নাড়লেন তিনি। 'নিশ্চয় কিছু ঘটেছে...! আমি জানি কি ঘটেছে! ডেনি আর কোনো দিন ফিরবে না!'

কাঁদতে শুরু করলেন শারলি বোরিনস। চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ আর ছেলেরা।

'আশা ছাড়তে নেই মিসেস বোরিনস,' শান্তকণ্ঠে কিশোর বললো। 'তাঁর জ্যাকেটটা বোটে রয়েছে। তার মানে পরেননি। আর যেহেতু পরেননি, ধরে নিতে পারি কোনো কারণে বোট রেখে ডাঙায় নেমেছিলেন।'

'ঠিক,' একমত হয়ে মাথা দোলালো মুসা। 'ওরকম একটা বেঢপ জিনিস পরে তীরে নামতে চায় না কেউ।'

'আর বড়শিটা নিশ্চয় চুরি হয়ে গেছে,' রবিন যোগ করলো।

উঠে বসে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন শারলি। মাথা নাড়লেন। 'সাঁতার জানতো না বটে, কিন্তু মাছ ধরার সময়ও নৌকাতে জ্যাকেট পরতে চাইতো না সে, পারতপক্ষে। ওই হাতের কাছেই রাখতো শুধু, ব্যস। মাছ ধরার সময় রেডিও শুনতো। টু-ওয়ে-রেডিও। জ্যাকেটের পকেটে রাখতো ওটা। পাওনি, তাই না?'

ঢোক গিললো মুসা। 'ইয়ে...ইয়ে...'

মাথা নাড়তে নাড়তে শারলি বললেন, 'যা বলেছি। ডেনি আর কখনও ফিরবে না আমার কাছে। কিছু একটা ঘটেছে। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিলো। তারপর ডুবে গেছে পানিতে।' উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকালেন

একবার করে। 'কতো বার যে বলেছি, সব সময় জ্যাকেটটা পরে থাকতে। শোনেনি। এখন গেছে!'

আবার নীরবতা।

কাশি দিলেন ফ্লেচার। 'আপনি যা-ই বলুন, মিসেস বোরিনস, আমি আশা ছাড়তে পারছি না।'

'হতে পারে,' কিশোর বললো। 'কোনো বোট তাঁকে তুলে নিয়েছে। ওটাতে রেডিও নেই। জেটিতে এলেই খবর মিলবে।'

'র‍্যাগনারসন রকেই নেমে রয়েছেন কিনা কে জানে!' রবিন বললো।

উঠে দাঁড়ালেন শারলি। ডলে সমান করলেন পোশাকের ভাঁজ। পাতলা হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'অনেক ধন্যবাদ, সবাইকে। অযথা সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। আমি জানি, ডেনি আর ফিরে আসবে না। বেশি দূরে যেতো না সে। বলতো, লাইফ জ্যাকেট পরা থাকলে বড়জোর একমাইল দূর থেকে ভাসিয়ে আনতে পারে ঢেউ। নাহ্, সে আর ফিরবে না। চীফ, গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি আমি। বাড়িতেই থাকবো। লাশটা পেলে দয়া করে জানাবেন।'

ধীরে হেঁটে গাড়িটার কাছে এগোলেন শারলি। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে সহকারীদেরকে ইশারা করলেন চীফ। তারপর ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'বোটটা টেনে এনে খুব ভালো করেছো।'

'কি মনে হয়, স্যার?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'কোনো চান্স আছে?'

'মনে হয় মাথায় বাড়ি খেয়ে পানিতেই পড়ে গেছে,' ফ্লেচার বললেন। 'বোটে একা ছিলো। রাতের বেলা...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। 'তবে খোঁজা বাদ দেবো না আমরা। তোমরা কিছু দেখেছো? বোরিনসের কি হয়েছে বুঝতে পেরেছো?'

'কিছুই না।'

'হুঁ। কিছু জানলে জানাবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো তিন গোয়েন্দা। গাড়ির দিকে এগোলেন চীফ।

শারলি আর পুলিশ চলে যাওয়ার পর নিজেদের বোটটাকে শক্ত করে বেঁধে সাইকেল নিতে চললো তিন গোয়েন্দা। বন্দরের বাইক র‍্যাকে বাঁধা রয়েছে ওগুলো।

'এই! এই ছেলেরা!' ডাক শোনা গেল।

ছোট একটা মোটরবোট এসে ভিড়েছে ডকে। হাত নেড়ে ডাকছে র‍্যাগনারসন রকের একজন ভাইকিং। 'শোনো, কথা আছে।'

বোট বেঁধে তীরে নেমে এলো লোকটা। বেশি লম্বা নয়। মোটা রোমশ টিউনিকে অনেক বেশি মোটা লাগছে তাকে। হলুদ রঙের নকল দাড়ি। মাথায় শিংওয়ালা হেলমেট। লম্বা নোজ গার্ডে মুখের বেশির ভাগটাই ঢাকা পড়েছে। শুধু দেখা যাচ্ছে নীল চোখ।

'তোমরাই ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলে না?'

'কেন? কিছু হয়েছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রবিন।

শীতল কণ্ঠে কিশোর বললো, 'ছবি তোলার অধিকার সবারই রয়েছে।'

'আরে, আরে, রেগে যাচ্ছো কেন? আমি ওগুলো কিনতে চাই। যতগুলো তুলেছো, সঅব।'

'এখনও ডেভেলপই করা হয়নি,' রবিন বললো। 'তাছাড়া বাবা বলে দিয়েছেন তোলার জন্যে। তার কাছেই বেচবো।'

'ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে যাবো। ডেভেলপ করো। আসলে মাত্র দুটো ছবি আমার দরকার। ওই দুটোই বেছে নেবো।'

'রবিনের আব্বা রাজি হবেন বলে মনে হয় না,' কিশোর বললো। 'পত্রিকার লোক তিনি। ছাপার আগেই ওগুলো কারো হাতে পড়ে যাক, এটা পছন্দ করবেন না তিনি। তবে তিনি কোনো ছবি বাতিল করলে তখন দিতে পারবো আপনাকে।'

'হ্যাঁ,' রবিন বললো। 'কাল আসবেন। দেখি, কি করতে পারি। আপনার নাম?'

'ডন র‍্যাগনারসন,' জানালো লোকটা। 'ভালো দাম দেবো। দিয়ে দাও ছবিগুলো।'

'সরি, মিস্টার র‍্যাগনারসন। কাল আসবেন।'

জ্বলে উঠলো লোকটার চোখ। হুমকির ভঙ্গিতে এক পা এগোলো।
'এখুনি দরকার আমার!' কর্কশ হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। 'ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও, নইলে...'

পিছাতে শুরু করলো ছেলেরা। টায়ার ঘষার শব্দ হলো। ডেকে বললো একটা কণ্ঠ, 'এই কিশোর, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বোটের কোনো জিনিসে হাত দাওনি তো?'

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে কথা বলছেন চীফ ফ্লেচার। ফিরে এসেছেন।

'শুধু হ্যাটটা, স্যার,' দ্রুত পুলিশের গাড়ির কাছে চলে এলো কিশোর। তার সাথে সাথে এলো রবিন আর মুসা।

কি কি জিনিস ছিলো বোটে, আরেকবার বললো ওরা। মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন চীফ। ফিরে তাকালো ওরা। ডন র‍্যাগনারসনকে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি ওর বোটটাও নেই। তাড়াতাড়ি সাইকেলের দিকে চললো তিন গোয়েন্দা, আবার কোনো বাধা আসার আগেই।

'পুলিশকে পছন্দ করে না,' মুসা বললো।

'তাই!' যোগ করলো রবিন। 'লোকটা আমার ঠিকানাটাও নেয়ার জন্যে দাঁড়ালো না। ছবি নেবে কি করে?'

'ফিল্মগুলো হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবো আমি,' কিশোর বললো। 'কাল সকাল সকাল এসে ডেভেলপ করে নেবে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, 'রেডিওটা খোলা রাখবে। মিস্টার বোরিনসের কোনো খোঁজ পেলে খবরে বলতে পারে।'

চার

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বাবাকে ছবিগুলোর কথা জানালো রবিন। আগের রাতে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছেন মিস্টার মিলফোর্ড, তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তিনি বললেন, 'বোটটা তাহলে কাল তোমরাই এনেছো।'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'মিস্টার বোরিনসকে পাওয়া গেছে?'

'কি জানি। এটা ছাপা হয়েছে কাল রাতে। এতোক্ষণে পেয়েছে কিনা...,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা রেডিওটা অন করে দিলেন মিলফোর্ড। 'লোকাল নিউজের সময় হয়েছে।'

ন্যাশনাল নিউজ পড়া সবে শেষ করেছে সংবাদ পাঠক। একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা বলে স্থানীয় সংবাদ পড়তে আরম্ভ করলো। শুরুতেই মিস্টার বোরিনসের খবরঃ 'রকি বীচের গাড়ি ব্যবসায়ী মিস্টার ডেনমার বোরিনসের খোঁজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে কোস্ট গার্ড। কাল বিকেলে র‍্যাগনারসন রকের কাছে তাঁর বোটটা পেয়েছে রকি বীচেরই তিন কিশোর, রবিন মিলফোর্ড, মুসা আমান আর কিশোর পাশা। বোরিনসের স্ত্রী জানিয়েছেন তাঁর স্বামী সাঁতার জানেন না। কাজেই হতভাগ্য লোকটার বেঁচে থাকার আশা খুব কম।'

'বেচারি!' শারলির জন্যে আফসোস করলেন রবিনের আম্মা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।

'হুঁ!' বলে ছেলের দিকে ফিরলেন মিলফোর্ড। 'কিছু জানোটানো নাকি?'

'তেমন কিছু না।' আগের দিনের সমস্ত ঘটনা খুলে বললো রবিন। ডন র‍্যাগনারসন যে হুমকি দিয়েছে সেই কথাও। সব শেষে বললো, 'আমার মনে হয়, ছবিগুলো ভালো উঠেছে।'

'তাহলে ভালো। চমৎকার একটা ফিচার করা যাবে।'

'ওসব দিয়ে আর কি ফিচার হবে?' কিছুটা অবাকই হলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'ও তো কয়েকটা বুড়ো খোকার পাগলামি।'

'হ্যাঁ, বাবা, আমারও অবাক লাগছে। এ-দিয়ে আর কি ফিচার হবে?'

'হবে। বিশেষত্ব আছে এর।' দুই চুমুকে অবশিষ্ট চাটুকু শেষ করে কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখলেন মিলফোর্ড। 'ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে আরেকটা বিচিত্র ঘটনা। আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে এই অঞ্চলে সোনা খোঁজা নিয়ে যখন মাতামাতি চলছে, তখন ইলিনয় থেকে এসেছিলো নাট র‍্যাগনারসন। জুতোর কারিগর ছিলো সে। খনির লোকদের কাছে জুতো বিক্রি করে প্রচুর টাকা কামিয়েছিলো। অনেক সোনার খনির মালিকও তার মতো ধনী ছিলো না। পরের বছরই স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে জাহাজে চড়লো সে, পুব অঞ্চল থেকে গিয়ে তার পরিবারকে নিয়ে আসার জন্যে। জাহাজটাতে যাত্রী ছিলো, আর ছিলো প্রচুর স্বর্ণ। দ্বিতীয় রাতেই শয়তানী করলো ক্যাপ্টেন। জাহাজের সী কক খুলে দিয়ে, সমস্ত

সোনা একটা নৌকায় তুলে নিয়ে পালালো। বেশির ভাগ যাত্রীই আতঙ্কিত হয়ে মারা পড়লো। কিন্তু র‍্যাগনারসন মাথা গরম করেনি। একটা হ্যাচ কভার খুলে নিয়ে সেটা ধরে সাঁতরে চলে এলো ছোট একটা দ্বীপে। সেখানে একটা চুমাশ ক্যানূ পেয়ে গেল। তাতে করে তীরে ফিরলো। যে দ্বীপটাতে প্রথমে উঠেছিলো সে সেটাই র‍্যাগনারসন রক হয়ে গেল, তার নামে নাম। তারপর থেকেই প্রতি পাঁচ বছর পর পর ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতো র‍্যাগনারসন আর তার বন্ধুরা। ভাইকিং আর ইনডিয়ান সেজে লড়াই করতো। র‍্যাগনারসনের বেঁচে যাওয়াটাকে সেলিব্রেট করতো এভাবে। তোমাদের ইস্কুলের প্রিনসিপাল ডেভিড র‍্যাগনারসন এসব কথা বলেছেন আমাকে।'

'মিস্টার ডেভিড?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'ওই লড়াইয়ে তিনিও গিয়েছিলেন নাকি?'

'নিশ্চয় গিয়েছিলেন। তবে লড়াই-টড়াইগুলো কম বয়েসীদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন, আমার যা মনে হয়। ওই অংশ নেয়া পর্যন্তই। পারিবারিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ বেশি।'

'চোরাই সোনাগুলোর কি হলো?' জানতে চাইলেন রবিনের আম্মা।

'হ্যাঁ, ঠিক, কি হলো? আর নাটই বা কতোদিন দ্বীপে ছিলো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

হাত নাড়লেন মিলফোর্ড। হাসলেন। 'ওসব জানি না। যা যা জানি, বলেছি। আমাদের একজন রিপোর্টার ওসব নিয়ে গবেষণা করছে এখন। খোঁজখবর চালাচ্ছে। কাল নাগাদ ফিচারটা বের করতে পারবো আশা করি।'

দুধের গেলাসটা খালি করলো রবিন। 'ফিল্মগুলো কিশোরের কাছে। যাই, ডেভেলপ করে ফেলি। তারপর...'

হাত তুললেন আম্মা, 'আরে, ভুলে বসে আছো দেখছি! জানালার কাঁচগুলো মোছার কথা না আজ? আর কদিন ফেলে রাখবে?'

'মা, ছবিগুলো বাবার খুব দরকার...'

'দেখ, আগের কাজ আগে। কালই যদি শেষ করে ফেলতে আজকে অন্য কাজ করতে পারতে। কাল করলে না কেন? কাজ ফেলে রাখা একদম পছন্দ করি না আমি।'

'মা, শুধু আজকের দিনটা...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করবো,' সমাধান করে দিলেন মিলফোর্ড। 'প্রেসের ডার্করুমে ডেভেলপ করা যাবে। সকালটা আজ বাড়িতেই কাটাবো, কাজ আছে। দুপুরের আগে বেরোচ্ছি না। জানালা মোছা শেষ করে ততোক্ষণে ওগুলো কিশোরের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারবে তুমি। যাও, লেগে যাও। আমিও আসছি, সাহায্য করবো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হলো রবিনকে। তবে আগে হেডকোয়ার্টারে কিশোরকে টেলিফোন করলো। রবিনের 'দুঃসংবাদ' শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো গোয়েন্দাপ্রধান, রিসিভারেই সেটা শুনতে পেলো তিন গোয়েন্দার নথি-গবেষক।

'মুসাকেও আটকে দেয়া হয়েছে,' কিশোর জানালো। 'ঘর পরিষ্কারের কাজে। আসতে দেরি হবে। কাজ সেরে যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো তুমি।'

দ্রুত হাত চালালো রবিন। কিন্তু জানালা অনেক। এতো তাড়াহুড়ো করেও এগারোটার আগে কিছুতেই শেষ করতে পারলো না। সাইকেল নিয়ে বেরোনোর আগে বাবা ডেকে বললেন, 'রবিন, জলদি আসবে। এক ঘন্টার মধ্যেই বেরোবো।'

'আচ্ছা।'

ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়েই সামনে পড়লো একটা শাদা ঝরঝরে পিকআপ ট্রাক। ঠিক তাদের বাড়ির সামনেই পার্ক করা। অবাক হলো। কারণ এভাবে বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে না কেউ। মোড়ের কাছে গিয়ে কি ভেবে ফিরে তাকাতেই দেখলো মুখ ঘুরিয়ে তার পিছু নিয়েছে ট্রাকটা।

দ্রুত প্যাডাল করে আরও কয়েকটা মোড় ঘুরলো সে। ইতিমধ্যে আর একবার ফিরে তাকিয়েছিলো। পিছে লেগে রয়েছে ট্রাকটা। লাইসেন্স নম্বরটা দেখতে চেয়েছে, পারেনি। সামনে প্লেট লাগানো নেই।

আরও গতি বাড়ালো সে। একটু পর পরই কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো। লেগেই রয়েছে ট্রাক। সন্দেহ নেই, অকেই অনুসরণ করছে।

ভাবছে রবিন। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাকে ওখানে ঢুকতে দেখলে ঠিকানাটা জেনে যাবে ট্রাক চালক। হয়তো সেটাই জানতে চায় লোকটা। নাহ্, ইয়ার্ডে ঢোকা চলবে না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে।

ইয়ার্ড থেকে সামান্য দূরে একটা গ্যারেজ আছে। টেলিফোন আছে। ওখান থেকে হেডকোয়ার্টারে ফোন করলো সে।

সাড়া নেই।

কয়েকবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে গ্যারেজ থেকে বেরোলো রবিন। রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো। ট্রাকটা নেই। তাহলে কি তাকে অনুসরণ করেনি? কাকতালীয় ঘটনা?

সাইকেল নিয়ে চললো আবার সে। ইয়ার্ডে ঢোকার আগে আরেকবার তাকালো পথের সামনে পেছনে। নেই ট্রাকটা। তার পরেও বাড়তি সতর্কতার জন্যে গেট দিয়ে ঢুকলো না সে। ঘুরে চলে এলো বেড়ার কাছে। লাল কুকুর চারের কাছে। তিন গোয়েন্দার গোপন এই প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। সাইকেল রেখে হেড-কোয়ার্টারে ঢুকে দেখতে পেলো কিশোর আর মুসা বসে আছে।

'একটু আগে কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'ফোন করেছিলাম। ধরোনি।'

'মেরিচাচীর পাল্লায় পড়েছিল্যম,' নাকমুখ কুঁচকে জবাব দিলো মুসা। 'আমাদের দেখেই ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। আজ কার মুখ দেখে যে ঘুম ভেঙেছিলো!'

'কি ব্যাপার, রবিন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'ফোন করেছিলে কেন?'

শাদা পিকআপটার কথা জানালো রবিন।

ট্রে কে কে ছিলো দেখোনি?' মুসার প্রশ্ন।

'না। ড্রাইভারের চেহারা দেখতে পাইনি।'

'তোমার পিছুই নিয়েছিলো? শিওর?' ভুরু কোঁচকালো কিশোর।

'শিওর না। হয়তো পুরো ব্যাপারটাই কাকতালীয়।'

'হয়তো। যাই হোক, হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। শাদা ঝরঝরে পিকআপ দেখলেই সতর্ক হতে হবে। তো, ফিল্মগুলো?'

'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম!' চিৎকার করে উঠলো রবিন। ঘড়ি দেখলো। সাড়ে এগারোটা। 'আর মাত্র আধ ঘণ্টা আছে!'

'আধ ঘণ্টায় দুটো রোল ডেভেলপ করা যাবে না,' মুসা বললো।

'দরকার নেই। বাবা বলেছে ফিল্মগুলো দিয়ে দিতে। প্রেসের ডার্করুমে করিয়ে নেবে।'

'তারও দরকার নেই,' মুচকি হাসলো কিশোর। 'সকালে আমিই করে ফেলেছি। এতোক্ষণে বোধহয় শুকিয়ে গেছে। নিয়ে যেতে পারো।'

'কোথায়?'

উঠে গেল কিশোর। ডার্করুম থেকে একটা বাদামী ম্যানিলা এনভেলপ নিয়ে এলো। রবিনের হাতে দিলো।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রবিন। 'দাঁড়াও, দিয়েই চলে আসছি।'

আবার লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। সাইকেল চালিয়ে উঠে এলো মেইন রোডে। বাঁয়ে ঘুরতেই কানে এলো এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ। পেছনে তাকিয়েই চমকে গেল রবিন। সেই শাদা পিকআপ ট্রাকটা।

পাঁচ

পলকের জন্যে চোখে পড়লো সামনের সীটে দুটো মাথা।

জোরে জোরে প্যাডাল করে চললো রবিন। কিন্তু কাছে চলে এলো ট্রাক। এঞ্জিনের সঙ্গে পারার কথা নয় সাইকেল নিয়ে। আরেকবার মুখ ঘোরালো অন্তত একজন মানুষের চেহারা দেখার জন্যে। চোখে পড়লো শুধু রেডিয়েটরের গ্রিল।

সাইকেলের সঙ্গে একই গতিতে পিছে পিছে চললো ট্রাক। যেন কোনো কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে লোকগুলো।

সামনের ব্লকে বাড়িঘর নেই। শুধু বাগান। আর আরেক পাশে একটা পার্ক। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় রয়েছে। রবিন বুঝে গেল এই জায়গাটায় আসারই অপেক্ষায় রয়েছে লোকগুলো।

ব্লকটার কাছে আসতে না আসতেই পেছন থেকে সামনে চলে এলো ট্রাকটা। তার পথরোধ করলো।

ব্রেক কষলো রবিন। দেখলো, ক্যালিফোর্নিয়ার লাইসেন্স প্লেট। প্রথম দুটো নম্বর শুধু মনে রাখতে পারলো, ৫৬। পরক্ষণেই মোড় নিয়ে নেমে পড়লো পার্কের রাস্তায়। পেছনে ফিরে তাকালো একবার। কেউ অনুসরণ করছে না।

পথটা মোড় নিয়ে মেইন রোডের সমান্তরালে চলে গেছে। ওটা দিয়ে এগোলে আবার ইয়ার্ডের দিকেই যেতে হবে। তাই করলো রবিন। ফিরে তাকিয়ে হাসলো সে। উল্টো দিকে, অর্থাৎ ভুল দিকে মোড় নিয়েছে শাদা ট্রাক।

যখন নিশ্চিত হলো ভুল করে আরেক দিকে চলে গেছে ট্রাকটা, তখন আবার ফিরলো বাড়ির দিকে। খানিক দূর এগোতে না এগোতেই পেছনে আবার শোনা গেল ঝরঝরে বডির ঝনঝন শব্দ। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, আবার পেছনে লেগেছে শাদা পিকআপ। এবার আর সামনে এগোলো না। পার্ক থেকে সরতে সরতে রবিনকে নামিয়ে দিলো রাস্তার পাশের মাটিতে। আরও সরলো। পাশে খাদ। সাইকেল থেকে নামা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেটাই করতে যাচ্ছিলো রবিন, আরও সরে এলো ট্রাক। পাশ থেকে বডির সঙ্গে সামান্য ছোঁয়া লাগলো হ্যাণ্ডেলের। তাতেই যথেষ্ট। সাইকেল নিয়ে খাদে পড়ে গেল সে।

পড়ার আগে হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়েছিলো। ফলে সাইকেলটা সরে গেল তার কাছ থেকে। গড়িয়ে পড়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো সে। কনুই আর হাঁটু ছড়ে গেছে। শার্ট প্যান্ট ছেঁড়া। সারা শরীরে মাটি। কিন্তু সেসব দেখার জন্যে থামলো না সে। লম্বা খাদের মধ্যে দিয়েই দৌড় দিলো কাছের বাড়িটার দিকে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে।

পেছনে আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালো সে। আধ ব্লক দূরে খাদের একটু ওপরে ঢালের মধ্যে শুয়ে আছে তার সাইকেলটা। কেউ তাড়া করেনি তাকে। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। পিকআপটা চলে গেছে।

প্রথমে অবাক হলো। তারপরেই হাত চলে গেল পকেটে। হাতে কিছু ঠেকলো না। খামটা কোথায়?

তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সাইকেলটার কাছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খামটা পেলো না। খাদে পড়ার সময়ই নিশ্চয় বুকপকেট থেকে খামটা পড়ে গিয়েছিলো।

খোয়া গেছে নিগেটিভসহ ডেভেলপ করা ছবিগুলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

সাইকেলটা রাস্তায় তুলে এনে আবার ইয়ার্ডে ফিরে চললো সে। ওখানে যাওয়াটাই এখন একমাত্র করণীয় কাজ মনে হলো তার। এবার আর গোপন প্রবেশপথের কাছে গেল না, সোজা ঢুকে পড়লো মেইন গেট দিয়ে। ওয়ার্ক শপে সাইকেল রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে পড়লো হেডকোয়ার্টারে।

তার অবস্থা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'খাইছে! কি হয়েছে, রবিন?'

কিশোর বললো, ট্রাকের লোকগুলো তোমার ওপর হামলা চালিয়েছিলো!'

'সাইকেল সহ খাদে ফেলে দিয়েছিলো আমাকে,' রবিন বললো। 'খামটা পড়ে গিয়েছিলো পকেট থেকে। নিয়ে গেছে।'

'ওদেরকে দেখেছো?'

'হায় হায়রে! গেল আমাদের ছবি বেচা টাকা,' কপাল চাপড়ালো মুসা।

'কি হয়েছে, সব খুলে বল তো।'

কি কি ঘটেছে সব বললো রবিন। শেষে বললো, 'ছবিগুলো এখন ফেরত আনতে হবে।'

'কি করে? কোনো উপায়ই তো দেখছি না!' মুসা বললো।

'কি যে করবো এখন!' ঘড়ি দেখলো রবিন। গুঙিয়ে উঠলো। 'আধ ঘণ্টাও নেই আর। বাবা চলে যাবে অফিসে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তা যাবেন। তুমি আগে ছবিগুলো পৌঁছে দাও তোমার বাবাকে। তারপর চোর ধরার কথা আলোচনা করবো আমরা।'

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো রবিন আর মুসা।

'কি করে দেবে!' মুসা বললো।

'সব তো নিয়ে গেছে!' বললো রবিন।

'না,' হাসলো কিশোর। 'সারাটা সকাল কিছু করার ছিলো না। বসে না থেকে ছবি ডেভেলপ করেছি তখনও ভেজা ছিলো ওগুলো, সে-জন্যেই শুধু নিগেটিভ-গুলো দিয়েছিলাম। সব ছবি না দেয়ার আরেকটা কারণ ছিলো। ওই শাদা পিকআপ। যখন বললে তখনই কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো। ভাবলাম, তুমি বেরোলেই যদি পিছু লাগে? যদি ছবিই ওদের উদ্দেশ্য হয়? এখন দেখছি ঠিকই করেছি না দিয়ে। তাহলে সব যেতো।'

আবার ডার্করুমে গিয়ে একগাদা ছবি নিয়ে বেরোলো গোয়েন্দা-প্রধান। এখনও ভেজা। শিস দিয়ে উঠলো মুসা। উত্তেজনায় টুল থেকে লাফিয়ে উঠলো রবিন।

'দাও, দাও, দিয়ে আসি!' হাত বাড়ালো সে।

'এক মিনিট,' বাধা দিলো মুসা। 'চোরেরা কেন এতো করে চাইছে এগুলো দেখা দরকার।'

ছবিগুলো কিশোরের হাত থেকে নিয়ে ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে দিলো সে। দু'দিক থেকে ঝুঁকে এলো কিশোর আর রবিন। ছবিতে ভরে গেছে ডেস্কের ওপরটা।

'নাহ্, তেমন কিছুই তো দেখছি না,' রবিন বললো। 'স্বাভাবিক সব কিছু। তোলার সময় যেমন দেখেছিলাম।'

'জলদস্যু এবং ইনডিয়ানদের লড়াই,' মুসা বললো। 'আর পিকনিক। ব্যস।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে, চোরেরা নিশ্চয় স্পেশাল কিছু আছে ভাবছে। এবং সেটা অন্য কাউকে দেখতে দিতে চায় না।'

'কি আর দেখবে,' রসিকতার সুরে বললো মুসা। 'কি কি দিয়ে লাঞ্চ করেছে লোকে, সেসব আর কি।'

তার কথায় কান দিলো না কেউ। রবিন বললো, 'হয়তো স্যুভনির হিসেবে রাখতে চায়।'

'মানুষকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিয়ে?' কিশোর মানতে পারলো না। 'অন্য

কোনো কারণ আছে।'

'এই, ডন র‍্যাগনারসন মা তো?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'একথা আগেই মনে হয়েছে আমার। রবিন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার আব্বা বসে আছেন। তাঁকে বলবে আরেক সেট ছবি যাতে তৈরি করে দেন আমাদেরকে। তাহলে বসে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখতে পারবো।'

'বলবো। আজ রাতের মধ্যেই পেয়ে যাবো আশা করি।'

'চলো, আমি আর মুসাও যাই। আর রিস্ক নেয়া যায় না। তিনজন থাকলে সুবিধে হবে।'

পথে আর কোনো অঘটন ঘটলো না। সাইকেল নিয়ে নিরাপদেই রবিনদের বাড়ি চলে এলো তিনজনে। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি বের করে ফেলেছেন মিলফোর্ড। রবিনকে বললেন, 'এতো দেরি করলে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।'

খামটা বের করে দিয়ে বললো, 'একেবারে প্রিন্ট করেই নিয়ে এসেছি, আংকেল। তবে সেটা করার জন্যে দেরি হয়নি।'

'তাহলে?'

দু'জন লোক যে আক্রমণ করে নিগেটিভ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, সেকথা বাবাকে বললো রবিন। আরেক সেট ছবি তৈরি করে দেয়ার অনুরোধ করলো।

'তা দেয়া যাবে,' মিলফোর্ড বললেন।

'খুব ভালো হয় তাহলে,' কিশোর বললো। 'কেন ওগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ওরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো লোকগুলো, দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো।'

হাসলেন মিলফোর্ড। 'দেখো। তোমাদের তো সব কিছুতেই রহস্য খোঁজার নেশা। যাই, দেরি হয়ে গেল।'

তিনি চলে যাওয়ার পর দুই সহকারীর দিকে ফিরলো কিশোর। 'এক কাজ করতে পারি। পয়সা তো কিছু ইনকাম হলো। কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিতে পারি। সেই সাথে আলোচনা।'

'কিসের?' মুসার প্রশ্ন।

'ভুলে গেলে? অবশ্যই ডন র‍্যাগনারসনের।'

ছয়

রকি বীচেই সৈকতের ধারে ডনের বাড়ি। ঠিকানাটা জানতে অসুবিধে হয়নি তিন গোয়েন্দার। টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘাঁটতেই পেয়ে গেছে। অযত্ন অবহেলায় রং চটে গেছে বাড়িটার। বাগান মানে আগাছা আর ঝোপঝাড়।

'বাগানটাও সাফ রাখতে পারেনি লোকটা,' রবিন বললো। 'একেবারেই অলস মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' বাড়ির পেছন দিকটা দেখিয়ে কিশোর বললো। 'বোধহয় ওটা গ্যারেজ। দেখা যাক, পিকআপটা আছে কিনা।'

পাশের বাড়িটার সামনে সাইকেলগুলো রেখে ডনের সীমানায় ঢুকলো ওরা। ঘুরে চলে এলো পেছনে। গ্যারেজের অবস্থা কটেজের চেয়েও খারাপ। কয়েকটা তক্তা ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেখানে চোখ রেখে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'আছে একটা। একেবারে ঝরঝরে।'

কিশোরও দেখলো। 'রবিন, দেখ-তো এটাই নাকি?'

রবিন দেখে বললো, 'নাহ্, এটা তো বাদামী। ওটা শাদা। লাইসেন্স নম্বরও মেলে না।'

'পিকআপ চালাতেই পছন্দ করে,' মুসা অনুমান করলো। 'এটা আরেকটা। দুটোই তার।'

'আরেকটা গাড়ি রাখার জায়গা অবশ্য আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর। 'অন্য কাউকে পাঠিয়েছে হয়তো নিগেটিভগুলো চুরি করতে।'

ঘুরে আবার সামনে চলে এলো ওরা। পুরনো সিঁড়ি বেয়ে উঠলো দেবে যাওয়া বারান্দায়। ভেতরে দুটো জানালার কাঁচে পুরু হয়ে ধুলোময়লা লেগে রয়েছে। পর্দাগুলোতে দাগ। কলিং বেলের বোতাম টিপলো কিশোর। বাজলো না।

'গেছে নষ্ট হয়ে,' হাসলো রবিন। 'আর সব জিনিসের মতোই।'

'অবাক হইনি আমি,' কিশোর বললো। টোকা দিলো দরজায়। তারপর থাবা। সাড়া নেই। 'বাড়িতে নেই কেউ। আবার আসতে হবে আমাদের।'

জানালার ময়লা শার্সির ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে মুসা। 'কিশোর, কি যেন নড়ছে!'

'তাই?' কিশোরও এসে চোখ রাখলো জানালায়।

ম্লান আলো। বাইরের চেয়ে ভেতরের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। ভাঙাচোরা আসবাবপত্র। দেয়ালের অবস্থা করুণ।

'দেখছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

সত্যি, কি যেন নড়ছে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে। মানুষ না কি বোঝা যাচ্ছে না।

ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'এই, বাদ দাও। পুরনো বাড়ি, আল্লাহই জানে…চলো, হ্যামবার্গারের জন্যে পেট জ্বলছে আমার।'

'কে?' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। 'ডন র‍্যাগনারসন?'

'কোনো ধরনের ইউনিফর্ম পরা,' মুসা বললো। 'যে-ই হোক!'

'ডনের চেহারা দেখিনি আমরা,' কিশোর বললো। 'আরেকবার দেখলেও চিনতে পারবো না। জলদস্যুর পোশাকে ছিলো সেদিন, মনে আছে?'

'তা তো আছেই। এই লোকটা ভাইকিং নয়,' মুসা বললো। 'নড়ছে, অথচ দরজা খুলতে আসে না কেন?'

'শুনতে পায়নি হয়তো,' বললো রবিন। 'মনে হয় কাজে ব্যস্ত।'

'কিংবা হয়তো খোলার ইচ্ছে নেই। ভূত-কূত…'

মুসার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবিন বললো, 'জায়গাটা অদ্ভুত! গা ছমছম করে!'

'তোমাকেও মুসার রোগে ধরলো নাকি?' বিরক্ত হয়ে বললো কিশোর। 'চলো, পেছন দিকে ঢোকার পথ আছে নাকি দেখি।'

পেছনের জানালাগুলো সব তক্তা লাগিয়ে বন্ধ করা। ঢোকার কোনো পথ নেই।

'এবার?' ভুরু নাচালো মুসা।

বন্ধ জানালাগুলোর ওপর থেকে দরজার ওপর দৃষ্টি সরালো কিশোর। 'কিল মারতে শুরু করিগে। জোরে জোরে চেঁচাবো, যতোক্ষণ না খোলে।'

ঢোক গিললো মুসা। 'তার সঙ্গে কথা বলার কি সত্যি দরকার আছে?'

'আছে।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। তর্ক করে লাভ হবে না।

চুপ হয়ে গেল মুসা।

দরজায় কিল আর থাবা মারতে মারতে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো তিনজনে। ডন র‍্যাগনারসনের নাম ধরে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। কড়া চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলো, 'এই, থামো! হচ্ছেটা কি?'

রোগা-পাতলা একজন মানুষ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। ফ্যাকাসে নীল চোখ। সোনালি কাজ করা নীল রঙের টুপি মাথায়, নাবিকেরা যে রকম পরে। আঁটো নীল কোট গায়ে, বোতামগুলো পিতলের। পরনে নীল ট্রাউজার। গোড়ালি ঢাকা কালো বুট পায়ে। শাদা দস্তানা পরা হাতে ধরে রেখেছে একটা পিতলের টেলিস্কোপ।

শান্ত ভদ্র গলায় কিশোর বললো, 'মিস্টার ডন র‍্যাগনারসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।'

'এখানে নেই।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো লোকটা।

তাড়াতাড়ি রবিন বললো, 'তাঁর আরেকটা পিকআপ ট্রাক আছে কিনা জানতে এসেছিলাম!'

'শাদা ট্রাক,' যোগ করলো মুসা।

ঘুরে তাকানোরও প্রয়োজন মনে করলো না সে। জবাব দিয়ে দিলো, 'নেই।'

'স্যার, সম্ভবত ডন র‍্যাগনারসন কতগুলো মূল্যবান ফটো চুরি করেছে,' যে করেই হোক লোকটাকে দিয়ে কথা বলাতে চাইছে কিশোর। 'করে থাকলে বেশ ভালো বিপদেই পড়বে।'

থমকে দাঁড়ালো নীল ইউনিফর্ম পরা লোকটা। আস্তে করে ঘুরলো মাথাটা। কাঁধের ওপর দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এসব কাহিনী অন্যের নামে যতো খুশি গিয়ে বলো, ডন র‍্যাগনারসনের নামে নয়। সে সত্যিকারের একজন ভাইকিং, ছিঁচকে চোর নয়। ভাগো জলদি। নইলে মাস্তুলে বেঁধে চাবকে চামড়া তুলবো।'

ফিরে এসে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলো আবার সে। প্রথমে কেন খুলে রেখে গিয়েছিলো কে জানে। হয়তো চমকে গেছে, কিংবা তাড়াহুড়ো। অথবা দুটোই হতে পারে।

বন্ধ পাল্লার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকালো মুসা, 'একেবারেই অসামাজিক।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু কেন এরকম আচরণ করলো? আমরা তো খারাপ কিছু বলিনি।'

'এবার কি করবো? ডন র‍্যাগনারসনের জন্যে অপেক্ষা করবো? কতোক্ষণ লাগবে আসতে কে জানে।'

'আমার মনে হয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'ডন র‍্যাগনারসন আর র‍্যাগনারসন রক নিয়ে তদন্ত করার সময় এসেছে। সেকেণ্ড, চেম্বার অভ কমার্স আর স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর অফিসে গিয়ে খোঁজখবর চালাও। র‍্যাগনারসনদের পারিবারিক ইতিহাস জানার চেষ্টা করো।'

'আমি?' রবিন জানতে চাইলো।

'তুমি যাও হিসটোরিক্যাল মিউজিয়মে।'

'আর তুমি?'

'আমি? লাইব্রেরিতে যাবো। আমাদের ছবিগুলো কে চুরি করেছে, জানি না। ডন র‍্যাগনারসন হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তবে ওগুলোতে কি আছে জানতে আগ্রহী হবে অবশ্যই।'

সাত

ঘাড় ডলতে ডলতে সাপ্তাহিক 'রকি বীচ নিউজ'-এর অফিস থেকে বেরোলো মুসা। সারাটা বিকেল কাটিয়েছে এখানে। ঘরে বসে এসব কাজ করতে একটুও ভালো লাগে না তার। নাক উঁচু করে বুক ভরে টেনে নিলো সাগর থেকে আসা খোলা বিশুদ্ধ বাতাস।

স্যালভিজ ইয়ার্ডের ওয়ার্কশপে এসে শুধু কিশোরের সাইকেলটা দেখতে পেলো সে। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকলো।

'রবিন আসেনি?'

'না। পড়ার মতো কিছু পেয়ে গেছে হয়তো। তুমি কিছু পেলে?'

'অনেক কিছুই পেয়েছি। শহরতলীর সব চেয়ে বড় হার্ডওয়্যার দোকানটার মালিক জর্জ র‍্যাগনারসন। মিস্টার ডেভিড র‍্যাগনারসন আমাদের ইস্কুলের প্রিনসিপাল। ডক্টর ইংমার র‍্যাগনারসন দাঁতের ডাক্তার, এ-শহরেই থাকেন। ডন র‍্যাগনারসন তাঁর ছেলে। তিনজন র‍্যাগনারসন আছে, দু'জন এঞ্জিনিয়ার, লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকে। আরেকজন অ্যাকাউনটেন্ট, ভেনচুরায় কাজ করে। আরও কিছু র‍্যাগনারসন আছে, আশপাশের শহরগুলোতে থাকে। লড়াইয়ের সময় সবাই এসে জড়ো হয় এখানে। রকি বীচে যারা থাকে তাদের সবার ঠিকানা নিয়ে এসেছি। যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, সবাই বলেছে র‍্যাগনারসনরা ভালো লোক। শুধু ডন বাদে।'

'কেন?'

'পরিবারের কুসন্তান সে। পড়ালেখা করেনি। ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে পাণ্ডামি-গুণ্ডামি করেছে। বয়েস বাইশ। চাকরি-বাকরি করতে পারে না। অসৎ পথে টাকা

কামানোর চেষ্টায় থাকে সব সময়। জেল খেটেছে একবার।'

'হুঁ। অনেক কিছুই জেনেছো। আমি নতুন কিছু আর জানতে পারিনি তেমন। সবই বলে দিয়েছেন রবিনের বাবা। আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে জুতোর ব্যবসা করতে ইলিনয় থেকে এসেছিলো নাট র‍্যাগনারসন। পরিবারকে আনতে যাওয়ার জন্যে চড়েছিলো দা স্টার অভ পানামা জাহাজে। গন্তব্য ছিলো পানামা। ক্যাপ্টেনের নাম ছিলো হেনরি কুলটার। সোনার মোহর, গুঁড়ো, আর সোনার তাল নিয়ে চলেছিলো জাহাজটা। রকি বীচ ছাড়ানোর পর পরই ওটার সী কক খুলে দিয়ে সোনাগুলো নিয়ে লংবোটে করে পালায় ক্যাপ্টেন।'

'ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান ছিলো। চোর তো বটেই, খুনীও। এতোগুলো লোককে পানিতে ডুবিয়ে মারলো! জাহাজটা ডোবালো কেন?'

'বোঝানোর জন্যে, যে সোনাগুলো সহই ওটা ডুবেছে। ক্যাপ্টেন একা পালায়নি। নাবিকদের সঙ্গে নিয়েছিলো। যাত্রীরা তখন ঘুমিয়ে। একটা লোক শুধু বেঁচে গেল। নাট র‍্যাগনারসন।'

'ভাগ্যবান লোক।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'ক্যাপ্টেন কুলটার আর তার নাবিকদের কি হলো?'

'বলতে পারবো না। সে-সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি। তবে আরেকটা কথা জেনেছি। পঁয়তিরিশ বছর আগে নাটের নাতি এসভেন–উত্তরে বাস করে সে–ঠিক করলো পাঁচ বছর পর পর সেলিব্রেট করবে গিয়ে দ্বীপে। তারপর থেকেই...'

ট্র্যাপডোর খোলার শব্দে থেমে গেল কিশোর। রবিন এসেছে। হাসিমুখে ট্রেলারে ঢুকলো সে।

দেরি সহ্য হলো না কিশোরের। রবিন বসার আগেই জিজ্ঞেস করলো, 'কুলটারের খবর জেনেছো?'

'না। তাকে কেউ দেখেনি। তার নাবিকদেরকেও না। সোনাগুলোরও খোঁজ নেই।' হিসটোরিক্যাল মিউজিয়ম থেকে জেনে আসা তথ্যগুলো জানালো রবিন, 'একেবারে গায়েব। নাট র‍্যাগনারসন তীরে পৌঁছতে পৌঁছতে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল ক্যাপ্টেন আর তার নাবিকেরা, সোনা সহ। তারপর কেউ আর তাদেরকে দেখেনি। সাগরে পথটথ হারিয়েছে ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলো পুলিশ। ভাবলো, অন্য কোনো জাহাজ ওদেরকে তুলে নিয়ে আসবে। এমনকি তাদের ধারণা হলো, ঘুরেঘারে এসে সেই দ্বীপটাতেই উঠেছে কুলটারও। তারপর ধ্বংস হয়েছে। সে-জন্যে দ্বীপটার আরেক নাম হয়েছেঃ রেকার'স রক।'

মন দিয়ে শুনছিলো কিশোর। বললো, 'কি মনে হয় তোমার? একসাথেই দ্বীপটাতে ওঠেনি তো কুলটার আর নাট?'

'কেউ কেউ অবশ্য ভেবেছে কথাটা।'

'তাহলে, আরেকটা ব্যাপার হতেও বাধা নেই। একজনের গোপনীয়তা হয়তো আরেকজন জেনে ফেলেছিলো। যাই হোক, আর কিছু জেনেছো?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুললো রবিন।

'আরেকটা জিনিস পেয়েছি। ফটোকপি করে নিয়ে এসেছি।'

কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো সে। একটা লোকের ছবি। লম্বা। যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ছবি তোলার সময়। 'একে বলে ডগোয়েরিওটাইপ। তোলার সময় অনেকক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

তার কথাটা অন্য দু'জনের কানে ঢুকলো বলে মনে হলো না। ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লম্বা, পাতলা একজন মানুষ। উঁচু কলারওয়ালা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল, গাঢ় রঙের কোট, পিতলের বোতাম। ধবধবে শাদা গোঁফ। ফ্যাকাসে চোখ। ছোট একটা নেভি ক্যাপ মাথায়, তাতে সোনালি কাজ করা। পরনে আঁটো প্যান্ট। পায়ে গোড়ালি ঢাকা বুট। হাতে শাদা দস্তানা, আর একটা পিতলের টেলিস্কোপ।

'এ-তো সেই লোক…'

শুরু করলো মুসা, শেষ করলো কিশোর, '…ডন র‍্যাগনারসন!'

'হ্যাঁ,' হাসলো রবিন। 'সেই লোক, তবে ডন নয়। দ্য স্টার অভ পানামা জাহাজের ক্যাপ্টেন হেনরি কুলটার।'

'পা-পা-পানামা জাহাজের ক্যাপ্টেন!' অবাক হয়ে গেল মুসা।

রবিনের দিকে তাকালো কিশোর। 'ছবিটা পেলে কোথায়?'

'একটা বইতে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘটেছে এরকম কিছু অমীমাংসিত অপরাধের ওপর লেখা। দ্য স্টার অভ পানামার কাহিনী সবিস্তারে লেখা রয়েছে ওটাতে। ক্যাপ্টেন কুলটারের ছবি রয়েছে তাতে। জাহাজ থেকে পালানোর পর তার আর তার নাবিকদের কি হয়েছে কেউ জানে না।'

'কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে একশোরও বেশি বছর আগে,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে বোঝাই যায়। 'এখন ক্যাপ্টেনের বয়েস…'

'কম করে হলেও পৌনে দু'শো বছর হবে,' হিসেব করে বললো কিশোর। 'যদি বেঁচে থাকে। কারণ তখনকার দিনে অন্তত তিরিশ বছরের কমে কেউ জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পারতো না।'

'পৌনে দুশো বছর কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না,' মাথা নাড়লো মুসা। 'অসম্ভব। তার মানে যাকে দেখে এসেছি আমরা সে ক্যাপ্টেন কুলটার নয়।'

'জ্যান্ত কুলটার নয়,' রবিন বললো।

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'থাক!' হাত নাড়লো সে। 'বাকিটা আর শোনার দরকার নেই!'

'জ্যান্ত হতেই পারে না,' আনমনে বললো কিশোর। 'এর তিনটে ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। এক, যাকে দেখেছি তার সঙ্গে ছবির এই লোকটার অসাধারণ মিল। দুই, ওই লোকটা এই লোকটার ছদ্মবেশ নিয়েছিলো। আর তিন নম্বর হলো, লোকটা মানুষ নয়, ভূত।'

'বললাম না, আর কিছু শুনতে চাই না আমি!' জোরে জোরে এবার দু'হাত নাড়লো মুসা।

তার কথা কানে তুললো না কেউ।

'ছবির লোকটা আর কটেজের লোকটা এক হতেই পারে না,' রবিন বললো।

'কারণ আজকাল এরকম পোশাক কেউ পরে না। অথচ চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে। কাকতালীয় বললে খুব বেশি কাকতালীয় হয়ে যায়।'

'তাহলে ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশ নিয়েছে,' কিশোর বললো।

'অথবা সত্যিই ভূত।'

'ঠিক,' জোর দিয়ে বললো মুসা। 'ভূতের ছবিই তুলে এনেছো তুমি। সে-জন্যেই ডন র‍্যাগনারসন আমাদের নিগেটিভগুলো নিয়ে গেছে। ওগুলো তার দরকার। দ্বীপে তার ওপর আসর করেছিলো ভূতটা, তাঁকে দিয়ে এসমস্ত অসৎ কাজ করিয়ে নিচ্ছে।'

'আরে দূর,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিশোর। 'কি সব আবোল-তাবোল কথা। ভূতের ছবি তোলা যায় না। কারণ ওসব নেই। একটাই ব্যাপার ঘটেছে। ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশ নিয়েছে কেউ।'

'ভূতের ছবি তোলা যায় না,' মুসা বললো। 'ঠিক, কারণ ওরা অশরীরী। কিন্তু নেই, একথা বলতে পারবে না। আমি মানি না। আছে, অবশ্যই। অদৃশ্য থাকে আর কি।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলো কিশোর। 'অটো সাজেশন নিয়ে নিয়ে আরও অবনতি হয়েছে তোমার। আগের চেয়ে বিশ্বাস আরও জোরদার হয়েছে।'

'কিশোর,' রবিন প্রশ্ন করলো। 'কেন ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশ নিতে যাবে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'জানি না। তবে এটা কাকতালীয় ব্যাপার নয়, এটুকু বলতে পারি।'

'তাহলে ডন হয়তো ছবিগুলো চুরি করেনি। করেছে এই ছদ্মবেশী লোকটাই।'

'ডনও কুলটারের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে পারে। তদন্ত করলেই বেরিয়ে পড়বে। ডন আর অন্য র‍্যাগনারসনদের ব্যাপারে আরও খোঁজখবর নিতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলো রবিন।

'কাল র‍্যাগনারসনদের সঙ্গে দেখা করবো আমরা।'

'ওরা খারাপ কিছু করছে বলে মনে হয় তোমার?'

'একজনের ব্যাপারে বলতে পারি, করছে। ডন। ছবিগুলো কেড়ে নিতে চেয়েছে আমাদের কাছ থেকে, হুমকি দিয়েছে। তারপর দু'জন লোক ছবিগুলো নিয়ে গেছে। কেউ একজন ক্যাপ্টেন কুলটারের ছদ্মবেশ নিয়েছে। আমরা জেনেছি, ক্যাপ্টেন, তার নাবিক, আর সোনাগুলোর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনও তো হতে পারে, এখনও সোনাগুলো লুকানো রয়েছে র‍্যাগনারসন রকে!'

আট

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে ফেললো রবিন। আগের দিন পিকআপের তাড়া খেয়ে, খাদে পড়ে, আর প্রচুর পড়াশোনা করে কতোটা ক্লান্ত

হয়েছিলো বুঝতে পারেনি তখন, এখন পারছে। এই অতিরিক্ত ঘুমানোই তার প্রমাণ। উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে ঢুকলো রান্নাঘরে। রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো একটা নোট দেখতে পেলো। লেখা রয়েছেঃ

গুড মরনিং,

ঘুম ভাঙলো? কাল অফিসে গিয়েই শুনলাম পাহাড়ে দাবানল লেগেছে। তাড়াতাড়ি সেটার রিপোর্টিং করতে চলে গেলাম। আজ সকালেও তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। কাল ছবিগুলো প্রিন্ট করিয়ে আনতে পারিনি, সরি। আজ অবশ্যই পাবে।

—বাবা।

বি. দ্র. তোমার আম্মা সুপারমার্কেটে গেছে। আমাকে বলে গেছে তোমাকে বলার জন্যে, কি কি কাজ নাকি রয়েছে। বাগানের গাছ কাটা, লনে পানি দেয়া, এসব...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্রিজ থেকে খাবার বের করলো সে। নাস্তা সেরে কাজে লেগে পড়লো। দুপুরের আগে ইয়ার্ডে যেতে পারলো না। এসে দেখে ওয়ার্কশপে গম্ভীর হয়ে বসে আছে মুসা। রবিনকে দেখেই বললো, 'দিয়েছে আটকে। বোরিস গেছে দাঁতের ডাক্তারের কাছে। রোভার একা পারবে না। তাই তার সঙ্গে কিশোরকে মাল আনতে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাশেদ আংকেল। ছুটিটা এবারে খাটতে খাটতেই গেল আমাদের!'

'কিশোরকে ছাড়াই শুরু করতে পারি আমরা।'

'কি করবো? কি জিজ্ঞেস করবো তাই তো জানি না।'

'জিজ্ঞেস করবো কে বা কারা গিয়েছিলো ওই রকে।'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। 'উঁহু, হলো না। কিশোরের জন্যে দেরিই করি।'

চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না। ওয়ার্কশপে কয়েকটা ছোটখাটো মেরামতের কাজ সারলো দু'জনে। তারপর ট্রেলারে ঢুকে চিত হয়ে পড়ে রইলো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। সকালের খবরের কাগজের কয়েকটা কপি চোখে পড়লো রবিনের। পুরনো অবশ্যই। রেখে দিয়েছে তার কারণ ওতে তিন গোয়েন্দার নাম ছাপা হয়েছে। ওই যে, বোটটা যে টেনে এনেছে সেই খবর।

'দেখো কাণ্ড,' বলে উঠলো সে। 'মিস্টার বোরিনসের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাকে কি পাওয়া গেছে?'

মাথা নাড়লো মুসা। 'পাবে বলে মনে হয় না। বাবা বলেছে, যেখানটায় পড়েছে, সাঁতার না জানলে বাঁচার আশা একেবারেই নেই।'

রিসিভার তুলে নিলো রবিন। 'চীফকে ফোন করবো। বোরিনসের খবর কি জিজ্ঞেস করবো।'

আরেকটা লাইনে কথা বলছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেচার। অপেক্ষা করতে হলো রবিনকে। অবশেষে স্পীকারে ভেসে এলো তাঁর কণ্ঠ, 'না, রবিন, আশা নেই। কোস্ট গার্ডেরা খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি? আহারে, বেচারা!'

ট্রেলারের ছাতে লাগানো পেরিস্কোপ সর্ব-দর্শনে চোখ রেখে বাইরেটা দেখছে মুসা। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হলো, ট্রাক নিয়ে ফিরে এসেছে কিশোর!'

আর বসে থাকতে পারলো না দু'জনে। বেরিয়ে পড়লো।

ওদেরকে দেখেই বলে উঠলো কিশোর, 'এসেছো। ভালো হয়েছে। হাত লাগাও। মালগুলো নামাতে হবে।'

দেখতে দেখতে নামিয়ে ফেলা হলো সব মাল। থ হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা। ছেলেগুলো যে কতো দ্রুত কাজ সারতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ইচ্ছে করে না বলেই ঢিলেমি করে অন্য সময়।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। একটা দোকানে থেমে তাড়াতাড়ি বার্গার আর কোল্ড ড্রিংক খেয়ে নিয়ে সেন্ট্রাল হাউজ অ্যাণ্ড হার্ডওয়্যার স্টোর-এর মালিক জর্জ র‍্যাগনারসনের ওখানে চললো ওরা, শহরতলীতে। পুরো একটা ব্লক জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে স্টোরটা। পেছনের একটা ঘরে পাওয়া গেল জর্জকে, জমাখরচ পরীক্ষা করছেন। খাটো, মোটা, ব্যস্ত একজন মানুষ। কথা বলার সময়ও কাজ করেন।

'বলো, কি করতে পারি?'

'র‍্যাগনারসন রকের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, স্যার,' মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। 'ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের ওপর গবেষণা করছি আমরা, ইস্কুলের পরীক্ষায় লাগবে। আমাদের সাবজেক্ট, বিচিত্র ঘটনা। আপনি কি কিছু বলবেন? এই, ইদানীং নতুন কিছু পেয়েছেন কি সেখানে?'

'নতুন কিছু? নাহ্। বুড়ো হয়েছি। দেখার চোখও নেই এখন। দেখবো কি? বাতের ব্যথায়ই মরলাম। হতচ্ছাড়া এই কাজ...

নিরীহ কণ্ঠে কিশোর বললো, 'শুনলাম, ক্যাপ্টেন কুলটারের কি হয়েছে তা নাকি আপনি জানেন?'

'কে?' হিসেব থেকে মুখ তুললেন জর্জ।

'দ্য স্টার অভ পানামার ক্যাপ্টেন, স্যার,' রবিন বললো।

'ও, ওটা। না, কিছু জানি না। ভুল শুনেছো।'

'আপনার ভাইপো ডন হয়তো জানে,' মুসা বললো।

মুখ বিকৃত করে ফেললেন জর্জ। 'ওই অপদার্থটা! ওর নামও মুখে এনো না আমার সামনে। ভাই বলে পরিচয় দিতেও ইচ্ছে হয় না। ও আমার চাচাতো ভাই।'

'অ, জানতাম না,' কিশোর বললো। 'শুনলাম, অসৎ সঙ্গে পড়ে নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। ইদানীং কোনো গোলমালে জড়িয়েছে নাকি?'

'জড়ায় না কখন?'

'আপনাদের সেলিব্রেশনে কি যায়? এবার গিয়েছিলো?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন জর্জ। 'পারিবারিক অনুষ্ঠান, বাধা তো আর দিতে পারি না। তবে পারলে ভালো হতো। একবার ধরে এনে ওকে এখানে কাজ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ভালো হয়ে যাবে। ও কি করলো জানো? সমস্ত জায়গায় আমার বদনাম করে বেড়াতে লাগলো। কাজকর্ম কিচ্ছু নেই। খালি খাওয়া আর

ঘুম।'

'এখনও কি ওরকমই আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'বাজে কিছুতে জড়িয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'বললাম না, সব সময়ই জড়ায়,' চাচাতো ভাইয়ের উদ্দেশে বিষ ঢাললেন যেন জর্জ। 'এখন কিসে জড়িয়েছে, জানি না।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। এরপর, ডনের বাবা ইংমার র‍্যাগনারসনের অফিসে গেল ওরা। তিন তলা হলুদ ইঁটের একটা বাড়িতে ডাক্তারের দন্ত চিকিৎসালয়। পথের পাশেই। গাছপালায় ঘেরা।

হাসিমুখে ওদেরকে স্বাগত জানালো রিসিপশনিস্ট। জিজ্ঞেস করলো, 'কার দাঁত খারাপ? ব্যথা বেশি করছে?'

ঝকঝকে শাদা মুক্তোর মতো দাঁতগুলো দেখিয়ে দিলো মুসা, হেসে।

রবিন বললো, 'কারোরই নেই।'

কিশোর বললো, 'ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তাঁর ছেলের ব্যাপারে। কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন?'

'কোন্ ছেলে?'

'ডন,' জানালো মুসা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মেয়েটা। 'শুনেই বুঝেছি, ও-ই হবে। দাঁড়াও।' একটা রিসিভার তুলে নিয়ে খটখট করে কয়েকটা বোতাম টিপে কানে ঠেকালো সে। কথা বললো। তারপর রেখে দিলো রিসিভারটা। 'আসছেন।'

ভেতরের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন শাদা জ্যাকেট পরা লম্বা, সোনালি চুল একজন মানুষ। বিরক্ত, বোঝা যায়। ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করেছে?'

নোনা বাতাসে কুঁচকানো মুখের চামড়া, লম্বা চুল, আসল ভাইকিংদের চেহারা মনে করিয়ে দেয়। যেন এই মাত্র জলদস্যুদের জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন তিনি।

'কি করেছে, জানি না, স্যার,' কিশোর জবাব দিলো। 'কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।'

'তোমাদেরকে তো চিনি না,' বলেই কিশোরের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির করলেন তিনি। এক এক করে তাকালেন রবিন আর মুসার দিকে। উজ্জ্বল হলো মুখ। 'আরে, তোমরা! সেদিন রকে ছবি তুলেছিলে। কেমন এসেছে?'

'ওই ছবিগুলোর ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি,' রবিন বললো।

'এসো, ভেতরে এসো।'

সাজানো গোছানো ডেন্টিস্টের অফিস। রোগী শোয়ানোর চেয়ার। ক্রোমের তৈরি নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি। চেয়ারে বসে আছেন আরেকজন মানুষ। একইরকম সোনালি চুল। গায়ে শাদা স্মক।

'ও আমার ভাই ডেভিড,' পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাক্তার।

'স্যারকে চিনি,' বিনয়ের সঙ্গে বললো রবিন। 'আমাদের ইস্কুলের প্রিনসিপাল।'

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু মাথা ঝোঁকালেন ডেভিড। 'কেমন

আছো?' ছেলেরা ভালো আছে জানালো। ভাইয়ের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ইংমার, একটা দাঁত নিয়ে আর কতোক্ষণ? রকে যাওয়া দরকার। ডিনারের আগেই।'

'ডনের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছে এরা,' ডাক্তার বললেন। 'কাজ করতে করতেই বলা যাবে, কি বলো?' একথাটা ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। ভাইয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁত নিয়ে কাজ শুরু করলেন। 'কি জানতে চাও?'

প্রশ্ন করতে লাগলো কিশোর।

'বেশ কয়েক বছর আর সিরিয়াস গোলমালে জড়ায়নি,' এক প্রশ্নের জবাবে বললেন ডাক্তার। 'কি বলো, ডেভিড?'

মুখের ভেতরে ডেন্টিস্টের আয়না ঢোকানো। একটা ধাতব চোখা শলা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন ইংমার। এই অবস্থায় কথা বলা অসম্ভব। গাঁ গাঁ করে কি বললেন বোঝা গেল না।

'ও, সরি,' মুখ থেকে আয়না আর শলা সরিয়ে আনলেন ডাক্তার।

জ্বলন্ত চোখে ভাইয়ের দিকে তাকালেন প্রিনসিপাল। যেন ইংমারই ডন। 'তা জড়ায়নি। তবে আজেবাজে কাজ করেই চলেছে। মাথায় বোধহয় দোষই আছে ছেলেটার।'

'হ্যাঁ, কিছুটা খেপাটে স্বভাবের!' মস্ত একটা নোভোকেইন হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করলেন ডাক্তার। 'তবে মানুষ হিসেবে সে খারাপ নয়। কি বলো?'

লম্বা সুচটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন প্রিনসিপাল। জবাবটা দিতে দ্বিধা করলেন। 'তা বটে। ঘেউ ঘেউ বেশি করে, কামড়ায় কম। তবে ওই ঘেউ ঘেউটাই অসহ্য।'

'জর্জ র‍্যাগনারসন অবশ্য অন্য কথা বলেছেন,' মুসা বললো। 'ডনের ব্যাপারে তাঁর ধারণা খুব খারাপ।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ডাক্তার, 'ও আর মাপ করতে পারলো না ছেলেটাকে। দশ বছর বয়েসে ওর ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে গাছ থেকে ফেলে দিয়েছিলো ডন, সেই রাগ আর গেল না। নিশ্চয় বলেছে, ওর বদনাম করে বেড়িয়েছে ডন। খালি খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে, কোনো কাজই করেনি স্টোরে। কে খায় না, বলো? আর খেলে ঘুম আসবেই।'

সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন আচমকা প্রিনসিপালের মাড়িতে সুচটা ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার। প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ওষুধ ঢুকিয়ে দিতে শুরু করলেন।

আঁ আঁ করতে লাগলেন প্রিনসিপাল। চেয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে গেল আঙুল। সুচটা বের করার পর ঠোঁটের কোণা দিয়ে কোনোমতে বললেন, 'জর্জটা ভদ্রতা জানে না।'

'আর ও-ই একমাত্র র‍্যাগনারসন,' যোগ করলেন ডাক্তার, 'যে সেলিব্রেশনে আমাদের মতো করে অংশ নেয়নি। ওই একবার দু'বার গেছে এসেছে, ব্যস।'

'আপনারা এখন এখানে কেন?' প্রশ্ন করে বসলো কিশোর।

'ইমারজেন্সী। ডেভিডের দাঁতে ব্যথা উঠলো। নিয়ে আসতে হলো এখানে।'

ওয়েইটিং রুমে গলাবাজী শোনা গেল। রিসিপশনিস্টের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে কেউ। কান পেতে এক মুহূর্ত শুনলেন, তারপর ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রিনসিপাল। 'আসলে কি জানতে এসেছো তোমরা?' নোভোকেইন কাজ শুরু করে দিয়েছে। অবশ করে দিচ্ছে জিভের গোড়া। কথা জড়িয়ে আসছে তাঁর।

'আমরা শুনেছি, আজব ঘটনা ঘটছে রকে,' রবিন বললো।

'কোথায়...?'

শেষ করতে পারলেন না ডেভিড। হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো এক তরুণ। মুসার সমান লম্বা, তবে স্বাস্থ্য তার মতো ভালো নয়। বরং রোগাটেই বলা যায়। পরনে মলিন জিনস, গায়ে নোংরা টি-শার্ট। পা খালি। জুতো-স্যাণ্ডাল কিছুই নেই। কয়েক দিন শেভ করেনি।

'বাবা...।' তিন গোয়েন্দার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল। 'এরা এখানে কি করছে? নিশ্চয় বানিয়ে বানিয়ে নালিশ করছে আমার নামে। আমি কিচ্ছু করিনি। শুধু ছবিগুলো কিনতে চেয়েছিলাম। সব মিথ্যে কথা বলছে।'

'ছবি?' বুঝতে পারছেন না ডাক্তার। 'ওদের ছবি তোমার কি দরকার?'

'স্যুভনির। সবাইকে উপহার দিয়ে চমকে দিতে চেয়েছিলুম।'

ভাইকিং পোশাক, শিংওলা হেলমেট আর নকল দাড়ি না থাকায় বয়েস অনেক কম লাগছে ডনের।

'মিথ্যে কথা কি কি বলেছে?' একটা শব্দও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলেন না প্রিনসিপাল।

'আর কি? আমি ওদের পিছু লেগেছি। গোলমাল করেছি। বিশ্বাস করো, চাচা, আমি কিছুই করিনি। শুধু ছবিগুলো চেয়েছি।'

'কিছু যদি না-ই করে থাকবে, তাহলে কেন মনে হলো তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে ওরা?'

লাল হয়ে গেল ডনের গাল। আমতা আমতা করতে লাগলো, 'ওই...ইয়ে...মানে...ও'বয়েসী ছেলেগুলো তাই করে তো...'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। 'কেন মিথ্যে কথা বলছো! ওরা কিচ্ছু বলেনি। নিজের দোষ নিজেই বের করে দিলে।'

বোকা হয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালো ডন।

ডেভিড বললেন অস্পষ্ট উচ্চারণে, 'এদেরকে তুমি...' ঠোঁটের এককোণ ঝুলে পড়েছে তার।

'চুপ করে থাকো। তোমার কথা এখন বোঝা যাবে না।' হেসে ড্রিল মেশিন বের করলেন ডাক্তার। 'দেখি, হাঁ করো।'

'বলেই ফেলি, স্যার,' কিশোর বললো। 'খারাপ কাজ অনেকগুলোই করেছে আপনার ছেলে। হয়তো। হয়তো বলছি এ-জন্যে, চেহারা চেনা যায়নি। কাল আমাদের ছবিগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। পুরনো শাদা একটা পিকআপে করে রবিনের পিছু নিয়েছিলো দু'জন লোক। ধাক্কা দিয়ে রবিনের সাইকেল খাদে ফেলে ছবিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'আমি কিচ্ছু করিনি!' রেগে গেল ডন।
'ছবিগুলো তো তুমিই চেয়েছিলে,' রবিন বললো।
'কেড়ে নেয়ার হুমকিও দিয়েছিলে,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর।
আরও রেগে গেল ডন। 'মিছে কথা! একদম মিথ্যে কথা!'
ছেলের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটেছে ডাক্তারের চোখে। আর প্রিনসিপালের চোখে ফুটেছে ড্রিল মেশিনটার দিকে তাকিয়ে।
ছেলেদের চোখে চোখে তাকালেন ইংমার। 'ডন, তুমি ছবিগুলো চেয়েছিলে, তুমিই বলেছো।'
'ওরা কোথায় থাকে, তা-ই জানি না!' চেঁচিয়ে উঠলো ডন।
মুসা বললো, 'সেদিন ম্যারিনা থেকে আমাদেরকে অনুসরণ করে এসে থাকতে পারো। তাহলেই ঠিকানা জানা হয়ে যাবে।'
'ছবিগুলো চাইলে আমি বলেছি,' রবিন বললো। 'ওগুলো আমার বাবার পত্রিকার জন্যে দরকার। বাবার নামও বোধহয় বলেছিলাম। ঠিকানা জোগাড় করে বাড়ি চিনে নেয়া কিছুই না। কাল সকালে আমাদের বাড়ির সামনে ট্রাকে বসে নজর রাখছিলো চোরেরা।'
অস্বস্তি বাড়লো ডাক্তারের। বাড়ছে প্রিনসিপালেরও। ড্রিল মেশিনটা যতো এগিয়ে আসছে, মাথা পিছিয়ে নিচ্ছেন তিনি। পিছাতে পিছাতে একেবারে ঠেকে গেল চেয়ারের সঙ্গে।
'আমি কিছু করিনি!' জোর দিয়ে বললো ডন। 'কখন চুরি হয়েছে?'
তাকে জানালো রবিন।
হেসে উঠলো ডন। 'ওই সময় আমি রকে ছিলাম! বাবা সাক্ষী।'
মাথা ঝাঁকালেন ডন। 'হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই ছিলো। বেলা এগারোটায় দু'জনে একসাথে বেরিয়ে এসেছি দ্বীপ থেকে।'
'তাতে কি?' যুক্তি দেখালো মুসা, 'তার দু'জন বন্ধুকে বলে রেখে যেতে পারে কাজটা করার জন্যে।'
'দেখ, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না,' ডাক্তার বললেন। ড্রিলটা ধরে রেখেছেন প্রিনসিপালের অপেক্ষমান মুখে।
'মনে হয় কিছু করেনি,' কোনোমতে শব্দগুলো বের করলেন ডেভিড। 'এই, সারাদিনই ধরে রাখবে, না কিছু করবে?'
'হয়তো আপনাদের কথাই ঠিক,' শান্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। ভাবলেশহীন চেহারা। 'সরি, অনেক বিরক্ত করলাম,' রবিন আর মুসাকে ডাকলো, 'এসো। অন্য কোথাও গিয়ে চোর খুঁজি।'
ইলেকট্রিক ড্রিলের সুইচ অন করলেন ডাক্তার।
রিসিপশনিস্টের ঘর থেকে বেরিয়েই কিশোরের মুখোমুখি হলো রবিন। 'এতো সহজে ছাড়লে কেন?'
'ছবিগুলো ও চুরি করেনি?' মুসার প্রশ্ন।
'করতে পারে,' জবাব দিলো কিশোর। 'এখনও শিওর নই। আগে আমাদের

জানতে হবে ছবিগুলো এতো চাওয়ার কারণটা কি? নিশ্চয় এমন কিছু আছে যা আর কাউকে দেখতে দিতে চায় না সে।
সেজন্যেই ছিনিয়ে নিয়েছে।'

ঘড়ি দেখলো কিশোর।

'চারটের বেশি বাজে। চলো, রবিনদের বাড়ি যাই। আংকেলের আসার সময় হয়েছে। যতো তাড়াতাড়ি পারি ছবিগুলো দেখবো।'

সাইকেলে চড়লো মুসা। 'চলো। প্রমাণ দরকার। তারপর ডনের থোতাটা ভাঙবো আমি।'

রাস্তায় যানবাহনের ভিড় তেমন নেই। সাইকেল চালিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। মুসা সবার আগে, কিশোর মাঝখানে আর রবিন রয়েছে সবার পেছনে। এঞ্জিনের শব্দে হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'এই, দেখ দেখ!'

ফিরে তাকালো অন্য দু'জনে। মোটর সাইকেলে করে আসছে ডন র‍্যাগনারসন। কাছাকাছি এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'আমার সাথে লাগতে এসেছো তো,' থুহ্ করে রাস্তায় থুথু ফেললো সে
'বোঝাবো মজা!'

নয়

মোটর সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রবিনকে রাস্তার পাশের ঘাসের ওপর ফেলে দিলো সে। জোরে চেঁচিয়ে গুণলো, 'এক!'

শাঁ করে এগিয়ে গেল কিছুদূর। তারপর ঘুরলো। মুখোমুখি হয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আবার। শাঁই করে সাইকেল ঘুরিয়ে ফেললো কিশোর। নেমে গেল পাশের জমিতে ইউক্যালিপটাস বনের ভেতর। উঁচুনিচু জায়গায় নাচানাচি করলো কিছুক্ষণ সাইকেল, তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে ঠোকর খেয়ে কাত হয়ে পড়লো।

'দুই!' শোনা গেল ডনের চিৎকার।

ভীষণ রেগে গেল মুসা। সাইকেল থামিয়ে সীটে বসেই তাকালো ডনের দিকে। সরে গেছে ডন। মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে আবার ফিরে আসার আগেই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো মুসা। ঠেলা দিয়ে সাইকেলটা ফেলে দিয়ে ঝট্ করে তুলে নিলো পড়ে থাকা একটা মরা ডাল।

ব্রেক কষলো ডন। ভয়ংকর হয়ে উঠেছে মুসার মুখচোখ। নিগ্রোর সে চেহারার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করলো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা দিয়ে কি করবে?'

'কাছে এসেই দেখ না!'

এলো না ডন। ওখান থেকেই বললো, 'এলে কচু করবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম। দুটোকে ফেলেছি। তাতেই শিক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। আর লাগতে আসবে না আমার সঙ্গে।'

মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল ডন।

ডালটা ফেলে দিয়ে রবিন আর কিশোরের দিকে ফিরলো মুসা। কার সাহায্য লাগবে দেখলো। রবিন উঠে পড়েছে। কিশোরও। একজন খোঁড়াচ্ছে। আরেকজন ময়লা ঝাড়ছে কাপড় থেকে।

'রেগে গেলে তোমার যা একখান চেহারা হয়,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে ইউক্যালিপটাসের ভারি ওষুধী গন্ধ ফুসফুস থেকে বের করে দেয়ার জন্যে। 'খামোকা ভূতকে ভয় পাও। ওই সময় ভূতই তোমাকে দেখলে বাপ বাপ করে পালাবে।'

'কি করবো? ব্যাটা আমার মাথাটা গরম করে দিয়েছিলো। রবিন, বেশি লেগেছে?'

'না, তেমন না,' সাইকেলটা তুললো রবিন। সামনের চাকার রিংটা সামান্য টাল খেয়েছে। 'বাড়ি যেতে পারবো?' বাইকটাকেই যেন প্রশ্ন করলো সে।

'কয়েক মাসেও যাবে না এই গন্ধ,' ইউক্যালিপটাসের যে পাতাগুলোর ওপর পড়েছিলো কিশোর, বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালো সেদিকে। 'হাড়গোড়গুলো অবশ্য বেঁচেছে। চলো, যাই, রবিনদের বাড়িতেই...' সাইকেল চালিয়ে একটা ছেলে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। পেপার বয়। সাইকেলের ক্যারিয়ারে কাগজের বোঝা, একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে একটা কাগজ দোলাতে দোলাতে আসছে।

কাছে আসতে কাগজে একটা ছবি চোখে পড়লো রবিনের। ইশারায় থামতে বললো ছেলেটাকে। 'দেখি, একটা কাগজ।'

'এই যে!' ছবিটা ভালো করে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'আব্বার লেখা! আমাদের তোলা ছবি!'

কাগজটা কিনে নিলো কিশোর বেশ কয়েকটা ছবি ছাপা হয়েছে।

ভালো করে দেখে মাথা নাড়লো রবিন, 'নাহ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সাধারণ ছবি। পুরো দলটা লাফাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে পাগলের মতো।'

'কিছুই নেই,' মুসা বললো। 'সী গাল আর সীলের ব্যাপারে আগ্রহী হলে অবশ্য আলাদা কথা। আশ্চর্য, সীলটাকে কিন্তু দেখিইনি তখন! ছবি কিভাবে সবকিছু ধরে রাখে!'

'হ্যাঁ, আমাদের চোখ এড়িয়ে গেলেও ক্যামেরার চোখ এড়ায় না,' কিশোর বললো। 'আমরা শুধু যা দেখতে চাই তার দিকে তাকাই। ক্যামেরা একবারে সব দেখে। তবে এখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। র‍্যাগনারসন, পাথর, আকাশ আর সাগর ছাড়া কিছু নেই।'

'এখানে আছে মাত্র ছয়টা ছবি,' রবিন বললো। 'অথচ আমি তুলেছি আটচল্লিশটা। ওগুলোর কোনোটাতে থাকতে পারে। চলো, বাড়ি গিয়ে আগে সবগুলো দেখি।'

রবিনের সাইকেলের সামনের চাকাটা লাফাতে লাফাতে চললো। অসুবিধে হলেও চালানো যায়। এখনও মাঝে মাঝেই হাঁচি দিচ্ছে কিশোর, নাকে বালি ঢুকে যাওয়ার ফল। কাপড়ে লেগে রয়েছে ইউক্যালিপটাসের কড়া গন্ধ।

বাড়ির কাছে পৌছে গেছে ওরা। মোড় নিয়ে ঢুকতে যাবে, এই সময় কানে এলো জোড়ালো কণ্ঠস্বর, 'এই, কি করো! সরো!'

ঝট্ করে ফিরে তাকালো রবিন। 'বাবাআ!'

রবিনদের বাড়িতে ঢুকেছে যে ড্রাইভওয়েটা, তার মাথায় গাড়ির গায়ে শরীর ঠেকিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার মিলফোর্ড। তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে মুখোশ পরা দু'জন লোক।

'খাইছে!' চিৎকার করে বললো মুসা, 'নিশ্চয় আবার ফটো ছিনতাই করতে এসেছে!'

সাইকেল ফেলে দৌড় দিলো সে। পিছু নিলো রবিন। সবার পেছনে কিশোর। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো একটা লোক। দ্বিতীয় লোকটা তাকিয়েই হাত ঢুকিয়ে দিলো গাড়ির ভেতরে। ড্রাইভিং সীটের পাশের সীট থেকে তুলে আনলো বড় একটা হলদেটে খাম।

আরও কাছে পৌছে মুসা দেখলো, বড় একটা ছুরি মিলফোর্ডের পেটে ঠেসে ধরে রেখেছে প্রথম লোকটা। সে-জন্যেই তিনি বাধা দিতে পারছেন না।

খামটা হাতিয়ে নিয়েই দৌড় দিলো লোক দুটো। গাছের সারির পাশে শাদা পিকআপটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। ওরা এসেছে উল্টো দিক থেকে, তাই আগে গাড়িটা দেখতে পায়নি।

চেঁচামেচি করে লোক ডাকতে শুরু করলো কিশোর আর রবিন। মুসা ছুটছে লোকগুলোর পেছনে। কিছুতেই ছবি নিয়ে পালাতে দেবে না।

খুলে যেতে শুরু করলো পড়শীদের বাড়ির জানালাগুলো। যে লোকটা ছবি নিয়ে পালাচ্ছে তাকে সই করে ডাইভ দিলো মুসা। কোমরে নিগ্রোর খুলির আঘাত সহ্য করতে পারলো না লোকটা, পড়ে গেল। তার ওপর পড়লো মুসা।

ছুরিওয়ালা লোকটা দাঁড়ালো না। দৌড় দিয়ে গিয়ে উঠে পড়লো পিকআপে। অন্য লোকটাও মুসাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দু'দিক থেকে ছুটে এলো কিশোর আর রবিন, কিন্তু একজনকেও ধরতে পারলো না। স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

'গেল!' হতাশ ভঙ্গিতে বললো কিশোর। হাঁপাচ্ছে। 'ছবিগুলো!'

হাসছে মুসা। হাতটা পেছন থেকে এনে দেখালো। হলদে খাম। 'এবার আর নিতে পারেনি।'

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে রবিন বললো, 'অনেক ধন্যবাদ, মুসা।'

এগিয়ে এলেন মিলফোর্ড। 'ব্যাপারটা কি? এরকম করলো কেন?'

'এটাই তো গতকাল তোমাকে বলতে চেয়েছি। র‍্যাগনারসন রকে তোলা ছবিগুলো ছিনিয়ে নিতে চায়।'

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিলফোর্ড। 'সরি, এরকম একটা কাণ্ড না ঘটলে বিশ্বাসই করতাম না।'

'কি হয়েছিলো, আংকেল,' জানতে চাইলো কিশোর। 'খুলে বলবেন?'

'বাড়ির কাছে এসেই দেখি ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তা জুড়ে। ভেতরে ঢুকতে

পারলাম না। গাড়ি থেকে নামলাম ওখানে কেন রেখেছে জিজ্ঞেস করার জন্যে। বলা নেই কওয়া নেই দু'দিক থেকে এসে আমাকে কোণঠাসা করে ফেললো ওরা। একজনের হাতে ছুরি। জিজ্ঞেস করতে লাগলো খামটা কোথায় রেখেছি। আমি বলিনি, ওরাই দেখে ফেলেছে সীটের ওপর। খামের ওপরে ফটো লেখা রয়েছে তো, বুঝে ফেললো।'

'লাইসেন্স নম্বরটা নিয়েছো কেউ?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'আমি পারিনি।'

'না,' মাথা নাড়লো রবিন। 'তাড়াহুড়োয় মনেই ছিলো না।'

'প্লেটের ওপর কাদা লেগেছিলো,' মুসা বললো। 'অতোটা খেয়াল করিনি। তবে একটা জিনিস দেখেছি। একজনের বাঁ হাতে টাট্টু দিয়ে মারমেইড আঁকা।'

'ভালো সূত্র,' খুশি হলো কিশোর।

বেরিয়ে এসেছে পড়শীরা। ওরা বেরোনোতেই থাকার সাহস পায়নি ডাকাতেরা, পালিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, ডাকাতদের ব্যাপারে তারা কিছু জানে কিনা। কিছু চোখে পড়েছে কিনা। পড়েনি কারোরই। যেটা সবারই চোখে পড়েছে, তা হলো একজন আরেকজনের চেয়ে কিছুটা লম্বা। দু'জনের পরনেই পুরনো জিনস, ওয়র্ক শার্ট, আর ভারি বুট। মুখে স্কি মাস্ক। মুখোশের জন্যে তাদের চেহারা দেখা যায়নি।

'স্বাস্থ্য বেশ ভালো মনে হলো,' মিলফোর্ড বললেন। 'পেশীটেশী আছে।'

এক এক করে চলে গেল পড়শীরা। সাইকেলগুলো তুলে নিয়ে মিলফোর্ডকে অনুসরণ করলো তিন গোয়েন্দা। বাড়িতে ঢুকলো। কয়েক জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে মুসার। অ্যান্টিসেপটিক আর তুলো এনে দিলো রবিন। ততোক্ষণে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন রবিনের আম্মা। তিনিই মুসার আহত জায়গাগুলো ভালো করে ধুয়ে মুছে দিলেন।

'ছবিগুলো দেখা যাক এবার,' কিশোর প্রস্তাব দিলো। 'আবার কিছু ঘটার আগেই।'

লিভিং রুমের কফি টেবিলে ছবিগুলো ঢেলে দেয়া হলো।

মিলফোর্ডও এসে ঢুকলেন সেখানে। 'পুলিশকে ফোন করে এলাম। ছবিগুলো নিয়ে অন্য ঘরে চলে যাও।'

'ঠিক,' কিশোর বললো। 'নইলে পুলিশ আবার নিয়ে যেতে পারে। তারচে'... এই চলো, হেডকোয়ার্টারে চলে যাই।'

ছবিগুলো খামে ভরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়তে চায়। টাল খাওয়া চাকাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো রবিন। চড়তে গিয়ে মনে পড়লো। সাইকেল রেখে একদৌড়ে গিয়ে গ্যারেজে ঢুকলো। বাড়তি চাকা আছে। নিয়ে এলো সেটা। পুরনোটা খুলে ফেলে নতুনটা লাগাতে তাকে সাহায্য করলো মুসা।

দু'জনে যখন কাজ করছে কিশোর তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'একটা ব্যাপার মিলছে না,' জবাব দিলো কিশোর। 'মুখোশধারী লোক দুটো পত্রিকায় ছবি দেখার আগে নিশ্চয়.বুঝতে পারেনি যে নিগেটিভগুলো বাদেও আরও ছবি আছে। ডন আমাদের সঙ্গে ছিলো তার বাবার অফিসে। আমাদের আগেই সেটা জানার কথা নয় তার। তাহলে কি করে দোস্তদেরকে পাঠালো ছবি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে?'

'না, তার পক্ষে সম্ভব নয়,' চাপ দিয়ে চাকাটা জায়গামতো ঢুকিয়ে দিলো রবিন। 'আমরা যেটা কিনেছি সেটাই প্রথম সংস্করণ। এর আগে আর বেরোয়নি। আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গিয়ে পত্রিকা দেখে দোস্তদের ফোন করে বাবার পেছনে লাগানোর মতো সময় তার হাতে ছিলো না।'

'কে করলো তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'ডন নয়। অন্য কেউ,' জবাব দিলো কিশোর।

'কে, কিশোর?' রবিন বুঝতে পারছে না। 'কার এতো দরকার? মানে, র‍্যাগনারসনদের সেলিব্রেশন নিয়ে কার মাথাব্যথা?'

'আমিও সেকথাই ভাবছি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'ছবিগুলোই যেহেতু চাইছে, জবাব ওই ছবির মধ্যেই রয়েছে। দেখে বের করতে হবে।'

নাট টাইট দেয়া শেষ করলো মুসা।

'চলো তাহলে,' রবিন বললো। 'ছবিগুলো দেখে ফেলি।'

পথে খুব সতর্ক রইলো তিনজনেই, আবার হামলা হওয়ার আশঙ্কায়। ইয়ার্ডে ঢুকতেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই কিশোর, এদিকে আয়। তোদের স্যার এসেছেন। কি করে এসেছিস ইস্কুলে?'

দশ

অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন ডেভিড র‍্যাগনারসন, ইস্কুলের প্রিনসিপাল। বললেন, 'মিসেস পাশা, যদি কিছু মনে না করেন, ছেলেদের সঙ্গে আমি একটু একা কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তা ছেলেগুলো সত্যিই কিছু করেনি তো? ইস্কুলে কোনো অসুবিধে হবে না?'

'না না। অন্য ব্যাপার।'

এতোক্ষণে দুশ্চিন্তা দূর হলো যেন মেরিচাচীর। হেসে চলে গেলেন আবার অফিসে।

প্রিনসিপালকে ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে নিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। পুরনো একটা সুইডেন চেয়ার এনে দিলো বসার জন্যে। বসলেন তিনি। 'সরি, তোমাদেরকে বোধহয় ঘাবড়ে দিয়েছি।'

'না, স্যার,' মুসা বললো। 'আমরা তো কিছু করিনি। ঘাবড়াবো কেন। ডনের কথা বলতে এসেছেন বুঝি?'

'না। তবে কথাটা তোমাদের জানানো প্রয়োজন বোধ করলাম। তখন আলোচনা করে এসেছিলে তো, সে-জন্যে। রকে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে।'

'কী?' আগ্রহী হয়ে উঠলো কিশোর।

'গত দুই রাত ধরে অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানোয়ারের চিৎকার, অনেকটা নেকড়ের কিংবা কুকুরের ডাকের মতো। সেই সাথে খেপা অট্টহাসি, যেন পাগল হয়ে হেসেছে কেউ। দ্বীপে যতো লোক ছিলো সবাইকেই জিজ্ঞেস করেছি, ওরকম করে কেউই হাসেনি। তারপর দেখা গেছে ভূত। আর আজব আলো। কোত্থেকে যে এলো কিছুই বোঝা যায়নি।'

'কি...মানে, কোন্ ধরনের ভূত?' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা।

'একজনকে দেখে মনে হলো ডুবে মরা মানুষ, সারা গায়ে শ্যাওলা। আরেকজন পুরনো আমলের জাহাজের ক্যাপ্টেন লম্বা ঝুলওয়ালা কোট, পিতলের বোতাম...'

'আঁটো পাজামা, সোনালি সুতোর কাজ করা নীল ক্যাপ, গোড়ালি ঢাকা বুট,' প্রিনসিপালের কথাটা শেষ করে দিলো কিশোর। 'হাতে একটা পিতলের টেলিস্কোপ। ঠিক বললাম?'

'তুমি জানলে কি করে?' হাঁ হয়ে গেছেন ডেভিড।

'ভূতটাকে আমরাও দেখেছি। ডন র‍্যাগনারসনের কটেজে। আর কিছু ঘটেছে, স্যার?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রিনসিপাল। 'হ্যাঁ, জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। একটা টর্চ, একটা হান্টিং নাইফ, কয়েকটা কম্বল, একটা জ্যাকেট, একটা ক্যাম্প স্টোভ, বেশ কয়েক টিন খাবার আর বিয়ার ইতিমধ্যেই গায়েব। ভূতে নিশ্চয় এসব নিতে আসবে না। তবে ঘটনাগুলোর সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'ডন চুরি করেছে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'হতে পারে,' প্রিনসিপাল বললেন। 'নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। হয়তো ও চুরি করার সময় ছবি তুলেছিলে তোমরা, ছবিতে এসে গেছে, সেই ভয়েই নিগেটিভগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে সে। ইংমারের অফিস থেকে তোমরা চলে আসার পর কথাটা মনে হয়েছে আমার।'

'আমাদেরকে বলতে এলেন কেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আজব শব্দ আর ভূত ছোটদেরকেই বেশি ভয় দেখায়। বড়দেরকেও অবশ্য ছাড়ে না। রকে রাত কাটাতে রাজি হচ্ছে না এখন অনেকেই। সেলিব্রেশনের মজাই নষ্ট করবে দেখা যাচ্ছে! তবে সে-জন্যে তোমাদেরকে বলছি না। বলছি ডনকে ঠেকানোর জন্যে। ও যদি এসব করে থাকে সেটা বন্ধ করা দরকার। গোয়েন্দা হিসেবে তোমাদের অনেক সুনাম। আমার কানেও এসেছে কথাটা। আরও খারাপ কিছু করে বসার আগেই ডনকে থামাও, এটা আমার অনুরোধ।'

চুপ করে ভাবছে কিশোর।

'কি ভাবছো? ফী? তা-ও দেবো।'

'না, স্যার, এসব কাজের জন্যে টাকা নিই না আমরা। শখে করি। আর

আপনার কাছ থেকে নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। খুশি হয়েই করবো। আরেকটু সময় দিতে পারবেন, স্যার? রক থেকে তুলে আনা ছবিগুলো দেখবো এখন, এই যে,' হাতের খামটা দেখালো কিশোর। 'আপনিও দেখুন। হয়তো কিছু চোখে পড়বে আপনার। আমাদের চোখে এড়িয়ে যেতে পারে সেটা।'

'বেশ, বের করো।'

লম্বা বেঞ্চে ছবিগুলো সাজিয়ে রাখা হলো। তারপর মন দিয়ে দেখতে শুরু করলো সবাই।

'এই জলদস্যুদের মধ্যে ডন কোন্‌টা কি করে বুঝবো?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো মুসা। 'সবগুলোই তো একরকম লাগছে আমার কাছে।'

ডেভিড বাতলে দিলেন। 'একমাত্র ডনের হেলমেটেই নোজ গার্ড আছে। এই যে, এটা।'

মোট ষোলটা ছবিতে ডন রয়েছে। কোথাও ভাঁড়ামি করছে, কোথাও লড়াই করছে চুমাশদের সঙ্গে, খাবার বহন করছে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে, সেলিব্রেশনের আরও নানা খেলায় অংশ নিচ্ছে। মোট কথা মাতিয়ে রেখেছে। দুটো ছবিতে শুধু ব্যতিক্রম।

'পর পর নেয়া হয়েছে শটদুটো,' রবিন দেখে বললো।

চূড়ার কাছে বসে খাবার খাচ্ছে অনেকে, তাদের পেছনে রয়েছে ডন, ছবি দুটোতে। একটাতে নিচু হয়ে কিছু তুলছে, কি তুলছে বোঝা যায় না। আরেকটাতে সোজা হয়েছে, বিস্মিত, হাতে কিছু ধরে রেখেছে।

'কি ব্যাপার?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'একটা ব্যাপার শিওর,' মুসা বললো। 'ওর দিকে ক্যামেরা ধরেছো, দেখে ফেলেছে সে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'ওর ছবি নিতে দেখেছে কথা হলো, সবার পেছনে ওরকম ঝুঁকে কি করছিলো?'

'লুকাচ্ছিলো কিছু?' প্রিন্সিপালের মনে হলো।

'চোরাই মাল লুকাচ্ছিলো?' মুসার মনে হলো।

'নাকি কিছু তুলছিলো?' রবিনের মনে হলো।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এর যে কোনোটাই হতে পারে রকে যেতে হবে আমাদেরকে। ভূতের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শব্দ কোথা থেকে আসে তা-ও জানার চেষ্টা করবো। কে জিনিস চুরি করে, কেন করে, আর আমাদের তোলা ছবি কে কেন ছিনিয়ে নিতে চায়, সব জানতে হবে।'

'অসুবিধে হবে না,' প্রিনসিপাল আশ্বাস দিলেন। 'আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো। ভূতের ভয়ে যারা পালাবে না, রাতে থাকবে, তারা।'

'ডন দেখে ফেলবে না?' মুসা বললো। 'সব কিছুর মূলে সে হলে আমাদের সামনে কোনো রকম শয়তানী করবে না। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে।'

'বুঝতে যাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করবো। দ্বীপে থাকলে বেশির ভাগ সময়ই ভাইকিং কিংবা চুমাশ সেজে থাকি আমরা। আমাদের কিছু বন্ধু আছে,

যাদেরকে ভালোমতো চেনে না আমাদের পরিবারের সবাই। তোমাদেরকে পোশাক দিয়ে দেবো। বলে দেবো তোমরা আমার বন্ধু। আমাদের সাথে বসে ডিনার খাবে, রাত কাটাবে দ্বীপে। কেউ বাধা দেবে না।'

'তাহলে তো স্যার খুবই ভালো হয়,' কিশোর বললো। 'একটা কাজই বাকি রইলো এখন, আমাদের গার্জিয়ানদের অনুমতি নেয়া। তার জন্যে অবশ্য অসুবিধে হবে না। বললেই রাজি হবেন, বিশেষ করে আপনার কথা বললে। আজ রাতে রকে কাটাবো আমরা। টর্চ, ওয়াকি-টকি আর স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে ডকে দেখা করবো আপনার সঙ্গে। এই ঘন্টাখানেকের মধ্যে?'

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করবো।'

এগার

ছোট খাঁড়ির অন্ধকার পানিতে এসে থামলো মোটরবোট। আগুনের বিশাল কুণ্ড আর উজ্জ্বল চাঁদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বালির সৈকতে আর পাথরের ওপর। আগুনের পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করছে মানুষ, অদ্ভুত ছায়া পড়ছে বালিতে। মনে হচ্ছে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে তারা। আগুনের আভা একেবারে পানির কিনারে এসে পড়েছে, তীরে নামতে সুবিধে করে দিলো ডেভিড র‍্যাগনারসন আর গোয়েন্দাদেরকে। বোটটাকে টেনে ডাঙায় তুলতে প্রিনসিপালকে সাহায্য করলো মুসা।

'ডেভিড, তুমি?' ওপর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর ইংমার র‍্যাগনারসন।

'হ্যাঁ, আমি কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এসেছি

'ভালো করেছো। যতো বেশি ভাইকিং আর চুমাশ হয় ততোই ভালো জমে।'

ছেলেদেরকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চললেন প্রিনসিপাল। তাঁর পরনে হরিণের চামড়ার শার্ট-প্যান্ট, গলায় পুঁতির মালা, শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে রঙ করা-চুমাশ যোদ্ধাদের মতো করে। রবিন আর মুসার পরনে ভাইকিং পোশাক। কিশোর পরেছে ইনডিয়ান ওঝার সাজ। হরিণের চামড়ার আলখেল্লা, রঙ করা কাঠের মুখোশ পরে থাকতে একদম ভালো লাগছে না তার। বিড়বিড় করে বললো, 'জগদ্দল পাথর হয়ে গেছি। বাপরে বাপ, এত্তো ভার!'

চমৎকার লাগছে তোমাকে, কিশোর,' প্রিনসিপাল বললেন। 'শামান (ওঝা) হলো চুমাশদের খুব সম্মানিত পদ।'

'কেন, কিশোর, খারাপ লাগছে কেন?' হেসে বললো রবিন। এই কিম্ভূত পোশাকে কিশোরকে দেখে কিছুতেই হাসি চাপতে পারছে না। 'ম্যাজিশিয়ান হওয়ার না খুব শখ তোমার?'

'তা ঠিক,' গোঁ গোঁ করলো কিশোর। 'এখন তুড়ি মেরে তোমাদের দু'জনকে

উড়িয়ে দিতে পারলে আর কিছু চাইতাম না। পরেছো তো হালকা পোশাক, বুঝবে কি! তবে তোমাদেরকেও খুব সুন্দর লাগছে ভেবো না।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লো রবিন আর মুসা। র‍্যাগনারসনরা দুই ভাইও হাসলেন। মস্ত মুখোশের আড়ালে কিশোরও মুচকি হাসলো। বিশাল অগ্নিকুণ্ডের কাছে পৌঁছলো ওরা। অনেকে বসে আছে ওখানে। তাদের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাক্তার, ডেভিডের বন্ধু হিসেবে। পনেরো জন লোক খেতে বসেছে। ছেলেদের হাতেও কাগজের প্লেট ধরিয়ে দেয়া হলো। তাতে দেয়া হলো কাবাব করা মোষের মাংস, যবের রুটি, সেদ্ধ সীম আর সালাদ।

'ডনের দিকে চোখ রেখো,' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

'শুধু ডনই নয়,' কিশোর বললো। 'সন্দেহজনক সব কিছুর ওপর নজর রাখবে।' কাঠের মুখোশের মুখের কাছটায় বড় একটা ফাঁক। সেই পথে মুখের ভেতর খাবার পুরতে বেশ অসুবিধেই হচ্ছে।

খেতে খেতে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসা মানুষগুলোর ওপর নজর রাখছে তিন গোয়েন্দা। কেউ পরেছে চুমাশদের পোশাক, কেউ ভাইকিং জলদস্যুর। গনগনে কয়লার আঁচে তৈরি হচ্ছে কাবাব। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। খানিক দূরে, সৈকতের ওপরে একটা ছড়ানো জায়গায় সারি সারি তাঁবু। আগুনের আলো পড়েছে গিয়ে ওগুলোর ওপর।

'ডনকে দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'না,' জবাব দিলো রবিন। 'তবে হার্ডওয়্যারের দোকানের মালিককে দেখতে পাচ্ছি।'

আগুনের কাছ থেকে দূরে বসে আছেন জর্জ র‍্যাগনারসন। হাতে বিশাল একটা প্লেটে খাবার বোঝাই।

'একমাত্র লোক,' কিশোর বললো। 'যিনি স্বাভাবিক পোশাক পরেছেন।'

আগুনের পাশে বসা সবাই বেশ আন্তরিক। হাসিখুশি। অনর্গল কথা বলছে। জোক বলছে। হাসছে। কয়েকজনের কারো হাতে গিটার, কারো অ্যাকর্ডিয়ন। গান ধরলো কয়েকজন। ধীরে ধীরে গলা মেলালো অন্যেরা। শুরু হয়ে গেল গান। আমেরিকান আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান আঞ্চলিক গানের মিশ্রণ। তাদের সঙ্গে গলা মেলালো রবিন। অন্য দু'জন চুপ করে রইলো। কিশোরের এসব ভালো লাগে না, আর মুসা ঠিকমতো বুঝতেই পারে না।

আচমকা গান থামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো রবিন, 'ওই যে!'

তাকালো কিশোর, মুসা আর প্রিনসিপাল।

'হ্যাঁ, ডনই,' ফিসফিস করে বললেন ডেভিড র‍্যাগনারসন।

'ছিলো কোথায়?' আনমনেই বিড়বিড় করলো কিশোর।

'তাঁবুগুলোর দিক থেকে এলো বলে মনে হলো,' রবিন জানালো।

ভাইকিং পোশাক পরা। এগিয়ে এসে বসে পড়লো অন্যদের সঙ্গে, গানে যোগ দিলো। খাওয়া শেষ হলে প্লেটগুলো যখন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললো সবাই তখনও

বাজনা চলতেই থাকলো। কাগজের প্লেট, প্ল্যাস্টিকের কাঁটা চামচ আর ছুরিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সৈকতের পাশে বসানো ময়লার ড্রামে ফেললো একজন। রাত যতোই বাড়লো, ঠাণ্ডা বাড়তে থাকলো। সাগরের ওপর থেকে ভেসে এলো হালকা কুয়াশা। অনেকেই ফিরে গেল তখন মূল ভূখণ্ডে, জর্জ র‍্যাগনারসন সহ। একই ভাবে বসে ডনের ওপর চোখ রাখলো তিন গোয়েন্দা।

'কতো খায় ব্যাটা,' মুসা বললো।

'তোমার চেয়ে বেশি?' রবিন হাসলো।

'ছেলেটাকে আমি ঠিক সন্দেহ করতে পারছি না,' প্রিনসিপাল বললেন। 'অন্য কেউ কাজগুলো করছে হয়তো, দোষ এসে চাপছে ডনের ঘাড়ে, কারণ তার স্বভাব ভালো না।'

'সেই অন্য কেউটা এই দ্বীপেই রয়েছে,' কিশোর বললো, 'আমার বিশ্বাস।'

'অন্য কেউটা কি মানুষ, নাকি···?' প্রশ্নটা শেষ করলো না মুসা, প্রিনসিপালের দিকে তাকালো।

শব্দ আর ভূতের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। বাতাস আর আলোর কারসাজি হতে পারে। আর জিনিসপত্র চুরিও এমন কোনো ব্যাপার নয় এতো হুড়োহুড়ির মধ্যে এমনিতেও হারাতে পারে। একটার সাথে আরেকটার মিল আছেই, জোর দিয়ে বলা যাবে না। 'কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে।'

'বড় বেশি কাকতালীয়,' মেনে নিতে পারছে না কিশোর। 'আমার মনে হয় না এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। যোগাযোগ আছেই। কী, সেটাই খুঁজে বের করবো আমরা।'

'কিশোর!' বলে উঠলো মুসা। 'একটু আগেও ডন ছিলো, এখন নেই।'

'চলে গেছে! গেল কখন!' রবিনও অবাক হয়েছে।

আর মাত্র চারজন লোক বসে আছে, ডন নেই তাদের মাঝে। ভারি পোশাক আর মুখোশ নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'জলদি এসো!' কাঠের মুখোশ কণ্ঠস্বর ভোঁতা করে দিলো অনেকখানি, একপাশে কাত হয়ে আছে। তার মুখের তুলনায় জিনিসটা বেশি বড়। 'দূর! এই, এটা ঠিক করে দাও তো! এই ঘোড়ার ডিমও পরে নাকি মানুষ!'

হেসে তার মুখোশটা ঠিক করে দিলো দুই সহকারী। চাঁদের আলোয় কুয়াশাকে লাগছে হালকা সুতোর তৈরি অস্পষ্ট একটা চাদরের মতো। তার মধ্যে ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। তাঁবুগুলোর পাশ কাটিয়ে এলো। মাইলখানেক লম্বা দ্বীপটাতে গাছপালা নেই। সামনে কুয়াশার ভেতরে ভাইকিং পোশাক পরা একটা মূর্তিকে দ্রুত ঢুকে যেতে দেখা গেল।

'সে-ই,' চাপা গলায় বললো মুসা। 'গত দু'দিন ধরে এই পোশাকই পরে রয়েছে।'

কুয়াশার মধ্যে মূর্তিটাকে অনুসরণ করে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে চলে এলো গোয়েন্দারা। আকাশে মাথা তুলে রেখেছে যেখানে বিশাল দানবীয় টিলাটা। চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে। যেন কোনো অপার্থিব জানোয়ার অন্য

কোনোখান থেকে এসে নেমেছে পৃথিবীতে। ওটা ছাড়া দ্বীপের এই অংশে আর কিছু নেই। গোড়ায় ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে ঘন হয়ে।

'যাচ্ছে কোথায়?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'সোজাই তো চলেছে। দেখা যাক,' কিশোর বললো।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব মূর্তিটাকে অনুসরণ করে চললো ওরা। সতর্ক রয়েছে। লোকটা পেছনে ফিরে তাকালেই যাতে ঝট্ করে বসে পড়তে পারে। কিন্তু একটিবারও ফিরে তাকালো না ও। সোজা এগিয়ে চলেছে টিলাটার দিকে, তারপর...

'খাইছে!' মুসা অবাক। 'নেই তো!'

মুহূর্ত আগেও যেখানে ছিলো ডন র‍্যাগনারসন, এখন সেখানে কেউ নেই। শুধু পাক খেয়ে উড়ছে কুয়াশা।

বার

'একেবারে গায়েব!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। কণ্ঠস্বর নামিয়ে রাখার কথাও ভুলে গেছে।

'অসম্ভব। মানুষ কখনও গায়েব হতে পারে না,' বিশ্বাস করতে পারলো না কিশোর। চাঁদের আলোয় কুয়াশা পর্যন্ত চোখে পড়ছে। মানুষ না পড়ার কথা নয়।

'তাহলে গেল কোথায়?' মুসা প্রশ্ন করলো।

'ওই পাথর ডিঙিয়ে যায়নি,' রবিন বললো। 'তাহলে দেখতামই।'

'উড়ে গেল না তো!'

'আরে দূর,' হাত নাড়লো কিশোর। 'মানুষ কি উড়তে পারে নাকি? লুকিয়ে পড়েছে।'

ভারি মুখোশটা খুলে ফেলে নিচু হয়ে মাটির দিকে তাকালো সে। ডন যেখান থেকে উধাও হয়েছে সেই জায়গাটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলো। অন্য দু'জন পরীক্ষা করলো আরও খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদের আলো কমছে বাড়ছে, কুয়াশার ঘন-হালকা হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে।

একগুচ্ছ রোম খুঁজে পেলো মুসা। 'এই কিশোর, দেখ তো?'

পাঁচ ফুট উঁচু ঘন একটা চিরসবুজ ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। একসারি জুনিপারের ঝোপ রয়েছে পাথরের এই পুব পাশটায়।

আলখেল্লার ভেতর থেকে খুদে একটা টর্চ বের করে আনলো কিশোর। ঝোপের ওপর আলো ফেললো। রোমগুলো যেখানে লেগেছে তার পাশের কয়েকটা ডাল ভাঙা। ওগুলোর পেছনে ঝোপের অন্যপাশে বাঁয়ে একটা ফোকরমতো, বোধহয় সুড়ঙ্গ মুখ।

রোমগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বললো,'ভাইকিং পোশাকেরই মনে হচ্ছে। কাপড়ও লেগে রয়েছে খানিকটা। নিশ্চয় তার টিউনিক থেকে ছিঁড়েছে। ওই ঝোপের আড়ালে আড়ালেই আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে ডন।'

গাছের সারি আর টিলার মাঝের খালি লম্বা জায়গাটা ধরে আগে আগে এগোলো কিশোর। পেছনে চললো অন্য দু'জন। কিছুদূর এগিয়ে দক্ষিণে বাঁকা হয়ে গেছে পথটা। যে ঝোপের কাছ থেকে যাত্রা শুরু করেছে, বড় জোর তার বিশ গজ দূরে এসেই শেষ হয়ে গেল জুনিপার। আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ওরা। চাঁদের আলোয় লুকোচুরি খেলছে কুয়াশা, আর কিছু নেই। কাছেই তীরে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ।

'হায় হায়, বেশি দূর তো নয়!' মুসা বললো।

'তবু যথেষ্ট,' বললো কিশোর। 'ঝোপের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে এসে আরেক দিকে চলে গেছে। টিলার গোড়ায় পথটা বেঁকে গেছে বলেই আমাদের চোখে পড়েনি। মনে হয়েছে গায়েব হয়ে গেছে।'

'গেল কোথায়?' চারদিকে তাকাতে লাগলো মুসা।

এক চিলতে পাথুরে ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। একধরনের গুল্ম জন্মে রয়েছে এখানে, হলুদ ফুল ফোটে। একপাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে দানবীয় টিলাটা, খুদে পাহাড়ই বলা চলে এটাকে। কয়েকটা ছোট ছোট চূড়া রয়েছে। আরেক পাশে সাগর ঢেউয়ের মাথায় ফেনা নাচানাচি করছে। গাছশূন্য অঞ্চলটাকে চিরে ফালা ফালা করেছে যেন অনেকগুলো লম্বা গিরিখাত।

'খাত-টাত অনেক কিছুই আছে,' দেখতে দেখতে বললো রবিন। 'যেখানে খুশি লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'কিন্তু কেন? চুরি করে কিছু এনেছে বলে তো মনে হয় না।'

'একই প্রশ্ন আমারও,' কিশোর বললো। 'ধারে কাছেই কোথাও রয়েছে এখন সে। কোথায়? দ্বীপের এখানটায় বেশি দূর যেতে পারবে না সে, জায়গাই নেই। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করি আমরা। নেহায়েত দরকার না পড়লে টর্চ ব্যবহার করবে না। আমাদের যেন না দেখে।'

'আচ্ছা,' রবিন বললো। 'ফাঁদে পড়েছে ব্যাটা। দেখা না দিয়ে পালাতে পারবে না এখান থেকে।'

ছড়িয়ে পড়লো তিনজনে, তিন দিকে। সাগরের ওপর থেকে ভেসে আসছে কুয়াশা, জমে জমে ঘন হচ্ছে, তারপর দমকা বাতাস এসে ফুঁ দিয়ে যেন হালকা করে ফেলছে। আবার আসছে কুয়াশা, জমছে, আবার হালকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে। চলছে এমনি। ফলে একবার উজ্জ্বল হচ্ছে চাঁদের আলো, একবার মলিন। আলোর এক বিচিত্র খেলা চলেছে যেন।

খুঁজতে খুঁজতে এগোলো ওরা। টিলার পশ্চিম ধারে ছোট একটা লুকানো খাঁড়ির পাড়ে এসে শেষ হয়ে গেল সমস্ত গিরিখাত। দক্ষিণে খানিকটা উঁচু ভূমি, উত্তরে বিশাল টিলা খাঁড়িটাকে রক্ষা করছে প্রশান্ত মহাসাগরের খোলা ঢেউয়ের আঘাত থেকে।

'নাহ্, হারিয়েই ফেললাম!' নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মুসা।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোরকেও অসুখী লাগছে।

রবিন আর মুসাকে নিয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠে এলো সে। কিন্তু এখানেও কেউ

লুকিয়ে নেই।

'গেল কোথায়?' খাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললো রবিন। ঘন কুয়াশা যেন ঝুলে রয়েছে ওখানে পানির ওপর। 'কিশোর, কি করবো?'

'কি আর, ফিরে যাবো। যেখান থেকে উধাও হয়েছে ডন। সূত্র খুঁজবো। তখন কোনো কিছু চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকলে এখন সেটা বের করার চেষ্টা করবো। আর না পারলে,' বিকৃত মুখোশটা দুলিয়ে বললো গোয়েন্দাপ্রধান, 'ফিরে যাবো আগুনের কাছে। র‍্যাগনারসনরা কিছু দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করবো।'

জ্যোৎস্না ধোয়া জায়গাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে ফিরলো কিশোর। পা বাড়াতে গিয়েই যেন জমে গেল।

নিচে, খুদে খাঁড়িটার পাড়ে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে করে টর্চ জ্বেলেছে একটা মূর্তি। বড় টর্চ, উজ্জ্বল আলো।

দম বন্ধ করে ফেললো ছেলেরা। নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে। এপাশ ওপাশ নড়ছে টর্চ। কুয়াশাকে কেটে দুই টুকরো করে দিতে চাইছে যেন উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। আলোর লম্বা একটা আঙুল যেন আতিপাতি করে খুঁজছে কোনো কিছু। জোরালো হাওয়া এসে হালকা করে দিলো কুয়াশা, দেখতে দেখতে আবার ভারি হয়ে জমে গেল যেন খাঁড়ির ওপরে। খাঁড়ির মুখের কাছ থেকে কুয়াশার ভেতরে খুঁজেই চলেছে যেন আলোর আঙুলটা।

'কিশোর!' হাত তুললো রবিন।

বার সাগরে, একটা জাহাজের গায়ে গিয়ে পড়েছে আলো। ঢেউয়ে দুলছে জাহাজটা। কুয়াশা ঘন হলে মিলিয়ে যাচ্ছে, হালকা হলেই অবয়বটা ফুটে উঠছে আবার। একমাত্র মাস্তুলে ঝুলছে ধূসর রঙের পাল, তাতে অসংখ্য ফুটো। ধূসর ছায়া এমনভাবে ঢেকে রেখেছে ডেকটাকে, যেন ফাঙ্গাসের স্তর পড়েছে। টর্চের আলোয় রাতের সাগরে কুয়াশার মধ্যে লুকোচুরি খেলছে যেন একটা ভূতুড়ে জাহাজ।

'ও-ওটা কি!' কথা আটকে যেতে চাইলো রবিনের।

কিশোরেরও প্রায় একই অবস্থা, 'দে-দেখো...'

ওদের চোখের সামনেই মিলিয়ে গেল জাহাজটা। মুহূর্ত আগেও ছিলো। পরক্ষণেই নেই। উঁচু ঢেউয়ের খাঁজে নেমে যেন চোখের পলকে তলিয়ে গেল।

নিভে গেল টর্চ।

'এসো, ধরবো...,' বলতে বলতেই পাথরের ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো মুসা। খাঁড়ির মুখের কাছে যাবে।

রাতের নীরবতাকে খানখান করে দিলো যেন একটা চাপা গর্জন। চেঁচিয়ে উঠলো একটা ভয়াল কণ্ঠ, 'অ্যাভাস্ট, ইয়ে ন্যাভিস!'

চমকে গেল তিন কিশোর। মুখ তুলে তাকালো শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে।

খাঁড়ির মুখের কাছে খানিকটা উঁচু জায়গা রয়েছে। পাথরের একটা বেদিমতো। তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে দা স্টার অভ পানামা জাহাজের ক্যাপ্টেন কুলটার। গায়ে লম্বা নীল কোট। পিতলের বোতাম। সোনালি সুতোয়

কাজ করা নীল ক্যাপ। আঁটো প্যান্ট। তার চারপাশে পাক খেয়ে উড়ছে কুয়াশা।

হাড্ডিসর্বস্ব একটা হাত তুলে তিন গোয়েন্দার দিকে পিস্তলের মতো তাক করলো ক্যাপ্টেন। হিসিয়ে উঠে বললো, 'চোর! ডাকাত!'

লম্বা, মারাত্মক ভোজালি দেখা দিলো তার হাতে। কোপ মারার ভঙ্গিতে সেটা তুলে এগিয়ে আসতে লাগলো ছেলেদের দিকে।

'খাইছে! ভূ-ভূ-ভূত!' পালাও বলেই দৌড় দিলো মুসা।

রবিন তো বটেই, এমন কি কিশোরও ভোঁ দৌড় দিতে একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো না।

তের

উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে সরু উপত্যকা ধরে একছুটে টিলার বাঁকটার কাছে চলে এলো ওরা। ভূতুড়ে মূর্তিটাকে দৌড়ে হারানোর বাজি ধরেছে যেন। একটিবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকালো না। মুসার হেলমেট পড়ে গেল মাথা থেকে, কিশোর ফেলে দিলো তার মুখোশ। তোলার চেষ্টাও করলো না কেউ। একমাত্র লক্ষ্য, কি করে আগুনের কাছে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারবে। তাদের ছুটে আসাটা নজরে পড়লো ডেভিড আর ইংমারের। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে এলেন তাঁরা।

'কি হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলে?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন প্রিনসিপাল, 'আমরা এদিকে খুঁজে মরছি!'

'কি ব্যাপার?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা-ডনের-পিছু-নিয়েছিলাম!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা।

'ফাঁকি দিয়ে পালালো,' জোরে জোরে দম নিচ্ছে কিশোর। 'আগে আগে চলছিলো। হঠাৎ করে হারিয়ে গেল কোথায়...'

'একটা জাহাজ দেখলাম!' রবিন জানালো।

'তারপর একটা ভূত!' বললো মুসা।

'আরেকজনকে দেখলাম,' কিশোর বললো। 'হাতে একটা টর্চ।'

হাত তুললেন প্রিনসিপাল। 'শান্ত হও। খুলে বলো সব কিছু। এখান থেকে উঠে যাওয়ার পর কি কি ঘটলো?'

'বলছি।' লম্বা দম নিয়ে শুরু করলো কিশোর, 'আরেক দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কোন ফাঁকে আগুনের কাছ থেকে উঠে চলে গেল ডন। আমরাও উঠে গিয়ে তাকে দেখলাম কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দ্বীপের শেষ প্রান্তের টিলাটার দিকে চলেছে।' তারপর যা যা ঘটেছে সব খুলে বললো সে।

'আবার একই কাণ্ড!' বলে উঠলেন ডেভিড।

'শুধু ভূতুড়ে জাহাজটা বাদে!' যোগ করলেন ইংমার।

'হ্যাঁ। সম্ভবত দা ফ্লাইং ডাচম্যান।'

'ওটা আবার কি?' জানতে চাইলো মুসা।

'দা ফ্লাইং ডাচম্যান হলো,' গল্পটা জানা আছে কিশোরের, 'একটা কিংবদন্তী। খারাপ কাজ করেছিলো একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন। এর শাস্তি হিসেবে জাহাজটা তার চলতেই থাকলো, চলতেই থাকলো, কোনো বন্দরে পৌঁছলো না, কোথাও থামলো না। শেষে তার প্রাণ বাঁচালো এক মহিলা। এই গল্প নিয়ে নাটক তৈরি হয়েছে।'

'সিনেমাও হয়েছে,' রবিন বললো। 'অনেক আগেই দেখেছি আমি।'

ঢোক গিললো মুসা। 'তার মানে ওটা ভূতুড়ে জাহাজ!'

'ডেভিড ভয় দেখিয়ে আনন্দ পায়, মুসা,' হেসে বললেন ডাক্তার। 'ওসব রসিকতা আর গালগল্প বাদ দিয়ে গিয়ে দেখা দরকার তোমরা সত্যি সত্যি কি জিনিস দেখেছো।'

'তাই চলো,' প্রিনসিপাল বললেন।

'চলুন,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

দ্বিধা করতে লাগলো মুসা। শেষে বলেই ফেললো, 'কিশোর, আমি না গেলে হয় না?'

'দূর, চলো তো,' কিশোর বললো। 'এতো ভয় কিসের?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হলো মুসাকে।

বাতাস এখন প্রায় একটানা বইছে। ফলে টিকতে পারছে না কুয়াশা। চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়েছে। দ্রুত টিলার গোড়ায় পৌঁছে গেল দলটা। যেখান থেকে হারিয়ে গেছে ডন। রবিন জানালো, কি করে এখানে ঝোপের গায়ে টিউনিকের ছেঁড়া টুকরো পেয়েছে। কিভাবে জুনিপারের ধার দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে খাঁড়ির ধারে।

'আমাদের মনে হলো,' কিশোর বললো, 'অগ্নিকুণ্ডের কাছে যায়নি ডন। লুকিয়ে পড়েছে। তাই এগিয়েই চললাম। গিরিখাদ আর লুকিয়ে থাকার মতো সমস্ত জায়গায় খুঁজলাম। পেলাম না। কিভাবে যে কোথায় গায়েব হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।'

'তারপর দেখলাম,' রবিন বললো। 'খাঁড়ির কিনারে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালছে কেউ। জাহাজটা দেখা গেল...'

'আর আরেকটু হলেই,' কেঁপে উঠলো মুসা। 'ক্যাপ্টেন কুলটারের ভূতটা এসে মুণ্ডু কেটে ফেলেছিলো আমাদের!'

'ওসব কিছু না,' সাহস জোগালেন ওদেরকে প্রিনসিপাল। 'এগোও। আগের বার যে পথে যে পথে গিয়েছিলে।'

পরিষ্কার আকাশ। ঝকঝকে চাঁদের আলো এখন। বাতাস বাড়ায় ঢেউও বেড়ে গেছে। দক্ষিণের নিচু টিলাটার গায়ে এসে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ, পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে কোয়ারার মতো। খুদে খাঁড়িটার কাছে পৌঁছে কিছুই দেখা গেল না। কুয়াশা নেই। খাঁড়ির মুখের কাছ থেকে সাগর অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। জাহাজ-টাহাজ কিছুই চোখে পড়লো না।

'চলমান আলোও তো নেই,' কপালের কাছে হাত ঠেকিয়ে দূরে দেখার চেষ্টা

করছেন ইংমার। 'নাহ্, কোনো জাহাজ নেই।'

ঢাল বেয়ে উঁচু পাথুরে জায়গাটা থেকে খাঁড়ির সরু সৈকতে নেমে এলো কিশোর। চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'এখানেই ছিলো। ঠিক এই জায়গাটায় থেকে টর্চের আলো ফেলেছে জাহাজের ওপর।'

'এই, দেখ!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। নিচু হয়ে ছয় ব্যাটারির বড় একটা টর্চ কুড়িয়ে নিলো সে।

টর্চটা হাতে নিয়ে দেখলেন প্রিনসিপাল। 'হ্যাঁ, এটাই চুরি হয়েছিলো আমাদের তাঁবু থেকে, কোনো সন্দেহ নেই। দেখ, মারকাস র‍্যাগনারসনের নাম লেখা রয়েছে।'

'তার মানে চুরিই গিয়েছিলো,' রবিন বললো। 'হারানো টারানো নয়।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বললো। 'আর চোরের সঙ্গে সাগরের ওই জাহাজের কোনো সম্পর্ক রয়েছে।'

'কিশোর, জাহাজটাকে সংকেত দেয়নি তো?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। পথ দেখিয়ে খাঁড়িতে এনেছিলো হয়তো।'

'ক্যাপ্টেনের ভূতটার ব্যাপারে কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'ওটাকে ওই পাথরের ওপর দেখেছি,' হাত তুলে দেখালো রবিন। 'টর্চ চোরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বলতে পারবো না।'

'একটা কথা বলতে পারবো,' মুসা বললো। 'ভূতটা আমাদের এখানে আসা পছন্দ করেনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো কিশোর। 'ঠিকই বলেছো। ভূত হোক আর যা-ই হোক, ক্যাপ্টেন কুলটার আমাদের গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করতে পারেনি। বাধা দিয়েছে যাতে টর্চধারীর পরিচয় জানতে না পারি। রহস্যময় লোকটাকে ডনের কটেজে দেখার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে দু'জনের মাঝে কোনো একটা যোগাযোগ রয়েছে।'

'তুমি ভাবছো,' প্রিনসিপাল বললেন। 'ডনই টর্চ নিয়ে এসেছিলো এখানে?'

'হতে পারে।'

'তারমানে ওই জাহাজটার সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে,' ডাক্তারের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'এবং তার অর্থ স্মাগলিং কিংবা আরও খারাপ কিছুতেই জড়িয়ে গেছে ছেলেটা!'

'আমার তাই মনে হয়, স্যার।'

'তোমার কোনো পরামর্শ আছে, কি করতে হবে?'

জ্যোৎস্নালোকিত খাঁড়ির চারপাশে ধীরে ধীরে তাকালো আরেকবার কিশোর। উঁচু জায়গাটায় এখন একটু কুয়াশাও নেই।

'ভূতটা আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছে,' বললো সে। 'তবে আমার বিশ্বাস, আমরাও তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। মনে হয় না আজ রাতে আর এখানে কিছু ঘটবে। ডনকে খুঁজে বের করা দরকার। হয়তো সে কিছু বলতে পারবে।'

এক সারিতে ছড়িয়ে পড়লো ওরা। দানবীয় টিলা থেকে শুরু করে দ্বীপের দক্ষিণ তীরের ছোট টিলাটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে খুঁজলো, ফিরে এলো আবার ধীরে

ধীরে। শুধু জ্যোৎস্নার ওপর আর ভরসা করলো না এবার। টর্চও জ্বেলে নিয়েছে। মস্ত টিলাটা ঘুরে দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি চলে এলো, কিছুই পেলো না। এগিয়ে চললো পুব দিকে, যেখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। অল্প কয়েকজন মানুষ এখন বসে রয়েছে আগুনের কাছে।

'দেখ!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

আগুনের পাশে বসে রয়েছে ডন র‍্যাগনারসন। পরনে ভাইকিং পোশাকই রয়েছে, শুধু হেলমেটটা খুলে রেখেছে। দুই জোড়া দম্পতির সঙ্গে বসে আরাম করে মদ খাচ্ছে। ছেলেদের দেখে দাঁত বের করে হাসলো। হাত নেড়ে আমন্ত্রণ জানালো তার সাথে গিয়ে মদ খাওয়ার জন্যে। টিটকারির ভঙ্গিতে।

মুসা আর কিশোরের মুখোশ নেই। ফেলে যে দিয়ে এসেছে আর তুলে আনেনি।

'তখনই বুঝেছি,' হাসতে হাসতে বললো ডন। 'যখন ডেভিড আংকেলের সঙ্গে তোমাদেরকে বোটে দেখলাম। তিন গোয়েন্দা! হাহ্ হাহ্! আসলে থ্রি স্টুজেস। ছদ্মবেশে এলে কি হবে? তোমাদের ওই কালো নিগ্রোটা কি আর ঢাকা পড়বে কোনো পোশাকের মধ্যে।'

কিছু বলতে সবে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিশোর, রবিন বলে উঠলো, 'আর কি জানো তুমি?' রাগ চাপতে পারছে না সে। 'এটাও নিশ্চয় জানো দা স্টার অভ প'নামা জাহাজের ক্যাপ্টেন কুলটারের পোশাক পরে কে ঘুরে বেড়ায়?'

'ক্যাপ্টেন কি?'

'ক্যাপ্টেন কুলটার কে ভালো করেই জানো তুমি,' ফোঁস করে উঠলো মুসা। 'অতো ভণিতা করছো কেন? তোমার কটেজে তাকে দেখেছি আমরা। তার সঙ্গে কথাও বলেছি।'

কিশোর বললো, 'তুমি নিশ্চয় জানো কোন্ জাহাজে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন তোমার পূর্বপুরুষ নাট র‍্যাগনারসন। কি করে জাহাজ ডুবলো। কি করে তিনি বেঁচে ফিরলেন রকি বীচে। এই যে সেলিব্রেট করছো, তাঁরই তো স্মরণে।'

'ঘেউ ঘেউ করে চলেছো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমি শুধু কয়েকটা দিন পিকনিক করে কাটাতে এসেছি এখানে।'

'পারিবারিক ইতিহাস কিছু জানে না ডন,' শুকনো গলায় জানালেন ডক্টর ইংমার।

'কিন্তু তার ঘরে ক্যাপ্টেন কুলটারকে দেখেছি আমরা,' জোর দিয়ে বললো রবিন।

ভুরু কোঁচকালো ডন। 'আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলে?'

'চোরাই ফটোগুলোর খবর করতে,' জবাব দিলো কিশোর। 'তুমি ওগুলো চেয়েছিলে, মনে নেই?'

'আর কে চায় তার কথা বলো।'

'ওই লোকটা কে?' প্রশ্ন করলো মুসা। 'টিলার ওধারে ছোট খাঁড়ির পাড়ে দাঁড়িয়ে যে টর্চ জ্বালছিলো? সাগরের দিকে মুখ করে?'

'আমি কি করে বলবো? ওখানে কখনও যাইইনি।'

'তোমার টর্চটা কোথায়?' জানতে চাইলো রবিন।

'এই তো,' রোমশ আলখেল্লার ভেতর থেকে টর্চ বের করে দেখালো ডন। খাঁড়িতে যেটা পেয়েছে সেটার মতোই দেখতে। একই জিনিস।

'একটু আগে খাঁড়ির কাছে সাগরে একটা জাহাজ দেখা গেছে,' কিশোর বললো। 'ওটার কথা কি কি জানো তুমি?'

'আমি কোনো জাহাজই দেখিনি।'

আগুনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছেলের মুখ। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডাক্তার। উঠে যার যার তাঁবুতে চলে গেছে দুই জোড়া দম্পতি। শুধু ডন বসে রয়েছে এখন আগুনের ধারে।

'আমার মনে হয় না ও কিছু করেছে,' ডাক্তার বললেন। 'এসবের অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' প্রিনসিপাল বললেন। 'তোমাদের কি মনে হয়?'

'আপাতদৃষ্টিতে তো সেরকমই লাগছে, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর।

'বোকাগুলোর মুখে এই প্রথম একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা শুনলাম,' ঘোষণা করলো যেন ডন। উঠে দাঁড়ালো। 'বাবা, ঘুমোতে যাচ্ছি। নাকি সেটা করা বারণ আমার?'

বাবার জবাবের অপেক্ষা করলো না সে। হাঁটতে শুরু করলো তাঁবুর দিকে। চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর।

ছেলের সাথে কথা বলার জন্য দ্রুত এগোলেন ডাক্তার। মাঝপথে থামিয়ে কি যেন বলতে লাগলেন। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে থাকলেন দু'জনে। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন প্রিনসিপাল, ওরা আগুনের আলোর বাইরে না চলে যাওয়া পর্যন্ত।

'কিশোর, এবার কি করবে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ঘুমোতে যাওয়াই উচিত,' কিশোর বললো। 'রাতে পাহারার ব্যবস্থা অবশ্যই করবো। কিছু ঘটলে যাতে দেখতে পাই। তারপর সকালে দিনের আলোয় গিয়ে ভালোমতো খুঁজবো দ্বীপের পশ্চিম ধারটা। কোনো কিছু থেকে থাকলে বের করবোই। বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না কোনো মানুষ।'

'তোমাদের সঙ্গে আমিও পাহারা দেবো,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন প্রিনসিপাল। 'প্রথমে পাহারা নাহয় আমিই দিই।'

'তাহলে তো ভালোই হয়, স্যার। চারজন হলাম আমরা। দু'ঘন্টা করে পাহারা দিলে আট ঘন্টা জাগতে পারবো। ওয়াকি-টকি আছে আমাদের সাথে। রবিনেরটা আপনাকে দেবে, পাহারার সময়। একটা সময় তাকে জাগিয়ে দিয়ে আপনি ঘুমোতে যাবেন।'

রাতে অনেক পরিবারই থাকতে রাজি হয়নি, চলে গেছে, কিন্তু তাদের তাঁবু খাটানোই রয়েছে। ওরকম একটা তাঁবুতেই তিন গোয়েন্দার ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিলেন ডেভিড। শোয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ জেগে রইলো ওরা। অদ্ভুত ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করলো। ঘমিয়ে পড়লো অবশেষে, কানে ঢেউয়ের শব্দ

নিয়ে।

একটা পর্যন্ত জেগে রইলেন প্রিনসিপাল। তারপর রবিনকে জাগিয়ে দিলেন। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছেই। তার পাশে এসে হাঁটুতে থুঁতনি ঠেকিয়ে বসে পড়লো তিন গোয়েন্দার নথি-গবেষক। তাকিয়ে রয়েছে গনগনে কয়লার দিকে। কানে আসছে ঢেউ আর বাতাসের গর্জন।

হঠাৎ রাতের স্তব্ধতাকে চিরে দিলো রক্ত জমাট করা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

চোদ্দ

মুমূর্ষু আগুনের সামনে বসে বরফের মতো জমে গেল যেন রবিন।

আবার শোনা গেল চিৎকার। বুনো, জোরালো, বুকের মধ্যে কাঁপন জাগায়। নেকড়ের ডাকের মতো। না না, সিনেমায় দেখা নেকড়ে-ভূত মায়া নেকড়ের মতো! ওয়াকি-টকিতে ডাকলো সে, 'কিশোর! মুসা! জলদি ওঠো!'

আবার শোনা গেল ডাক!

সত্যিই কি মায়া নেকড়ে!

গায়ে কাঁটা দিলো রবিনের। আগুনে কাঠ আর কয়লা ছুঁড়ে দিলো। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। কম্বলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেও শীত লাগছে তার। তবে গায়ের কাঁপুনিটা বোধহয় বাড়িয়ে দিয়েছে ওই ডাক।

'ও-ওটা কি?'

বেরিয়ে এসেছে মুসা। গায়ে কম্বল জড়ানো। খাদ্য পেয়ে আবার বাড়তে শুরু করেছে আগুন। রবিনের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লো সে।

'আআমি···আমি জানি না!'

মিস্টার ডেভিড বেরিয়ে এলেন। গায়ে হরিণের চামড়ার তৈরি চুমাশ শার্ট। হাতে রাইফেল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। 'এই ডাকই শুনেছি গত দু'রাতে। কোত্থেকে আসছে আন্দাজ করতে পারো?'

যেন প্রিনসিপাল সাহেবের কথা কানে গেল ভূতটার। বাতাস আর ঢেউয়ের গর্জনকে ছাপিয়ে আবার শোনা গেল ওটার চিৎকার। ভয়াবহ, রোমাঞ্চকর।

একসাথে দ্বীপের পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল তিন জোড়া চোখ। বিশাল টিলাটার ওদিক থেকে এসেছে।

'ওখানেই কোথাও!' রবিন বললো। আরও কিছু কাঠ আর কয়লা ফেললো আগুনে। আবার জেগে উঠলো আগুন, দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো। 'একটা জায়গা থেকেই আসছে। সরছে না।'

'হ্যাঁ,' একমত হলেন প্রিনসিপাল।

'যেখানে ক্যাপ্টেনের ভূতটাকে দেখেছি!' বিড়বিড় করলো মুসা।

তাদের পেছনে এসে দাঁড়ালো কিশোর আর ডক্টর ইংমার। ডাক্তারের পরনে সোয়েট স্যুট, হাতে রাইফেল।

'জাহাজের ক্যাপ্টেন কখনও নেকড়ের মতো চিৎকার করে না, সেকেণ্ড,' কিশোর বললো। 'আর এই দ্বীপে তো দূরের কথা, সমস্ত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতেও কোথাও বুনো নেকড়ে নেই।'

আবার শোনা গেল ভয়ংকর ডাক।

'ওই যে!' নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'বড় টিলাটার কাছেই মনে হচ্ছে,' ডাক্তার শুনে বললেন।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'হ্যাঁ, ওদিক থেকেই এসেছে।'

'একআধটা নেকড়ে-টেকড়ে ওখানে আটকা পড়েনি তো?' ইংমারের জিজ্ঞাসা। 'কোনোভাবে হয়তো এসে পড়েছিলো...'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়লো কিশোর। 'নেকড়ে এখানে আসতেই পারে না!'

'আসল নেকড়ে পারে না,' মুসা বললো। 'জ্যান্তগুলো। কিন্তু ভূতেরা পারবে না কেন? তাদের কোথাও যেতে বাধা নেই। ক্যাপ্টেন কুলটারের মতো।'

'একটা কথা জোর দিয়ে আমি বলতে পারি, মুসা, ওগুলো যে হোক, বা যা-ই হোক, ওই ভূত আর নেকড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কোনো বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে,' ডাক্তারের দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'আপনার ছেলে কোথায়?'

'ইয়ে,' থতমত খেয়ে গেছেন ডাক্তার। 'শেষবার দেখেছি...'

'এই যে আমি, এখানে, মোটোরাম।'

নামটা পিত্তি জ্বালিয়ে দেয় কিশোরের। তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিতে ওই একটা সম্বোধনই যথেষ্ট। কিছুতেই মনে করতে চায় না সে এই নাম। এটা তার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন (পাগল সংঘ দ্রষ্টব্য)। ঝট্ করে ঘুরে তাকালো সে।

আগুনের আলোয় এসে দাঁড়ালো ডন র‍্যাগনারসন, বাবার পেছনে। যে দুই জোড়া দম্পতি দ্বীপে রয়ে গেছে, তারাও বেরিয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। আরেকবার নেকড়ের ডাক শুনে কেঁপে উঠলো মহিলা দু'জন।

'অন্যের কথা বলতে পারবো না,' একজন মহিলা বললো। 'তবে আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর থাকছি না আমি এখানে। যা খুশি ঘটুকগে, আমি পালাবো।'

'চলো, এখুনি চলে যাই,' তার স্বামী বললো।

'চলো। দাঁড়াও, ব্যাগটা গুছিয়ে আনি।'

'আমিও থাকবো না,' দ্বিতীয় মহিলা বললো।

হাত তুললো কিশোর। 'এতো অস্থির হবেন না। ওই ডাকের স্রষ্টা কোনো নেকড়ে নয়। আপনাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছে কেউ।'

'এবং তাতে সফল হয়েছে সে,' বললো দ্বিতীয় মহিলার স্বামী। 'এখানে আনন্দ করতে এসেছিলাম আমরা, ভয় পেতে নয়।'

'সকাল পর্যন্ত থেকেই দেখুন না,' অনেকটা অনুরোধের সুরে বললো কিশোর। আমি বলছি, খারাপ কিছু ঘটবে না। কাল সকালে আমরা ওই সূত্রের উৎস খুঁজে বের করবো। ভূতগুলো আসলে কি, জানার চেষ্টা করবো।'

ডন বললো, 'আমি আর থাকতে রাজি না। চলেই যাবো।'

তার কথায় অবাক না হয়ে পারলো না কিশোর।

কিশোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন প্রিনসিপাল। 'এখনি গিয়ে দেখা দরকার কিসে ওরকম শব্দ করছে। কিশোর ঠিকই বলেছে। এই দ্বীপে নেকড়ে বাঘ নেই।'

'যদি কেউ এনে ছেড়ে দিয়ে না থাকে,' ডন বললো।

'তা-ও নয়!' কিশোর বললো। 'ভালোমতো ভেবে দেখ। একটা জায়গা থেকেই আসছে চিৎকার। নড়ছে না, সরছে না। সত্যিকারের নেকড়ে হলে ওভাবে একজায়গায় থাকতো না। খাবারের জন্যে ডাকাডাকি করে নেকড়ে। এই দ্বীপে খাবার কোথায়? নেকড়ের নেচারাল খাবার নেই। পেতে হলে তাকে মানুষের কাছে আসতেই হবে, তার মানে তাঁবুর কাছে।'

'তাহলে হয়তো আসল নেকড়ে নয়। অন্য কিছু।'

'হ্যাঁ, তাই,' গলা মিলিয়ে বলে উঠলো এক মহিলা। 'ভূত! আমি বাপু আর একটা মুহূর্তও থাকছি না!'

'বেশ, আর কেউ না যেতে চাইলে নেই,' প্রিনসিপাল বললেন। 'আমি ছেলেদেরকে নিয়ে যাবোই। আমরা ফিরে আসাতক অন্তত থাকো। ইংমারের কাছে রাইফেল আছে। সে তোমাদেরকে পাহারা দেবে।'

'ফিরে আসতে পারেন কিনা দেখেন!' নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলো ডন।

দম্পতিরা কোনো মন্তব্য করলো না। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে টর্চ হাতে রওনা হয়ে গেলেন প্রিনসিপাল। চারজনে আবার এগিয়ে চললেন বিশাল টিলাটার দিকে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। চাঁদ ডুবে গেছে। রাত্রি এখন অন্ধকার। শাঁই শাঁই করে বয়ে চলেছে বাতাস, ঝাপটা মারছে টিলার গায়ে। পাথরের ওপর এসে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। তারার আলোয় ঝিকমিক করছে শাদা ফেনা।

আবার ডাকলো নেকড়ে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো ওরা। টর্চের আলোয় বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর।

'দুই মিনিট পর পর ডাকছে,' হিসেব করে বললো সে। 'বেশি নিয়মিত। কোনো জানোয়ারই এরকম সময় মেপে ডাকে না।'

গাছশূন্য এলাকা ধরে হেঁটে চলেছে দলটা। সবার হাতে টর্চ। আলোকরশ্মি নাচানাচি করছে এখানে ওখানে, যেন রহস্যময় শব্দকারীকে বিদ্ধ করার জন্যে।

আবার শোনা গেল চিৎকার।

'ওদিকে!' টিলার উত্তর দিকে দেখালো রবিন।

আবার চিৎকার।

'খাইছে! এগিয়ে আসছে তো!' হাতের টর্চ কেঁপে উঠলো মুসার।

রাইফেলে শক্ত হলো প্রিনসিপালের হাতের আঙুল।

আরেকবার হলো চিৎকার। একেবারে ওদের সামনেই।

থমকে দাঁড়ালো চারজনেই। সামনের অন্ধকারের দিকে নজর। টিলার উত্তর ধারে পৌঁছে গেছে। ওদের নিচে সরু একচিলতে সৈকত। দশ মাইল দূরে মূল ভূখণ্ড।

সৈকত থেকেই ডাকটা এলো মনে হলো, আরেকবার। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে, বোঝা গেল না।

সবাইকে ছড়িয়ে পড়ে খোঁজার নির্দেশ দিলো কিশোর।
অস্বস্তি বোধ করছে সবাই। তবে ছড়িয়ে পড়লো। অপেক্ষা করছে আরেকবার ডাক শোনার। দুই মিনিট পেরোলো। এইবার মনে হলো ওদের একেবারে কানের কাছে ডেকে উঠেছে।
'ওই যে!' বলে উঠলেন প্রিনসিপাল।
'এই তো!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
টিলার নিচে, ওটার দিকে মুখ করে সৈকতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ঝুঁকে একটা ছোট যন্ত্র তুলে নিলো।
'টেপ রেকর্ডার,' দেখে বললো কিশোর। 'প্রতি দুই মিনিট পর পর রেকর্ড করা রয়েছে নেকড়ের ডাক। ক্যাসেটের ফিতে ঘুরছে, আর শব্দ হচ্ছে।' বাড়িয়ে ধরলো ওটা। 'এই যে, স্যার, আপনার নেকড়ে।'
মাথা ঝাঁকালেন প্রিনসিপাল। 'ঠিক এরকম একটা টেপ রেকর্ডার দেখেছি ডনের কাছে।'
'অনেকের কাছেই আছে এই মডেল। এটা ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নয়।'
'তা নয়। তবু ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত।'
তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলো ওরা। আগুনের কাছে একা বসে রয়েছেন ডক্টর ইংমার। মুখ তুলে বললেন, 'সবাই চলে গেছে। কেউই থাকলো না।'
'একটা টেপ রেকর্ডার, ইংমার,' প্রিনসিপাল বললেন। 'মায়া নেকড়ে তো দূরের কথা, সাধারণ নেকড়েও নয়। দ্বীপ থেকে মানুষগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে এই কাজ করেছে। ঠিকই সন্দেহ করেছিলো কিশোর।'
'কিন্তু কেন, ডেভিড? কেন এই দ্বীপ থেকে মানুষকে তাড়াতে চাইবে কেউ? কি দরকার তার?'
'সেটাই জানার চেষ্টা করবো আমরা,' জবাব দিলো কিশোর। 'ডন কোথায়?'
'সবার সঙ্গে চলে গেছে।'
'চলে গেছে?' হাঁ হয়ে গেল রবিন। 'তার মানে ডন আমাদেরকে দ্বীপ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করেনি! হয়তো...'
'এই, দেখ দেখ,' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'পানিতে দেখ!'
সবাইই দেখলো। আগুনের আলো খাঁড়ির পানিতে গিয়ে পড়েছে।
সেখানে দেখা গেল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তিনটে কমলা রঙের চোখ। যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে

পনের

'ওটা কি?' কেঁদে ফেলবে যেন মুসা। এসব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা আর সহ্য করতে পারছে না সে।
নড়ছে চোখগুলো। হয়ে গেল কমলা রঙের দুটো লম্বা ফিতে। পিঠের মতো

দেখতে লাগছে, আর দুটো হাত।

'একজন মানুষ!' চিৎকার করে বললেন প্রিনসিপাল।

ডাক্তার আর তিনি, দু'জনেই উঠে দৌড় দিলেন সৈকতের দিকে। ঝপ ঝপ করে নেমে পড়লেন পানিতে। ছেলেরা দেখলো, একটা মূর্তির ওপর ঝুঁকলেন দু'জনেই। তারপর সোজা হলেন। বয়ে আনতে লাগলেন পুরুষের একটা ভারি ক্যানভাসের জ্যাকেট।

'ও, জ্যাকেট,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'সেফটি রিফ্লেক্টর স্ট্রিপ লাগানো। ওগুলোই জ্বলছিলো।'

'হ্যাঁ, জ্যাকেট,' গম্ভীর হয়ে বললেন প্রিনসিপাল। 'কিন্তু তাকিয়ে দেখ ভালো করে।'

জ্যাকেটের অনেক জায়গায় ছেঁড়া। ফুটোফাটাও রয়েছে। আর রয়েছে কালচে দাগ। জিনিসটা রবিনের হাতে দিলেন তিনি।

'সর্বনাশ! একাজ কে করলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'দাগগুলো তো মনে হয় রক্তের,' বললো মুসা। 'হাঙরের কাজ! বেশ বড় হাঙর। শাদা দানবগুলো।'

'তুমি বলতে চাইছো জ্যাকেটের মালিককে খেয়ে ফেলেছে হাঙরটা?' রবিনের গলা কাঁপলো।

'আমারও সে-রকমই লাগছে,' জবাবটা দিলেন ডাক্তার।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো রবিন। একটা পকেটের জিপার খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো। বের করে আনলো রূপালি একটা জিনিস। 'সিগারেট লাইটার। গাড়ির কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে। জাগুয়ার।'

'মিস্টার ডেনমার বোরিনস,' কিশোর কথা বললো এতোক্ষণে। 'কার ডিলার ছিলেন। গাড়ির ব্যবসা করতেন।'

'বোরিনস?' চিনতে পারলেন না ইংমার।

'যার বোটটা পেয়েছি আমরা,' ঢোক গিললো মুসা। 'পুলিশ অনেক খুঁজেছে তাঁকে। পায়নি।'

'জ্যাকেটটা তাঁরও হতে পারে,' রবিন বললো।

'মিসেস বোরিনস বলেছিলেন,' মনে করলো কিশোর। 'তাঁর স্বামী পকেটে সব সময় একটা টু-ওয়ে রেডিও রাখতেন।' জ্যাকেটটা নিয়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করলো সে। পেলো না। 'ঠিক আছে, রেখে দাও। কাল পুলিশকে দেখাবো।'

'আজকেই নয় কেন, কিশোর?'

'তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই।'

প্রিনসিপাল যোগ দিলেন ওদের কথায়, 'সবাই যার যার বোট নিয়ে চলে গেছে। রয়েছে শুধু আমারটা। ইংমারের নেই। ছোট একটা বোটে করে এতগুলো মানুষ যাওয়া এখন ঠিক হবে না। সাগরের অবস্থা ভালো না। সকালেই যাবো নাহয়।'

'আর ডন যখন চলে গেছে,' কিশোর বললো, 'আজ রাতে আর কিছু ঘটবে

বলে মনে হয় না। আপনার আর রবিনের পাহারা দেয়া হয়ে গেছে। আমার আর মুসার বাকি। তা-ই দেবো।'

'দাও,' ডাক্তার বললেন। 'আমরা গিয়ে ঘুমাই। দরকার হলে ডেকো।'

তাঁবুতে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। কম্বল নিয়ে বেরোতে যাবে কিশোর, জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'কিশোর, ডন যদি এসব না করে থাকে, কে করলো?'

'এই দ্বীপে আর কে আছে?' মুসার প্রশ্ন। 'ডক্টর ইংমার, প্রিনসিপাল স্যার আর আমরা বাদে?'

'নেই,' স্বীকার করলো কিশোর। 'শুধু আমরা আর দু'জন র‍্যাগনারসন বাদে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। ওয়াকি-টকিটা বের করে নিয়ে কম্বল কাঁধে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর। আগুনের কাছে এসে বসলো। অনেক কমে এসেছে আগুন। ওদিকে শীত বেড়েছে।

ভোর পাঁচটায় উঠে এসে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের পাশে বসলো মুসা।

সকাল সাতটায় গিয়ে জাগালো কিশোর আর রবিনকে।

'খিদে পেয়েছে,' ঘোষণা করলো সে। 'নাস্তার কি খবর?'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর আর রবিন। আবার মাথা ঢোকালো স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে।

কথাটা মনে পড়লো রবিনের। মাথা বের করলো আবার। 'মুসা, রাতে আর কিছু ঘটেছে?'

'না,' জানালো মুসা। 'ভালোই হয়েছে আমার জন্যে।'

'বাপরে বাপ, কি ঠাণ্ডা!' ব্যাগের ভেতর থেকে বললো কিশোর। 'হাড় পর্যন্ত জমে গিয়েছিলো। এখনও গরম হয়নি। এই, যাও তো, সরো। ঘুমাতে দাও।'

'জ্যাকেটটা পুলিশের কাছে নিয়ে যাবে না?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে জুতো পরতে শুরু করলো।

'টেপ-রেকর্ডারটা ডনের কিনা তা-ও জানা দরকার,' মুসা বললো।

চাপা একটা গোঙানি দিয়ে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর। হাই তুললো। হাত টান টান করে আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জড়তা দূর করার চেষ্টা করলো। 'ঠিক,' বলে হাসলো সে। 'চলো, আগে খেয়েই নিই।'

'হ্যাঁ, এইবার মগজ চলছে তোমার ঠিকমতো,' খুশি হয়ে বললো মুসা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো তিনজনে। কাঠ আর কয়লা ফেলা আগুনটাকে উস্কে রেখেছে মুসা। বাতাস পড়ে গেছে। দ্বীপের ওপর এসে আবার ভিড় জমানোর চেষ্টা করছে কুয়াশা, তবে ঘন হতে পারেনি এখনও, হালকাই রয়ে গেছে। সূর্যের মুখ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, বৃথা চেষ্টা। সফল হতে পারবে না কুয়াশা। রোদের মতোই উজ্জ্বল হাসি হেসে তাদেরকে স্বাগত জানালেন প্রিনসিপাল। আগুনের পাশে বসে আছেন তিনি।

'কি খাবে? মাংস ভাজা? ডিম? হট ডগ? গরম কোকা? প্যানকেক?'

'সব খাবো,' জানিয়ে দিলো মুসা।

ইচ্ছেটা তার মুখ দিয়ে বেরোলো বটে, কিন্তু খাওয়ার বেলায় দেখা গেল

কেউই কম যাচ্ছে না। এমনকি প্রিনসিপালও গোগ্রাসে গিলছেন। দ্বীপের খোলা বাতাস আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে সবারই।

'কাল রাতে আর কিছু ঘটেনি তো?' ফ্রাইং প্যানে করে টিনের মাংস গরম করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন ডেভিড।

'না, স্যার,' জবাব দিলো মুসা।

'ডন নেই তো দ্বীপে,' বললো আরেকটা কণ্ঠ, 'তাই।'

মোটেও খুশি মনে হলো না ডক্টর ইংমারকে। ছেলের এই বদনাম সইতে পারছেন না। গম্ভীর হয়ে আছেন। বসে পড়লেন আগুনের পাশে। হাত গরম করতে শুরু করলেন।

'ওটা একটা ব্যাখ্যা বটে,' কিশোর বললো। 'তবে শুধুই সম্ভাবনা। ঠিক না-ও হতে পারে। কাল রাতে অনেকেই আমরা দ্বীপে ছিলাম। টেপ রেকর্ডারটা পাওয়ার পরও ছিলাম। ওটা পাওয়ার পর ভয় দেখানোর বৃথা চেষ্টা আর করতে যাবে না সেই লোক। অন্তত একই রাতে তো নয়ই।'

'আসলে, ডন ছিলো না বলেই আর কিছু ঘটেনি।'

'আপনারা শিওর?'

চুপ করে ভাবতে লাগলেন দু'জনে।

অবশেষে প্রিনসিপাল বললেন, 'আমি শিওর। যতোবার ভূত দেখা গেছে, কিংবা নেকড়ের ডাক শোনা গেছে, দ্বীপে ছিলো ডন।'

'কিন্তু জিনিস যখন চুরি হয়েছে,' ডাক্তার বললেন। 'সে তখন এখানে ছিলো না।'

'তাতে কিছু বোঝা যায় না,' ফ্রাইং প্যানটা আগুনের ওপর থেকে সরিয়ে আনলেন প্রিনসিপাল। 'কখন ওগুলো চুরি হয়েছে বলতে পারবো না আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বোধহয় একমতই প্রকাশ করলো কিশোর। চুপ করে বসে রইলো সবাই। প্যানে ডিম ভাজতে লাগলেন ডেভিড। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন, 'এর পর কি করবে তোমরা?'

'মেইন ল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে ডনের ব্যাপারে তদন্ত চালাবো,' জবাব দিলো কিশোর। 'জ্যাকেটটা নিয়ে যাই, কি বলেন? পুলিশকে দেখাবো। মিসেস বোরিনসের সাথেও দেখা করবো। সময় বেশি নেই। যতো তাড়াতাড়ি পারি ছবিগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'বেশ.' ডিমের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন প্রিনসিপাল। সতর্ক রয়েছেন। বেশি তাপ লাগলে পুড়ে যাবে। 'সাগরকে অনেক সময় কেয়ারই করতে চায় না লোকে! অবাকই লাগে আমার ভাবলে! অথচ কি বিশাল! বিপজ্জনক! বিপদের কথা বেমালুম ভুলে যায় ওরা!'

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, 'ডন কিসে জড়িয়েছে, বল তো?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'এখনও জানি না। তবে দ্বীপ থেকে যে সবাইকে তাড়াতে চেয়েছে এটা ঠিক।'

'তাহলে কাল রাতে সে নিজে চলে গেল কেন?' মেনে নিতে পারছে না এখন

রবিন।

'সেটা আমাকেও অবাক করেছে, নথি। ও চলে যাওয়ার কথা বললে রীতিমতো চমকে গিয়েছিলাম আমি। হয়তো কোনো ব্যাপারের পরিবর্তন হয়েছে।'

মাংস ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সবার প্লেটে ডিম তুলে দিলেন প্রিনসিপাল। মজা করেই খেল সবাই, একমাত্র ইংমার বাদে। ছেলের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর। আগুনের আর দরকার নেই। নিভিয়ে ফেলা হলো। কাপ-প্লেটগুলো ধুতে সাহায্য করলো তিন গোয়েন্দা। তারপর সবাই গিয়ে উঠলো প্রিনসিপালের মোটরবোটে।

'জিনিসপত্র সবই থাক,' তিনি বললেন। 'রহস্যটার সমাধান হয়ে গেলে আবার হয়তো আসতে চাইবে লোকে। তখন প্রয়োজন পড়বে। আর যদি না আসে, তখন দেখা যাবে। এসে নিয়ে যেতে পারবো।'

কুয়াশার চিহ্নও নেই আর। ঝলমলে রোদ উঠেছে। পরিষ্কার সুন্দর একটা দিন। বাতাস পড়ে গেলেও সাগরের ঢেউ কমেনি। এই একটা জিনিস অবাক লাগে মুসার। ঢেউয়ের সঙ্গে যে কিসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, জন্মের পর থেকেই সাগরের তীরে বাস করেও আজও আবিষ্কার করতে পারেনি সে। একেক সময় তার মনে হয় সাগরের রহস্য ভেদ করা বুঝি মানুষের সাধ্যের বাইরে। বড় বড় ঢেউয়ে ভীষণ দুলছে বোট। ভয় হতে লাগলো, অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে না শেষে ডুবেই যায়!

ডুবলো না। ডকে পৌঁছলো নিরাপদেই। পাবলিক ডকে সারি সারি মোটরবোট বাঁধা রয়েছে। সেদিকে হাত তুলে ইংমার বললেন, 'ওই যে, ডনের বোট। চুরি করে আর দ্বীপে ফিরে যায়নি।'

বোটটা বাঁধতে ভাইকে সাহায্য করলেন তিনি।

দু'জনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেল র‍্যাকের দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা।

'কি করবো এখন, কিশোর?' মুসা জানতে চাইলো।

'তুমি আর রবিন ডনের কটেজে চলে যাও,' নির্দেশ দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওর ওপর কড়া নজর রাখবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও গেলে পিছু নেবে।'

'যদি ওখানে না থাকে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো

'ওর ফেরার অপেক্ষা করবে।'

'তুমি কি করবে?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'মিসেস বোরিনসের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। তারপর যতো তাড়াতাড়ি পারি চলে আসবো তোমাদের কাছে।'

সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা। টেলিফোন বুক থেকে মিসেস বোরিনসের ঠিকানা বের করতে চললো কিশোর। পাওয়া গেল সহজেই। ডনের কটেজটা সৈকতে, শহরের এক প্রান্তে। আরেক প্রান্তে, তার উল্টো দিকে পাহাড়ের ওপর বোরিনসের বাড়ি। 'মরেছি!' আপনমনেই গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'বহুদূর সাইকেল ঠেঙাতে হবে! তার ওপর পাহাড়ী পথ...!'

কিন্তু কি আর করা? যেতে যখন হবেই...

সরু গিরিপথ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে চলেছে সে। হাঁপাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। পথ বেশ খাড়া। বাদামী পর্বতের পাদদেশে দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চের মতো বাড়িটা। অনেক পুরনো বাড়ি, নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। বিশাল বাড়ির সামনে ছড়ানো সবুজ লন। গাছপালায় ঘিরে রেখেছে। আশেপাশে অনেক চাষের জমি। নিয়মিত চাষ করা হয়, দেখেই বোঝা যায়।

চড়াই শেষ হলো। এবার উৎরাই। এই ঢালটা পেরোলেই পৌঁছে যাবে বাড়িটাতে। ওঠার সময় গতি খুব ধীর ছিলো, নামার সময় সেটা পুষিয়ে নেয়া যাবে ভেবে খুশি হয়ে উঠলো কিশোর।

ঠিক এই সময় চোখে পড়লো বোরিনসদের ড্রাইভওয়ের ঢাল বেয়ে যেন পিছলে নেমে আসছে একজন মোটর সাইকেল আরোহী।

ডন র‍্যাগনারসন!

ষোল

সৈকতের ধার দিয়ে চলে যাওয়া পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে পুরো রাস্তাটায় চোখ বোলালো রবিন। রোদের মধ্যে যেন চুপটি করে বসে রয়েছে ডন র‍্যাগনারসনের ভাঙাচোরা কটেজটা। নির্জন পথে হাঁটছে না কোনো পথিক।

'চলো, আরও কাছে যাই,' মুসা বললো।

একটা রেলিঙের সঙ্গে শেকল দিয়ে সাইকেলদুটোকে বেঁধে রেখে রাস্তা ধরে হেঁটে রওনা হলো ওরা। গাছপালায় ঘেরা কটেজের কাছাকাছি এসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'গ্যারেজটা খোলা!'

সাবধানে গাছগাছড়ার ভেতর দিয়ে সেদিকে এগোলো দু'জনে। গ্যারেজের একটা দরজা খোলা। কটেজের এককোণে দাঁড়িয়েই ভেতরটা চোখে পড়ে। বাদামী পিকআপটা রয়েছে। কোনো মোটর সাইকেল দেখা গেল না।

'মনে হয় বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেছে,' অনুমান করলো মুসা।

'এইই সুযোগ,' রবিন বললো। 'কটেজের ভেতরটা দেখে ফেলি! আজকেও ক্যাপ্টেন কুলটার আছে কিনা কে জানে!'

'যদি ভূতটা বাস করে এখানে? আমি বাপু ভেতরে ঢুকছি না। সাহস থাকলে ঢোকোগে। আমি এখানেই থাকি।'

'ভূতফূত কিছু নেই, মুসা। কসটিউম। আমার বিশ্বাস, পোশাকটা পরে ক্যাপ্টেন কুলটার সেজেছিলো ডন।'

তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো মুসা। 'তুমি বলতে চাও পয়লা দিন এসে ডনকেই দেখেছি আমরা? কুলটার মনে করেছি?'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি। কিশোরও নিশ্চয় তাই মনে করে। এখন শুধু প্রমাণ দরকার। বাড়িটায় খোঁজ করলে কিছু পেয়ে যেতে পারি।'

মুসার চোখে সন্দেহ। 'কিশোর বলে দিয়েছে ডনের জন্যে অপেক্ষা করতে। আর কিছু করতে বলেনি।'

'কিন্তু এটা আমাদের সুযোগ। ডন কি করছে জানতে হলে ভেতরে ঢুকতেই হবে। সব সময়ই সব কিছু বলে দিতে পারবে না আমাদেরকে কিশোর। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। নইলে কিসের গোয়েন্দা হলাম?'

'বেশ…,' দ্বিধা কাটছে না মুসার। 'বলছো যখন, চলো যাই।'

'এসো। ঘুরে সামনের দিকে চলে যাবো।'

খুব সতর্ক হয়ে, পা টিপে টিপে, রঙচটা কটেজের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে সামনের বারান্দায় উঠলো দু'জনে। জানালার ময়লা কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে তাকালো। পর্দাগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। ভেতরে কেউ নেই। কিছুই নড়ছে না। জানালায় ঠেলা দিয়ে দেখলো মুসা। আটকানো।

'পাশের জানালা দিয়ে চেষ্টা করা উচিত,' বললো সে। 'ডন এতোটা সতর্ক মানুষ নয় যে সব জানালাই আটকে রেখে যাবে।'

'সামনের দরজাটাই বা দেখি না কেন?' বলতে বলতে গিয়ে নব ধরে মোচড় দিলো রবিন।

খোলা!

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'বাহ্, চমৎকার। কষ্ট আর করতে হলো না। তবে মজাটাই মাটি।'

লিভিং রুমের ভেতরে রাজ্যের জঞ্জাল। খাবারের টিন, সোডার ক্যান, আর ধুলো। ময়লা কাপড়-চোপড় স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝেতে। গড়াগড়ি খাচ্ছে ভাঙা আসবাবপত্র। হাঁ হয়ে খুলে রয়েছে একটা টেবিল আর সাইডবোর্ডের ড্রয়ার, ভেতরে গাদাগাদি করে রাখা বাতিল জিনিস।

ওই একটা ঘর দেখেই ডনের ওপর বিরক্তি জন্মে যাওয়া স্বাভাবিক, মুসার মনে হলো। এতোটা নোংরা হতে পারে মানুষ, ভাবতে পারে না সে।

বেডরুম আছে দুটো। একটাতে শোবার কোনো ব্যবস্থা নেই। নানারকম জিনিস পড়ে রয়েছে, বেশির ভাগই মোটর গাড়ির। পুরনো টায়ার, সাইড এবং রিয়ারভিউ মিরর, হুইল কভার, দরজার হাতল, সীট কভার, আর আরও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেগুলো বিক্রি করা যাবে। আরও রয়েছে সুপারমার্কেটের শপিং ট্রলি, দরজার জন্যে তামার ফিটিংস, আর কিছু পুরনো দরজা।

'নিশ্চয় চুরি করে নিয়ে এসেছে,' মুসা বললো। 'বিক্রি করার জন্যে।'

'হবে হয়তো। কিন্তু রেকার'স রকে গিয়ে কি করেছে, সেটা কিছুই বোঝা যায় না এসব দেখে।'

দ্বিতীয় শোবার ঘরটায় বিছানা একটা আছে, তবে তাতে মানুষ শুতে পারে ভাবা যায় না। অগোছালো। চাদর-টাদরগুলো কতোদিন ধোয়া হয় না কে জানে! দুর্গন্ধ হয়ে আছে। একটা আলমারি আছে। আর একটা ক্লজিট।

'এখানে কিছুই নেই,' ক্লজিটের ভেতর থেকে জানালো মুসা।

শেষ ঘরটা হলো রান্নাঘর। যেখানে ক্যাপ্টেন কুন্টারকে দেখেছিলো ওরা। অন্য ঘরগুলোর মতোই এটাও ভীষণ নোংরা। তাকগুলো প্রায় শূন্য। রেফ্রিজারেটরটার অবস্থা কাহিল।

'হয়েছে,' হতাশ হয়ে হাত ঝাড়তে লাগলো রবিন। 'কিছুই নেই।'
'গ্যারেজে দেখা বাকি এখনও।'
'ঠিক। চলো।'
কাত হয়ে থাকা গ্যারেজের ভেতরে এসে ঢুকলো দু'জনে। তক্তা খসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। বড় বড় ফাঁক দেয়ালে। যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়ার হুমকি দিচ্ছে যেন। মাটিতে একটা জায়গা দেখালো মুসা। তেল পড়ে রয়েছে। মোটর সাইকেল ছিলো ওখানটায়। মাথা ঝাঁকালো রবিন। তারপর, পেছনের দরজাটা চোখে পড়লো দু'জনেরই।
'মনে হয় স্টোররুম,' রবিন বললো।
দরজার পাল্লায় তালা দেয়া নেই, শুধু ভেজানো। ওপাশে ছোট আরেকটা ঘর। তাতে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে মাছ ধরা সরঞ্জাম, সার্ফবোর্ডস, সাইকেলের যন্ত্রাংশ, একটা স্কেটবোর্ডের খানিকটা, আর বড় একটা হ্যাং গ্লাইডারের অংশ, দেখে অন্তত সেরকমই লাগছে। ছোট একটা জানালা দিয়ে মৃদু আলো আসছে। তবে তাতে জিনিসপত্রগুলো দেখা যায়। একধারে একটা ওয়ার্কবেঞ্চ রাখা।
'ওই যে,' চেঁচিয়ে বললো মুসা, 'ডনের ভাইকিং কসটিউম!'
দেয়ালের একটা পেরেকে ঝোলানো রয়েছে জলদস্যুর পোশাকটা। বেঞ্চের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে হেলমেট, আর চামড়ার অন্যান্য জিনিস, যেগুলো হাতে আর পায়ে বাঁধা হয়। বর্ম, তলোয়ার আর একটা ডাফেল ব্যাগ ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। ব্যাগটা খুললো মুসা। একনজর দেখেই মুখ তুলে তাকালো রবিনের দিকে, 'এই যে আমাদের ভূত!'
ব্যাগের মধ্যে রয়েছে কুল্টারের সোনালি সুতোর কাজ করা নীল ক্যাপ। লম্বা ঝুলওয়ালা নীল ওভারকোট, তাতে পিতলের বোতাম লাগানো। আঁটো প্যান্ট। পুরনো ডিজাইনে তৈরি নাবিকদের বুট। আর একটা টেলিস্কোপ। ভোজালিটা নেই। নাবিকের ছেঁড়া পোশাকও রয়েছে এক সেট, তাতে শ্যাওলা লেগে রয়েছে। র‍্যাগনারসনদের দেখা আরেকটা 'ভূত'।
সেটা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'খাইছে!'
'ডনই তাহলে ভূত, যা ভেবেছিলাম!' এগিয়ে এলো রবিন। 'বলেছি না, ওই ব্যাটাই সেদিন কুল্টারের পোশাক পরে ছিলো।'
'কণ্ঠস্বরও নকল করে ফেলেছিলো,' মুসা বললো। 'নাবিকদের ভাষা। তখন অবশ্য ডনকে চিনতাম না, তার চেহারা কেমন জানতাম না।'
'না,' একমত হলো রবিন। 'ও নিশ্চয় তখন ভূত হওয়া প্র্যাকটিস করছিলো। আমরা তাকে ডিসটার্ব করেছিলাম। নানারকম পোজ নিয়ে, জানালার কাঁচকে আয়না বানিয়ে দেখছিলো সে।'
'দেখা যাক, আর কি পাওয়া যায়।'
ছোট স্টোররুমের মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসপত্রের মধ্যে ঘাঁটতে লাগলো মুসা। রবিন ওয়ার্কবেঞ্চটা দেখছে। কোণগুলোতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলো মুসা। খুব কাছে থেকে দেখছে সব কিছু, যাতে কিছুই নজর এড়াতে না পারে। মই

বেয়ে ঘরের চালের আড়ায় উঠে গেল রবিন। কয়েকটা তক্তার ওপরে রাখা বাক্সটা চোখে পড়লো তার। সেকথা জানালো মুসাকে।

বাক্সটা নামিয়ে আনলো ওরা।

'কি আছে এটাতে?' বাক্সের দিকে তাকিয়ে বললো মুসা।

'হয়তো সমস্ত প্রশ্নের জবাব। কেন রেকার'স রক থেকে সবাইকে তাড়াতে চেয়েছে ডন, জানা যাবে হয়তো এটা খুললে।'

'তাহলে খোলো।'

বাক্সের ভেতরে পাওয়া গেল পাঁচটা বড় আকারের মুদ্রা। চকচকে, সোনার। আর কিছু সোনার তাল রয়েছে।

একটা মুদ্রা তুলে নিলো রবিন। পড়লো, 'আঠারোশো সাতচল্লিশ।'

পরস্পরের দিকে তাকালো দু'জনে।

নরম শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'দা স্টার অভ পানামার হারানো স্বর্ণ!'

'নিশ্চয় দ্বীপে খুঁজে পেয়েছে এগুলো ডন।'

'এবং সে-জন্যেই ওখান থেকে সবাইকে তাড়াতে চেয়েছে, যাতে আরও ভালোমতো খুঁজে বাকিগুলোও বের করতে পারে।'

বাইরে শোনা গেল মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের শব্দ। পাথরের মূর্তি হয়ে গেল যেন দু'জনে।

সতের

সাঁই করে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিলো কিশোর। সাইকেল নিয়েই ঢুকে পড়লো ঝোপের মধ্যে। ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে এলো ডন।

গিরিপথে শোনা যাচ্ছে মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের গর্জন। কিশোরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, দেখলো না তাকে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দ। তারপর নীরবতা।

উঠলো কিশোর। তুলে নিলো মাটিতে শুইয়ে রাখা সাইকেলটা। হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। সাইকেলে চড়ে ঢালু পথটা পেরোলো। ড্রাইভওয়েটা খাড়া উঠে গেছে। সাইকেল চালিয়ে ওঠার চেয়ে ঠেলে নিয়ে ওঠা সহজ। নেমে ঠেলেই উঠতে লাগলো।

বাড়ির গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে সামনের দরজায় টোকা দিলো সে। খুলে দিলো লম্বা, ভারিক্কি চেহারার একজন মানুষ। গাঢ় রঙের স্যুট আর টাই পরনে।

'মিসেস বোরিনসের সাথে দেখা হবে?' ভদ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'রান্নাঘরে আছে। কফি বানাচ্ছে। এসো।'

লিভিং রুমে এনে কিশোরকে বসালো লোকটা। তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হাসি হাসলো। ঘড়ি দেখলো এমন ভঙ্গিতে যেন বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

'অন্য লোকটাও কি তাঁর সাথে দেখা করতেই এসেছিলো?' জানতে চাইলো

কিশোর।
'অন্য লোক?'
'ডন র‍্যাগনারসন। এইমাত্র তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'
'কই, আর কাউকে দেখিনি এখানে।'
বসে বসে দেখতে লাগলো কিশোর। দামী আসবাবপত্র। দেয়ালে ঝোলানো আধুনিক পেইন্টিং। বাইরের দৃশ্য ভালো ভাবে দেখার মতো করে তৈরি হয়েছে জানালাগুলো। পর্বত দেখা যায়। লম্বা লিভিং রুমের শেষ প্রান্ত থেকে দূরে সাগর চোখে পড়ে। একটা টেবিলে রাখা বাঁধাই করা একটা ফটোগ্রাফ। খাটো, মোটা, মাঝবয়েসী একজন লোকের, দাঁড়ানো অবস্থায় তোলা হয়েছে ছবিটা। বড় একটা সাইনবোর্ডের সামনে। তাতে লেখাঃ **বোরিনস মোটরস, জাগুয়ার অ্যাণ্ড টয়োটা।**
'সরি, নিকোলাস…আরে?'
দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিসেস বোরিনস। অ্যাপ্রনে হাত মুছছে। সাধারণ একটা কালো পোশাক পরেছে মহিলা। রোগা হয়ে গেছে। চেহারা ফ্যাকাসে। ক্লান্ত নীল চোখ জোড়া কিশোরকে দেখছে। 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে?'
'হ্যাঁ, ম্যা'ম, ডকে দেখা হয়েছিলো। আপনার স্বামীর বোটটা আমরাই পেয়েছিলাম।'
কঠোর হয়ে গেল মহিলার দৃষ্টি। যেন সেই দিনটির কথা মনে করতে চায় না। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ, চিনেছি। তুমি…'
'কিশোর পাশা।'
'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো মহিলা। নামটা যেন তার কাছে বিশেষ গুরুত্ববহ এমন একটা ভাব করলো। লম্বা লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিকোলাস, এই ছেলেটা আর তার দুই বন্ধু ডেনির বোটটা পেয়েছিলো।' আবার কিশোরের দিকে ফিরলো সে। নিকোলাসের পরিচয় দিলো, 'ও আমার দেবর। তোমাদের কাছে সে-ও আমার মতোই কৃতজ্ঞ। তোমরা এতো কষ্ট করলে, অথচ দেখো, সামান্য ধন্যবাদ দেয়ার কথাটাও মনে হয়নি সেদিন। তোমরা না থাকলে কোনোদিনই… কোনোদিন জানতে পারতাম না ডেনির কি হয়েছে।'
হঠাৎ কিশোরের মনে হলো, যা জানাতে এসেছে সেটা মিসেস বোরিনসকে বলা খুব কঠিন হয়ে যাবে তার পক্ষে। তবু বললো, 'ইয়ে, একটা কথা জানাতে এলাম। কাল রাতে আমরা রেকার'স রকে গিয়েছিলাম। একটা জিনিস পেয়েছি। মনে হলো, আপনার স্বামীর হতে পারে।'
কিশোরের মুখের ওপর যেন আটকে গেল মিসেস বোরিনসের দৃষ্টি।
'একটা ভারি ক্যানভাসের জ্যাকেট,' কিশোর বললো। 'হাতায় রিফ্লেকটর স্ট্রিপ লাগানো। পকেটে একটা সিগারেট লাইটার পাওয়া গেছে, জাগুয়ার কোম্পানির নাম লেখা।'
'ডেনির!' চিৎকার দিয়ে উঠলো মহিলা। 'দেখি, দেখি!'
'সরি, আনতে পারিনি। পুলিশের কাছে। আপনি গিয়ে দেখতে চাইলে নিশ্চয় দেখাবে।'

'অ্যা···ওকে,' দ্বিধায় জড়ানো মহিলার কণ্ঠ। 'আমি···ডেনির জ্যাকেটটা আস্ত আছে?'

মিসেস বোরিনসের চোখে চোখে তাকাতে পারলো না কিশোর। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না। ছেঁড়া। কালচে দাগ লেগে রয়েছে।'

ব্যথায় কালো হয়ে গেল মহিলার মুখ।

'হাঙর,' বিষণ্ন নিকোলাসের কণ্ঠ। 'ঈশ্বর! না জানলেই ভালো হতো! আর কোনো আশা থাকলো না।'

আর দাঁড়াতে পারলো না মিসেস বোরিনস। শাদা একটা কাউচে বসে কাঁদতে লাগলো। নাকমুখ চাপা দিয়েছে রুমাল দিয়ে। উঠে গিয়ে তার বাহুতে হাত রাখলো নিকোলাস বোরিনস।

'শারলি,' বললো সে, 'আমি থানায় যাচ্ছি। জ্যাকেটটা দেখবো। বিকেল নাগাদ চলে আসবো আবার। একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, ভাই আর নেই। ইনশিওরে কোম্পানিকে জানাতে হবে সেটা। লাইফ ইনশিওরেন্স যখন করিয়েছেই···তুমি একা থাকতে পারবে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতেই মাথা কাত করলো মিসেস বোরিনস। সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে। চকচক করছে তার লাল চুল।

'দেখো, কেঁদে আর কোনো লাভ নেই। যে যাবার সে তো চলেই গেছে। তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে দোয়া করো। অনেক দিয়ে গেছে তোমাকে সে। তোমার নামে নমিনি, বীমার টাকাটাও তুমিই পাবে। মনে মনে ধন্যবাদ দাও তাকে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেল নিকোলাস। এঞ্জিন স্টার্ট নিলো। ড্রাইভওয়ে দিয়ে নেমে গেল গাড়িটা।

'মিসেস বোরিনস?' সহানুভূতির সুরে বললো কিশোর।

মুখ তুললো না মহিলা। রুমালে নাক গুঁজে কেঁদেই চললো।

পা নাড়লো কিশোর। কাশলো। তারপর বললো, 'ইয়ে, আপনার সাথে কয়েকটা কথা ছিলো। কিছু প্রশ্ন।'

জোরে একবার নাক টানলো মিসেস বোরিনস। মুখ তুললো। চোখ মুছে নিয়ে তাকালো তার দিকে। 'সরি, কিশোর! খবরটা শুনে আর ঠিক থাকতে পারিনি। তবু, বেঁচে তো থাকতে হবে। শক্ত করতে হবে নিজেকে, বুঝি। পারছি না।···তুমি কি জানতে চাও?'

'আমি আসার সময় একটা লোককে দেখলাম চলে যাচ্ছে। আপনার ড্রাইভওয়ে থেকেই বেরোলো। এখানে কি জন্যে এসেছিলো বলতে পারবেন?'

'লোক?'

'হ্যাঁ। মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছিলো।'

'মোটর সাইকেল? কই, এঞ্জিনের শব্দ তো শুনিনি?' মাথা নাড়লো মিসেস বোরিনস। 'কি বলছো, বুঝতে পারছি না। কোনো লোককেই দেখিনি।'

'ওর নাম ডন র‍্যাগনারসন। নামটা শুনেছেন?'

আবার মাথা নাড়লো মহিলা। 'না।'

'আপনার স্বামীর পরিচিত হয়তো?'

ভ্রূকুটি করলো মিসেস বোরিনস। রুমাল দিয়ে নাক মুছলো। 'আমার মনে হয় না। র‍্যাগনারসনের নাম কখনও তাকে বলতে শুনিনি।'

'একটু আগে তাহলে কোনো মোটর সাইকেলওলা লোকের সাথে কথা বলেননি?'

'না। এখানে এসেছে যে তা-ই জানি না। কি করছিলো বলো তো? কি চেয়েছে? নিকোলাসের সাথে কথা বলতে নয় তো?'

এবার মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, ম্যা'ম। আপনার দেবরও বলেছেন, তিনি তাকে দেখেননি।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। কেন এসেছিলো লোকটা, কি করছিলো, কিছুই বলতে পারবো না।'

কিশোর ওঠার পরও বসেই রইলো মিসেস বোরিনস। তাঁকে ওভাবেই রেখে বেরিয়ে এলো সে। বাড়িটা ঘুরে এগোলো তার সাইকেল নেয়ার জন্যে।

লিভিংরুম থেকে দেখা যায় না এরকম একটা জায়গায় এসে আবার ফিরে চললো কিশোর। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে চলে এলো বাড়ির পেছনে, গ্যারেজের কাছে। অনেক বড় গ্যারেজ, কম পক্ষে তিনটে গাড়ির জায়গা হবে। মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পেছনের সিঁড়ির কাছে আসার আগে কিছু চোখে পড়লো না।

রান্নাঘরে উঠে গেছে সিঁড়িটা। সিঁড়ির পাশে ফুল গাছের সারি দিয়ে বর্ডার করা। ওখানেই মাটিতে দেখতে পেলো দাগটা। কোনো সন্দেহ নেই, মোটর সাইকেলের টায়ারের ছাপ। সিঁড়িতে, রান্নাঘরের দরজার কাছে মাটি লেগে রয়েছে, ফুল গাছের কিনারে যেরকম মাটি, সেরকম। এখনও শুকায়নি। ভেজা ভেজাই রয়ে গেছে।

কিশোর যখন এসেছে, তখন রান্নাঘরে ছিলো মিসেস বোরিনস, আর ডন র‍্যাগনারসন ছিলো ঘরের দরজায়। নাকি দু'জনে একই সাথে ছিলো দরজায়? কি করছিলো? এই জন্যেই কি কফি বানাতে এতো দেরি হয়েছে মিসেস বোরিনসের?

এতোই মগ্ন হয়ে ভাবছে কিশোর, পেছন থেকে যে দু'জন লোক আসছে টেরই পেলো না।

দু'জনের মুখেই স্কি মাস্ক। একজনের খোলা বাহুতে টাট্টু দিয়ে মারমেইড আঁকা। যখন দেখলো সে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু পালানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। ধরে ফেলা হলো তাকে। যাতে চিৎকার করতে না পারে, সে-জন্যে মুখ চেপে ধরলো কঠিন আঙুল।

আঠার

গ্যারেজের সামনে মোটর সাইকেল থামলো।

'জানালা!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

স্টোররুমের একমাত্র ছোট জানালার পাল্লায় ঠেলা দিলো সে। নড়ে উঠলো ওটা। সাবধানে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললো। খোলার সময় জোরে কিঁচকিঁচ করে উঠলো ওটা।

দম বন্ধ করে ফেললো দু'জনে।

ভাগ্য ভালো, শব্দটা ঢাকা পড়ে গেল এঞ্জিনের শব্দে। তারপর বন্ধ হলো এঞ্জিন কিন্তু কোনো পদশব্দ এগিয়ে এলো না ওদের দিকে। মুহূর্ত পরেই ছোট জানালায় মাথা গলিয়ে দিলো মুসা। বেরিয়ে এলো। তার পর পরই বেরোলো রবিন। দু'জনেই লুকালো ঝোপের ভেতরে। এখান থেকে গ্যারেজ আর কটেজ, দুটোই চোখে পড়ে।

'ডন গেল কোথায়?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো মুসা।

'চুপ! ওই যে।'

গ্যারেজের ভেতর থেকে খুশি মনে শিস দিতে দিতে বেরোলো ডন। খালি পা। পুরনো জিনসের প্যান্টের নিচটা বোধহয় বেশি ছিঁড়ে গিয়েছিলো, কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। গায়ে মলিন টি-শার্ট। ঠেলে মোটর সাইকেলটা গ্যারেজে ঢোকালো সে। দু'পাশের দরজাই টেনে হাঁ করে খুলে ফেললো। তারপর গিয়ে উঠলো ধূসর পিকআপ ট্রাকে। স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে বের করে আনলো ওটা।

'চলে যাচ্ছে!' ফিসফিস করে বললো মুসা।

'পিছু নেয়া দরকার,' উঠে দাঁড়াতে গেল রবিন।

'দাঁড়াও!' রবিনের হাত চেপে ধরলো মুসা।

ড্রাইভওয়েতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাকটা। লাফিয়ে নেমে এলো ডন। দৌড়ে ফিরে এলো গ্যারেজে। মোটর সাইকেলের স্যাডলব্যাগ খুলে আপনমনে শিস দিতে দিতে বের করলো একটা বোতল। সেটা নিয়ে গিয়ে রাখলো গাড়ির পাশে। ট্রাকের পেছনে উঠে একটা বড় তেরপল ঠেলে সরিয়ে পাঁচ গ্যালনের খালি একটা প্লাস্টিকের জগ আর একটা তেল ঢালার চোঙ বের করে নিয়ে নেমে এলো আবার।

ঝোপের ভেতরে বসে সবই দেখতে পাচ্ছে রবিন আর মুসা। বোতল খুলে জগের মুখে চোঙ রেখে তাতে বোতলের তরল পদার্থ ঢালতে শুরু করলো ডন। সবটুকু ঢেলে বোতলটা রাখলো মাটিতে। উঁকি দিয়ে জগের ভেতর দেখলো। সন্তুষ্ট হয়ে এক লাথিতে বোতলটা পাঠিয়ে দিলো একটা ঝোপের ভেতর। জগের ক্যাপ লাগিয়ে ওটাকে তেরপলের নিচে ঢুকিয়ে রাখলো। এক মুহূর্ত কি ভাবলো। তারপর আবার চললো গ্যারেজের দিকে।

'জগটা নিয়ে কোথাও যাবে,' মুসা বললো।

'তার পিছু নিতে হবে আমাদের। নেবো কিভাবে?'

'ট্রাকের পেছনে উঠে পড়লে কেমন হয়? অন্তত একজন?'

'তেরপলের তলায়!'

ঠোঁট কামড়ালো মুসা। 'কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে সে। দেখে ফেলবে।'

'তাহলে একজনকে এখানে বসেই চোখ রাখতে হবে। আরেকজন গিয়ে ট্রাকে

উঠবো।'

'তারমানে একজনই উঠতে পারবো।'

'কিশোরের জন্যে একজনকে তো বসে থাকতেই হবে। কিংবা গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তাকে।'

'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!'

আবার বেরিয়ে এলো ডন। হাসছে আপনমনে। ছোট একটা কাঠের বাক্স হাতে। এটাতেই রয়েছে সোনার মোহর আর তালগুলো। সেটা ট্রাকের কেবিনে সীটের ওপর রেখে আবার কি ভাবলো। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকেই কিছু বোঝালো। ট্রাকটা ঘুরে এসে কটেজের পেছন দিকে চললো। দরজায় তালা দেয়া। পকেট হাতড়ে চাবি না পেয়ে বিড়বিড় করলো কিছু। সামনের দরজার দিকে এগোলো।

'এইই আমাদের সুযোগ!' মুসা বললো।

'আমিই বরং ঢুকিগে। আমার শরীর ছোট, ঢুকে থাকতে পারবো, দেখা যাবে না।'

মেনে নিলো মুসা। 'বেশ। আমি কিছুক্ষণ বসবো এখানে কিশোরের জন্যে। না এলে গিয়ে খুঁজে বের করবো। জলদি যাও। ডন বেরোলে ইশারা করবো ঢিল ছুঁড়ে।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরোলো রবিন। তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিলো ট্রাকের দিকে। মুসার চোখ বাড়ির সামনের দিকে। ট্রাকে উঠে পড়লো রবিন। একপাশ উঁচু করে পিছলে ঢুকে গেল তেরপলের তলায়। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। ভালো করে না তাকালে বোঝাই যাবে না তেরপলের নিচে কিছু রয়েছে।

রবিন ঢোকার সামান্য পরেই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ডন। হাসি হাসি মুখ। ট্রাকের পেছনে ফিরেও তাকালো না। সোজা গিয়ে উঠলো কেবিনে। ড্রাইভওয়ে থেকে পিছিয়ে গাড়ি বের করে নিয়ে গেল রাস্তায়, তারপর চলে গেল।

তাকিয়ে রয়েছে মুসা। রবিনের জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

বসেই আছে সে। কিশোরের দেখা নেই। এতোক্ষণে তো ফিরে আসার কথা! আরও কিছুক্ষণ পর আর থাকতে পারলো না সে। উঠে বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। রবিনের সাইকেলটা যেখানে রয়েছে সেখানেই রেখে নিজেরটা খুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল একটা ফোন বুদ খুঁজে বের করার জন্যে।

তার ধারণা, কাজ শেষ করে নিশ্চয় হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেছে কিশোর। কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তার পর আসবে মুসা আর রবিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ওয়াকিটকি সাথে আছে, তবে ইমারজেন্সি সিগন্যালও কাছে থাকা উচিত ছিলো। তাহলে এখন রবিনের কাজে লাগতো। সে কোথায় গেল না গেল বোঝা যেতো। ধরা পড়লে কিংবা বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধারের জন্যে যাওয়া যেতো। কিশোরও নিশ্চয় এরকম কিছু ভেবেই হেডকোয়ার্টারে গেছে।

রিঙ করলো মুসা। জবাব নেই। কয়েকবার চেষ্টা করে 'টেলিফোন বুকে' মিসেস বোরিনসের ঠিকানা খুঁজতে শুরু করলো।

যতো তাড়াতাড়ি পারলো পর্বতের দিকে সাইকেল চালিয়ে চললো মুসা। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে এসে উঠে পড়লো পাহাড়ী পথে। পর্বতের গভীরে ঢুকে গেছে পথটা। গিরিপথে ঢুকলো সে। কয়েকটা মোড় ঘুরে শেষ আরেকটা ঘুরতেই চোখে পড়লো বোরিনসদের বাড়ি। পৌঁছে গেল ড্রাইভওয়ের গোড়ায়।

কিশোরের সাইকেলটা খুঁজলো তার চোখ। কোথাও দেখতে পেলো না। দরজায় টোকা দিলে খুলে দিলো মিসেস বোরিনস।

'ও, তুমি! তিনজনের আরেকজন!'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। কিশোর আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক ভালো তোমরা। ডেনির খবরটা নিজে এসে জানালো কিশোর। জ্যাকেট···। তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম আমি। তোমরা না থাকলে···'

বাধা দিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'এখনও আছে?'

'অ্যাঁ! না···না না! কি যেন নাম তোমার?'

'মুসা। মুসা আমান। কতোক্ষণ আগে গেছে?'

এনট্র্যান্স হলের গ্রাণ্ডফাদার ঘড়িটা দেখলো মিসেস বোরিনস। 'এই, ঘন্টাখানেক। কেন, কিছু হয়েছে?'

'জানি না,' অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। 'কোথায় যাবে কিছু বলেছে?'

'না।'

'এখানে সে থাকার সময় কিছু ঘটেছে? অস্বাভাবিক কিছু?'

'না।'

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেলের কাছে চললো মুসা। কিশোরের কি হলো? বাড়ির পাশের মাটিতে চিহ্ন খুঁজলো সে। কিছু নেই, শুধু পেছনের ফুল গাছের সারির কাছে মোটর সাইকেলের চাকার দাগ ছাড়া। তাতে কোনো বিশেষত্ব দেখতে পেলো না সে। সে খুঁজছে সাইকেলের চাকার দাগ।

গেল কোথায় কিশোর? ডনের কটেজে কেন গেল না? কোনো সংকেত না দিয়ে, কিছুই না বলে এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়াটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। পুরো দুই ঘন্টা ধরে তার কোনো খোঁজ নেই।

ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে নামতে লাগলো মুসা।

চোখে পড়লো আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। একটা টেলিফোন পোস্টের গায়ে আঁকা। দ্রুত হাতে এঁকেছে শাদা চক দিয়ে।

ওই চিহ্ন কিশোরই রেখে গেছে!

থামটার আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করলো মুসা। ছোট একটা ট্রাক আর বাইসাইকেলের চাকার দাগ দেখতে পেলো মাটিতে।

উনিশ

তেরপলের তলায় ঘাপটি মেরে পড়ে রয়েছে রবিন। ছুটে চলেছে ট্রাক। আর্তনাদ

করে উঠছে টায়ার, গতি না কমিয়েই মোড় ঘোরানোতে। আপনমনেই হা হা করে হেসে উঠছে ডন, অহেতুক হর্ন বাজাচ্ছে। যা-ই ঘটিয়ে থাকুক, মেজাজ খুবই ভালো রয়েছে তার।

একবার থামলো ট্রাক। নেমে কারো সাথে কথা বললো ডন। তেরপল তুলে দেখার চেষ্টা করলো রবিন। কিন্তু দেখতে পেলো না কিছু। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু'জনে। ডক্টর ইংমারের অফিস চোখে পড়লো রবিনের।

আবার ট্রাকে উঠলো ডন। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চললো পুরনো গাড়ি। শেষবারের মতো থামলে লোনা গন্ধ এসে লাগলো রবিনের নাকে। সাগরের কাছে চলে এসেছে। বন্দরের হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। কেবিন থেকে নেমে এসে ট্রাকের পেছনে উঠলো ডন। রবিনের পাশেই রয়েছে জগটা। ওটা নিতে আসেনি তো?

দুরুদুরু করতে লাগলো তার বুক। যদি টান দিয়ে তেরপল তুলে ফেলে? এখন আর কিছু করার নেই। দম বন্ধ করে পড়ে রইলো রবিন। যা হয় হবে।

একটা হাত ঢুকে গেল তেরপলের নিচে। হাতড়াতে শুরু করলো। জগটা লাগলো না।

ভুলে ছোট একটা বেলচা ঠেকলো হাতে। নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠলো ডন। রেগেমেগে এখনই হয়তো টান দিয়ে তেরপল তুলবে। জগটা পেতে সাহায্য করবে নাকি? রবিনের পায়ের কাছেই রয়েছে ওটা। কাছেই নড়াচড়া করছে হাতটা। ঝুঁকিটা নিলো সে। লম্বা দম নিয়ে আস্তে পা ঠেকালো জগের গায়ে। ঠেলে দিলো এক ইঞ্চি। তারপর আরেক ইঞ্চি।

জগ হাতে ঠেকলো ডনের। টেনে ওটা বের করে নিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল ট্রাক থেকে, টের পেলো রবিন। কংক্রিটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ডন, জুতোর শব্দ হচ্ছে। গিয়ে নামলো কাঠের পিয়ারে।

সাবধানে তেরপল ফাঁক করে উঁকি দিলো রবিন। বন্দরের বিল্ডিংগুলো চোখে পড়লো। কোস্ট হাইওয়ে থেকে শোনা যাচ্ছে যানবাহনের শব্দ। তেরপলের তলা থেকে বেরিয়ে এলো সে। ট্রাকের কিনারে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকালো। পিয়ারে বাঁধা রয়েছে র‍্যাগনারসনদের বোটগুলো। ডেভিড র‍্যাগনারসনের বোটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে ডন।

লাফিয়ে নেমে পড়লো রবিন। লুকালো গিয়ে পেছনের চাকার আড়ালে। ওখান থেকে চোখ রাখলো। আরেকটা বোটের কাছে সরে গেছে ডন। প্লাস্টিকের জগটা রয়েছে তার পায়ের কাছে।

লুকানোর আরও ভালো কোনো জায়গার জন্যে আশেপাশে তাকালো রবিন। প্রথম পিয়ারটার কাছেই দেখা গেল একটা আউটসাইড রেস্টুরেন্ট। বাইরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চেয়ার-টেবিল। দ্রুত হাঁটা দিলো রবিন। চলে এলো একটা টেবিলের কাছে। টবে জন্মানো একটা পাম গাছের আড়ালে বসে পড়লো। দেখতে লাগলো. এক বোট থেকে আরেক বোটের কাছে সরে চলেছে ডন।

আচমকা নিজের বোটে লাফিয়ে উঠে পড়লো ডন। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। উঠে দাঁড়ালো রবিন। ততোক্ষণে চলতে শুরু করেছে বোট। সরে যাচ্ছে পিয়ারের কাছ

থেকে। নাক ঘোরালো ওটা। এগিয়ে চললো বন্দরের অন্য প্রান্তের বড় আরেকটা পিয়ারের দিকে।

সেই পিয়ারটার দিকে দৌড় দিলো রবিন।

পাহাড়ী পথ ধরে রকি বীচে ফিরে চলেছে মুসা। চোখ রেখেছে পথের পাশের থাম আর গাছপালার দিকে, আরও কোনো চিহ্ন যদি রেখে গিয়ে থাকে কিশোর, সেই আশায়। একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছলো সে। এবার কোন্ দিকে যাবে?

কমলা রঙের একটুকরো গোল কর্ক পড়ে রয়েছে পথের ওপর। শহরের দিকে গেছে রাস্তাটা। শাদা চক দিয়ে কর্কে একটা আশ্চর্যবোধক আঁকা। হাসলো মুসা। চিহ্ন রেখে যাওয়ার কিছু না কিছু পেয়েই যায় কিশোর পাশা, আর সেটা কাজে লাগাতেও দেরি করে না।

চলতে চলতে আরও চিহ্নের জন্যে চোখ রাখলো মুসা। কিন্তু পরের চৌরাস্তার মোড়ে আসার আগে কিছু পেলো না। এখানে পেলো আরেকটা একই রকম কর্ক। কোন্ দিকে যেতে হবে বোঝানো হয়েছে।

দ্রুত প্যাডাল করে একটা তে-রাস্তার মাথায় চলে এলো সে। চিহ্ন খুঁজলো। নেই। কোনো কিছুতেই আঁকা নেই শাদা আশ্চর্যবোধক।

পারলে চিহ্ন রেখে যাবেই কিশোর, মুসা জানে। মোড়ের কাছে নেই, তার মানে এখানে কিছু ফেলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। একটা কাজই করতে পারে এখন সে। কোনো একটা পথ ধরে এগোবে। কোথাও চিহ্নটিহ্ন পেলে ভালো, না পেলে ফিরে এসে দ্বিতীয় পথটা ধরে এগোবে। কিন্তু কোনোটাতেই যদি না পায়? সেটা তখন দেখা যাবে, ভেবে প্রথমে ডানের পথটা ধরলো সে

শহরতলীর দিকে গেছে এই পথ। ওখান থেকে সাগরের পাড়ে। ঠিক পথই ধরেছে সে। আধ মাইল যেতে না যেতেই পেয়ে গেল চিহ্ন। পথের ঠিক মাঝখানে পড়ে রয়েছে একটুকরো কাঠ, তাতে চিহ্ন আঁকা।

বন্দরের দিকে গেছে পথটা। সামনে দিয়ে চলে গেছে কোস্ট হাইওয়ে। বন্দরের পাশ দিয়ে। চোখে পড়ছে কয়েকটা পিয়ার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিশোরকে? ওসব পিয়ারে বাঁধা কোনো বোটে? হতাশা চেপে ধরলো মুসাকে। কি করবে এখন? ভাবতে লাগলো। কমলা কর্কগুলো কোথায় পেলো কিশোর? ওগুলো কিসের, জানে মুসা। জেলেদের জালের। জাল ভাসিয়ে রাখার জন্যে কিনারে বেঁধে নেয় জেলেরা। হয়তো কোনো জেলের ট্রাকে করেই কিশোরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাছ ধরা জাহাজ কিংবা বোটে। তাহলে এখন মুসার কাজ, পিয়ারের বোটগুলোতে খোঁজ করা।

ধীরে সাইকেল চালিয়ে পিয়ারের কাছে চলে এলো সে। আরেকটা টেলিগ্রাফের থামে শাদা চকের চিহ্ন চোখে পড়লো । কোস্ট হাইওয়ে থেকে একটা গাড়িপথ নেমে এসেছে, তার মাথায়ই রয়েছে থামটা। পথটা চলে গেছে একটা প্রাইভেট কমার্শিয়াল পিয়ারের কার পার্কে। বেশ কিছু বিল্ডিং আছে ওখানে। একটা সাইকেল র‍্যাকে সাইকেল বেঁধে রেখে হেঁটে কার পার্কে এসে ঢুকলো সে।

আরেকটা চিহ্ন দেখতে পেলো এখানে। শাদা, ঝরঝরে একটা পিকআপের টায়ারে আঁকা রয়েছে আশ্চর্যবোধক। ক্যালিফোর্নিয়ার নাম্বার প্লেট। শুরু হয়েছে ৫৬ দিয়ে। এটা সেই ট্রাক, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার, যেটা রবিনের পিছু নিয়েছিলো। যেটা দিয়ে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেয়া হয়েছিলো রবিনকে।

এদিক-ওদিক তাকালো মুসা। কোথায় বন্দী করে রাখা যেতে পারে কিশোরকে, খুঁজছে। কর্মাশিয়াল পিয়ারের একটা বিল্ডিঙে…সম্ভব।

দ্রুত কার পার্ক পেরিয়ে এলো সে। দেখতে লাগলো বাড়িগুলো। নানারকম ঘর রয়েছে ওখানে। ওয়্যারহাউস, স্টোরহাউস, সবই পেশাদার জেলেদের উপযোগী। পিপে, জাল, দড়ি ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। কাউকে চোখে পড়লো না। বিকেল হয়ে গেছে। বন্দরের শ্রমিকদের ছুটি হয়ে গেছে। উইকএণ্ডে চলে গেছে যে যার মতো। লোকজন নেই সে-কারণেই। কিশোরকে খুঁজতে শুরু করলো সে। কোথায় আছে? ধুলো পরা নোংরা জানালাগুলোর দিকে তাকালো। তালা দেয়া দরজা দেখলো। দেয়াল দেখলো। কোথাও যদি আঁকা থাকে আশ্চর্যবোধক। নেই। কোথাও নেই।

পিয়ারের শেষ মাথায় একটা এক মাস্তুলের ট্রলার দেখা যাচ্ছে। মাস্তুল আর বুম থেকে জাল ঝুলছে। জালের কিনারে আটকানো কমলা রঙের কর্ক।

সারির শেষ বাড়িটার পাশে পিয়ারে বাঁধা রয়েছে ট্রলারটা।

শেষের দুটো বাড়ির মাঝখানের ছায়ায় নড়ে উঠলো একটা ছায়া।

দ্রুত সেদিকে এগোলো মুসা। এমন ভাবে সরে গেল ছায়াটা, মনে হলো লুকিয়ে পড়লো। তারপর যেন মুসার শব্দ পেয়েই ঘুরে তাকালো।

'মুসা!'

'রবিন?'

একজন আরেকজনের দিকে ছুটে এলো।

'তুমি এখানে কি করছো?' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'তোমার তো ডন র‍্যাগনারসনের ওপর চোখ রাখার কথা।'

'তাই তো রাখছিলাম। এই শেষ বাড়িটার কাছে এসে ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে তার বোটে উঠে চলে গেল। পানিতে তাকে অনুসরণ করতে পারলাম না। তুমি এখানে কি করছো? কিশোর কোথায়?'

বোরিনসদের বাড়ি থেকে কি করে কিশোরের চিহ্ন ধরে ধরে এখানে এসেছে জানালো মুসা। বললো, 'নিশ্চয় বিপদে পড়েছে ও। নইলে পথের পাশের প্রতিটি থামেই চিহ্ন এঁকে এঁকে আসতো।'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। মুসার সঙ্গে একমত। 'তাহলে এখানেই কোথাও আছে। কিন্তু কোথায়?'

বন্দরের কিনারে সারি সারি নীরব বাড়িগুলোর দিকে তাকালো দু'জনে। কাউকে চোখে পড়লো না। কিশোরকে তো নয়ই। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, কিংবা বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে গোয়েন্দা প্রধান।

বিশ

সামনে দাঁড়ানো মুখোশ পরা লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। ছোট একটা ঘর। ওপরতলায়। অনেক ওপরে একটা মাত্র জানালা। কানে আসছে ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দ। বাতাসে শুঁটকি আর আলকাতরার কড়া গন্ধ।

'দেখুন,' হুমকি দিলো কিশোর, 'ভালো চাইলে খুলে দিন। নইলে পস্তাবেন।'

'আরে, বড় বড় কথা বলে তো!' চাপা গর্জন করে উঠলো লম্বা লোকটা।

'বেশি ছোঁক ছোঁক করে,' বললো হাতে টাট্টু আঁকা দ্বিতীয় লোকটা। 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়।'

'দেখুন,' হুঁশিয়ার করলো কিশোর, 'আমাকে খুঁজে বের করবেই ওরা। পুলিশ নিয়ে আসবে কিডন্যাপিং খুব বড় অপরাধ।'

'এতো কথা বলে কেন, টার?' বিরক্ত হয়ে বললো লম্বা লোকটা।

'তোমাদের বন্ধুদের আবার দেখতে চাও?' টার বললো। 'তাহলে বলে দাও বাকি ছবিগুলো কোথায়।'

'দেরি করে ফেলেছেন, জবাব দিলো কিশোর। 'পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে ছবি মিস্টার মিলফোর্ড ছেপে দিয়েছেন।'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি,' দাঁতে দাঁত চাপলো টার। 'দেরি হয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝবো। ছবিগুলো কোথায় জানতে চাইছি। এই ডরিস, কথা বলাও তো

এগিয়ে এসে কিশোরের একেবারে সামনে দাঁড়ালো ডরিস। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ, বলো দেখি, কোথায়?'

'ডন র‍্যাগনারিসন আর আপনারা রেকার'স রকে কি করছেন, বলুন তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো কিশোর 'স্মাগলিং?'

'ডন র‍্যাগনারসন কে?'

'কি জন্যে মনে হলো তোমার রেকার'স রকে কিছু করছি আমরা?'

'রকের ধারে কাছেও যাইনি আমরা কখনও।'

'ডেনজারাস তাই না, ডরিস?'

'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে আপনাদেরকে ওখানে দেখেছি আমরা,' কিশোর বললো।

চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো লোক দু'জন ঢেউয়ের শব্দ অনেক বেশি জোরালো লাগছে এই নীরবতায়।

'মাঝে মাঝে বড় বেশি চালাক হয়ে যায় ছোটরা,' টার বললো। 'আমার কথা বুঝতে পারছো, ডরিস?'

'পারছি। কিছু কিছু আছে অনেক বেশি চালাক।'

'বন্দরে লাশ ভাসতে দেখা গেলে কেমন হয়?'

'দেখা যাওয়ার কি দরকার আছে?'

ঢোক গিললো কিশোর। কিন্তু চেহারা স্বাভাবিক রাখলো। সে বলেই পেরেছে। বড় অভিনেতা সে। বললো, 'আমাকে কিছুই করবেন না আপনারা। যতোক্ষণ ছবিগুলো না পাচ্ছেন, কিচ্ছু করবেন না আমাকে। কারণ তাহলে ওগুলো আর পাবেন না কোনোদিন।'

'বেশি আশা করো না, বুঝলে!' গর্জে উঠলো টার।

'তিনজন তোমরা,' যুক্তি দেখালো ডরিস। 'অন্য দু'জন যদি দেখে মুখ নিচু করে পানিতে ভাসছো তুমি, বলতে আর একটা মুহূর্ত দেরি করবে না।'

ভয় পেলো কিশোর। কিন্তু সেটা কিছুতেই চেহারায় ফুটতে দিলো না। বরং রাগ দেখিয়ে বললো, 'কয়েকটা সাধারণ ছবির জন্যে ওরকম করছেন কেন? কি করেছি আমরা? আপনাদের স্মাগলিঙের ছবি তুলে ফেলেছি? সোনা? লোক পাচার? ড্রাগস?'

'স্মাগলিং?' সামান্য বিস্ময়ের ছোঁয়া টারের কণ্ঠে। 'ছেলেটা ভাবছে আমরা স্মাগলার।'

'ছেলেটার মাথায় মগজ আছে,' হুঁশিয়ার করলো ডরিস। 'বুঝে সমঝে কথা বলো।'

'যদি স্মাগল্যারই হই, তাহলে ডেনজারাস লোক আমরা, তাই না, খোকা?' টার বললো। 'ঝটপট এখন বলে ফেলো তো ছবিগুলো কোথায় আছে?'

'দিয়ে দাও। তারপর নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যাও।' আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে হাসলো ডরিস।

'তোমার দোস্তদের ডাকো। ছবিগুলো দিয়ে দিতে বলো।'

'এখুনি।'

'সময় থাকতে।'

'বাড়ি তো নিশ্চয় যেতে চাও। চাও না?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। ঢোক গিলে বললো, 'বেশ। ডাকছি ওদের।'

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। ডাকো ডাকো, দেরি করো না।'

'এবং কোনো চালাকির চেষ্টা করবে না। পকেট থেকে তো তোমার কার্ড বের করেই রেখেছি, ফোন নম্বর জানি। কাজেই শয়তানী করতে চাইলে ধরা পড়ে যাবে। ভুল নম্বরে করা চলবে না। বুঝলে?'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টার। ফিরে এলো একটা টেলিফোন সেট নিয়ে। কিশোরের কাছেই দেয়ালে টেলিফোনের সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে তিন গোয়েন্দার কার্ড দেখে হেডকোয়ার্টারে ডায়াল করলো। তারপর রিসিভারটা ধরলো কিশোরের কানের কাছে।

'ওদের বলো,' বাতলে দিলো ডরিস, 'একটা বুদ্ধি এসেছে তোমার মাথায়। সবগুলো ছবি তোমার এখুনি দরকার। নিয়ে আসে যেন। জলদি করে।'

'আবারও বলছি, কোনো চালাকির চেষ্টা করবে না।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। হতে পারে, হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে তার জন্যে

অপেক্ষা করছে রবিন আর মুসা। ওদেরকে কোনো একটা সংকেত দিতে হবে, যাতে ওরা বোঝে সে বন্দি হয়েছে।

টেলিফোন বাজছে। ধরছে না কেউ।

আছাড় দিয়ে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিলো ডরিস। 'দেখি। একটু পরে আবার করবো।'

দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ হলো। নিচতলা থেকে আসছে। থমকে গেল দুই চোর।

'দেখো তো গিয়ে,' ডরিস বললো।

বেরিয়ে গেল টার। বেরোনোর আগেই মুখোশ ধরে টান দিলো, খুলে নেয়ার জন্যে। নিচতলায় নেমে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে কিশোর। তারপর নীরবতা। একটু পরে চেঁচিয়ে বললো টার, 'ডরিস, মাছের বাজারের নতুন ম্যানেজার। নেমে এসো।'

'চুপ করে বসে থাকো,' কিশোরকে সাবধান করলো ডরিস।

বেরিয়ে গেল সে। দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কিশোরের। টেনেটুনে দেখলো। কিছুটা লম্বা হলো বলে মনে হলো, কিন্তু ঢিল হলো না। মরিয়া হয়ে উঠলো সে। বাঁধন খুলতে সাহায্য হয় এরকম কিছুর জন্যে তাকালো ঘরের চারপাশে। কিছুই নেই। জানালা খোলাই রয়েছে। কিন্তু এভাবে বাঁধা থেকে কিছু করতে পারবে না। ওখানে পৌছানো সম্ভব নয়।

সে নিশ্চিত, রবিন আর মুসা তাকে খুঁজতে যাবেই। আর গেলে চিহ্নও দেখতে পাবে। যেগুলো রেখে এসেছে। বোরিনসদের ড্রাইভওয়েতে থামের গায়ে যেটা এঁকে এসেছে, সেটা তো না দেখার কোনো কারণই নেই। চোরগুলো তখন তার দিকে পেছন করে সাইকেলটা ট্রাকে তুলছিলো। কিন্তু এরপর থেকে চিহ্ন রেখে আসা জটিল হয়ে যায়।

কমলা রঙের কর্কগুলো আগেই দেখে রেখেছিলো। ট্রাকের পেছনে তার সঙ্গে উঠেছিলো টার। সুযোগ খুঁজেছে কেবল কিশোর। মুহূর্তের জন্যে টার অন্য দিকে মুখ ফেরাতেই চিহ্ন ফেলে দিয়েছিলো সে। শেষ চিহ্নটা আঁকতে অবশ্য কোনো অসুবিধেই হয়নি। তাকে ট্রাকের চাকার কাছে বসিয়ে বিল্ডিঙের দিকে তাকিয়ে-ছিলো তখন টার। ডরিস গিয়েছিলো বাড়িটায়। তার সংকেতের অপেক্ষায় ছিলো টার।

এখন মুসা আর রবিনের ওপরই ভরসা। ভাগ্য ভালো হলে ওরা বোরিনসদের ওখানে যাবে, তার চিহ্ন দেখতে পাবে, অনুসরণ করে আসবে। কিন্তু জানবে কি করে সে কোথায় আছে? জানাতে হলে বাঁধন খুলতে হবে। আরেকবার টানাটানি করলো। ব্যর্থ হলো চেষ্টা। হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিলো সে। হাঁপাচ্ছে। তবে চোখ দুটো এখনও খুঁজছে বাঁধন খোলার মতো কিছু পাওয়া যায় কিনা।

শুধু তার সাইকেলটাই চোখে পড়ছে বার বার।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্যাডল ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। চোরেরা সরিয়ে ফেলে না থাকলে তার ওয়াকিটকিটা রয়ে গেছে ওটার মধ্যে। সকালে রেকার'স

রক থেকে ফিরে এসে যন্ত্রটা ব্যাগে ভরেছিলো সে।

বাঁধা থাকলেও পা দিয়ে মাটি ছুঁতে পারছে কিশোর। প্রাণপণ চেষ্টায় চেয়ার নিয়েই উঠে পড়লো। এমনভাবে বাঁধা রয়েছে পা, হাঁটার অবস্থা নেই। তবে ছোট ছোট লাফ দিতে পারছে। ওভাবেই কোনোমতে এসে পৌঁছলো সাইকেলের কাছে। হাঁটুতে ভর রেখে নিচু হয়ে নাকটা ঠেকাতে পারলো স্যাডল ব্যাগে।

আছে! ওয়াকিটকিটা আছে ওর মধ্যে!

দাঁত দিয়ে বাকলেস খুলে ওপরের চামড়ার ঢাকনা তুললো। মুখ ঢুকিয়ে দিলো ব্যাগের ভেতরে। অনেক কায়দা কসরৎ করে কামড়ে ধরে বের করে আনলো যন্ত্রটা। ধরে রাখতে পারছে না ঠিকমতো। পিছলে যাচ্ছে...গেলও। ঠকাস করে পড়লো মেঝেতে।

দম বন্ধ করে ফেললো কিশোর।

কান পেতে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে শুধু ঢেউয়ের শব্দ। আর হালকা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

কেউ এলো না।

কাত হয়ে শুয়ে পড়লো সে। ওভাবেই ঠেলতে ঠেলতে ওয়াকিটকিটাকে নিয়ে চলে গেল দেয়ালের কাছে। নাক দিয়ে বোতাম চেপে চালু করে দিলো যন্ত্র।

'শুনছো!' ঘড়ঘড়ে স্বর বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে. 'রবিন! মুসা! আছো তোমরা? শুনছো...'

একুশ

শুনতে পেলো দু'জনেই।

দোতলা কাঠের বাড়িটার পেছনে কয়েকটা বাক্সের পেছনে ঘাপটি মেরে রয়েছে রবিন আর মুসা। একটা লোককে দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে। তারপর কানে এসেছে পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'কিশোর!' বলে উঠলো মুসা।

'আমার ওয়াকিটকি!' পকেটে হাত দিলো রবিন। বের করে আনলো খুদে যন্ত্রটা। বোতাম টিপলো মেসেজ পাঠানোর জন্যে। 'ফার্স্ট, কোথায় তুমি? ভালো আছো?'

কিশোরের কণ্ঠ শুনে মনে হলো, ভীষণ অসুস্থ সে। 'নথি! বন্দরের কমার্শিয়াল পিয়ারের কাছে কোনো একটা বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে আমাকে। সেই দুটো লোক যারা ছবি চুরি করেছে, তারাই মিসেস বোরিনসের বাড়ি থেকে ধরে এনেছে আমাকে। তোমরা কোথায়?'

'বাইরে,' জবাব দিলো মুসা। 'তোমার চিহ্ন ধরে ধরেই এসেছি।'

'আমি পিছু নিয়েছিলাম...,' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল রবিন।

কিশোর বললো, 'জলদি আমাকে বের করো এখান থেকে। আমি একা। একটা লোকের সাথে কথা বলতে গেছে ওরা। জলদি করো।'

'তুমি কোথায়?' জানতে চাইলো রবিন।

'পিয়ারের শেষ মাথার বাড়িটার দোতলায়। চেয়ারে বাঁধা। একটা মাত্র জানালা রয়েছে, ইঞ্চিখানেক ফাঁক। অনেক ওপরে। আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয় ওখানে।'

'জানালা দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

'আকাশ ছাড়া আর কিছু না।'

'কিছু শুনছো?'

'ঢেউয়ের শব্দ। ভারি কোনো বোট-টোট ঘষা লাগছে বোধহয় দেয়ালের সঙ্গে।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো রবিন আর মুসা। পিয়ারে বাঁধা ফিশিং বোট যেটা ঘষা খাচ্ছে সেটা দেখিয়ে ইশারা করলো রবিন।

'জানালা দিয়ে কি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছো না, ফার্স্ট?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিলো কিশোর, 'মেঘ। ছোট্ট একটুকরো গোল মেঘ।'

পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মেঘটা দেখতে পেলো দু'জনে। তাড়াতাড়ি ঘুরে পিয়ারের পশ্চিম ধারে চলে এলো। ওপরে তাকাতেই দেখতে পেলো বাড়িটার অনেক উঁচুতে ছোট একটা জানালা, পশ্চিমের দেয়ালে। পানির দিকে মুখ করা। পানি আর বাড়িটার মাঝে ফাঁক খুবই সামান্য, তবে ওখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

'কিশোর,' মুসা জানালো, 'তোমার জানালাটা বোধহয় পেলাম। তুমি কিছু করতে পারবে?'

'চেয়ারের সাথে বাঁধা বললাম না,' জবাব এলো। 'কিছুতেই বাঁধন খুলতে পারছি না।'

বাড়িটার দেয়াল ঘেঁষে বসে ভাবতে শুরু করলো রবিন আর মুসা। পিয়ারের গায়ে ঘষা লাগছে ট্রলারটা। পিয়ারের কাছ থেকে দূরে খোলা সাগরে সার্ফিং করছে কিছু লোক।

'কিশোর যদি বেরোতে না পারে,' মুসা বললো, 'আমাদেরকেই যেতে হবে।'

মুখ তুলে জানালাটার দিকে তাকালো রবিন। 'কিভাবে?'

ভেবে দেখলো মুসা। দোতলা বাড়িটার ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। একবার তাকালো জানালার দিকে, তারপর পিয়ারে বাঁধা ট্রলারটার দিকে।

'এই, রবিন, ট্রলারে দড়ি আছে! ভাবছি, জানালার কাছে বুমটাকে নেয়া যায় কিনা? তাহলে চড়তে পারবো ওখানে।'

ট্রলারের বুমের দিকে তাকালো রবিন। মুখ তুললো আবার জানালার দিকে। 'কে চড়বে? তুমি?'

'আজকের দিনটা তোমার,' হেসে বললো মুসা। 'তোমার স্বপক্ষে। তুমি ছোট, হালকা। ওই জানালা দিয়ে তোমার জন্যে ঢোকাই সহজ। বুমটা এতোটা ভার

রাখতে পারবে কিনা জানি না। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

ট্রলারের ডেকে এসে উঠলো দু'জনে। লম্বা দড়িটা তুলে নিলো মুসা। রবিনের কোমরে একটা মাথা বেঁধে দিতে দিতে তার পরিকল্পনার কথা বললো, 'বুমের মাথায় চড়ে বসবে তুমি। আমি বুম ঘুরিয়ে তোমাকে জানালার কাছে নিয়ে যাবো। তুমি জানালার ভেতরে ঢুকবে। আমি এখান থেকে দড়ি টেনে ধরে রাখবো, আস্তে আস্তে ঢিল দেবো, তুমি মেঝেতে নামবে। কিশোরের বাঁধন কেটে দেবে। তারপর আবার জানালায় টেনে তুলবো তোমাকে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে বুমে চড়বে। দড়িটা খুলে ছুঁড়ে দেবে জানালার ভেতরে। কিশোর তখন ওটা কোমরে বাঁধবে। ওকেও একই ভাবে বের করে আনবো। তারপর বুম থেকে মাস্তুল বেয়ে নিজেরাই নেমে আসতে পারবে।'

সন্দেহ জাগলো রবিনের চোখে। 'আমার পছন্দ হচ্ছে না, মুসা। অনেক কিছুই গোলমাল হয়ে যেতে পারে।'

'গোলমাল একটাই হতে পারে,' সাহস জোগালো মুসা, 'ওই লোকগুলোর হাতে পড়তে পারো। তাড়াতাড়ি করো, কিছুই হবে না। এই যে, এটা নিয়ে যাও,' পকেট নাইফটা বাড়িয়ে দিলো সে। 'তোমরা বেরোতে চাও এটা আমাকে বোঝাতে হলে তিনবার দড়ি ধরে টানবে।'

কোমরে দড়ি বাঁধা। সারকাসের দড়াবাজিকরের যেমন থাকে। তেমনি ভাবেই মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করলো রবিন। দেখে যতোটা কঠিন মনে হয়েছিলো, চড়তে গিয়ে দেখে ততোটা নয়। জাল জড়ানো রয়েছে মাস্তুলের গায়ে, মইয়ের কাজ করছে খোপগুলো। মাথায় উঠে গেল সে। মাস্তুলের মাথা থেকে ইংরেজি টি অক্ষরের একমাথার মতো বেরিয়ে রয়েছে বুমটা। তার মাথায় দড়ি বাঁধা, টেনে যেদিকে খুশি ঘোরানোর জন্যে। ওটা ঘোরাতে শুরু করলো মুসা। নিয়ে গেল জানালার কাছে। সহজেই হাত বাড়িয়ে জানালার চৌকাঠ ধরে ফেলতে পারলো রবিন।

শক্ত করে দড়িটা ধরে রাখলো মুসা, যাতে বুমটা একটুও না নড়ে। চৌকাঠ ধরে উঠে গেল রবিন। ঢুকে গেল ভেতরে। আস্তে করে রবিনের কোমরে বাঁধা দড়ির আরেক মাথা মাস্তুলের গা থেকে খুলে নিয়ে ছাড়তে থাকলো সে।

জানালা গলে রবিনকে নেমে আসতে দেখে হাসলো কিশোর। নিচে পা দিয়েই কোমরের দড়ি খুলে ফেলে তার বাঁধন কাটতে এগোলো রবিন।

'জলদি করো!' তাগাদা দিলো কিশোর। 'ব্যাটারা এসে পড়বে!'

ছুরির কয়েক পোঁচেই বাঁধন মুক্ত হয়ে গেল কিশোর। প্রায় দৌড়ে এলো দু'জনে জানালার কাছে। চেয়ারটা নিয়ে আসা হলো। দড়ি কোমরে বেঁধে ওঠার চেয়ে চেয়ারে উঠে হাত বাড়িয়ে চৌকাঠ ধরে শরীরটা টেনে তোলা সহজ।

প্রথমে উঠলো রবিন বেরিয়ে গেল বাইরে।

তারপর কিশোর।

ওঠার চেয়ে নামাটা সহজ মনে হলো রবিনের। মাস্তুল বেয়ে ডেকে নেমে এলো সে। কিশোর মাঝপথে থাকতেই একটা চিৎকার শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে

তিনজনেই দেখতে পেলো, সেই মুখোশধারী দু'জন। ছুটে আসছে।

একটা মুহূর্ত দেরি করলো না মুসা। কিশোর আর রবিনকে আসতে বলেই ট্রলারের রেলিঙ টপকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো পানিতে।

প্রাণপণে সাঁতরে চললো তিনজনে। লোকজন যেদিকে রয়েছে সেদিক দিয়ে উঠবে। নির্জন কোথাও উঠলে আবার ধরা পড়তে হবে চোরগুলোর হাতে।

বেশ কিছু দূর এসে ফিরে তাকালো মুসা। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। বললো, 'এখানে আমাদের পিছু নেয়ার সাহস করবে না ওরা। অন্তত ওই মুখোশ পরে তো নয়ই। লোকের চোখে পড়ে যাবে।'

'চলো, বাস ধরে চলে যাই,' কিশোর বললো।

'আমার সাইকেল?'

'পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

সারা শরীর ভেজা। টপটপ করে পানি পড়ছে। কাজেই বাসের একেবারে পেছনের সীটে যেখানে আর কোনো যাত্রী নেই সেখানে বসতে হলো তিনজনকে। যাত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে আলোচনা করতে লাগলো ওরা। ছোট স্টোররুমে কি কি দেখতে পেয়েছে, কিশোরকে জানালো রবিন আর মুসা। অবশ্যই কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে, যাতে আর কেউ শুনতে না পায়। রবিন জানালো, কিভাবে ডনকে অনুসরণ করে বন্দরে এসেছে। ডন কি করেছে এখানে এসে।

'ওই ডন ব্যাটাই ক্যাপ্টেন কুল্টারের ভূত সেজেছিলো,' রবিন বললো। 'ডুবে মরা নাবিকের ভূতও তারই কাণ্ড। সম্ভবত, মায়ানেকড়ের ডাকের জন্যেও সে-ই দায়ী। কেন করেছে এসব জানো? রেকার'স রকে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে সে।'

'আর মুখোশ পরা লোকগুলো তার সহকারী,' যোগ করলো মুসা।

'আমার মনে হয় ওদের সাথে দেখা করার জন্যেই বন্দরে এসেছে ডন,' রবিন বললো। 'বাজি রেখে বলতে পারি, কাল রাতে ভূতুড়ে জাহাজটায় ওদের কেউ একজন ছিলো। আরেকজন খাঁড়ির পাড়ে থেকে টর্চের সাহায্যে সংকেত দিচ্ছিলো। আর ক্যাপ্টেন কুল্টারের পোশাক পরে আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে ডন। জাহাজটা এসেছিলো গুপ্তধনগুলো তুলে নিয়ে যেতে।'

'হয়তো,' বিড় বিড় করলো কিশোর। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, সোনাগুলো সরিয়ে নিতে ওদের দরকার পড়বে কেন ডনের?'

'তাহলে আর কি কারণ?' মুসার প্রশ্ন। 'পিয়ারে ওদের সাথে কথা বলতেই বা আসবে কেন ডন?'

'দেখেশুনে মনে হয়, ডনের সঙ্গেই কাজ করছে ওরা,' কিশোর বললো। 'মিসেস বোরিনসের বাড়িতে আমাকে যেতে দেখে আমাকে ধরার জন্যেই পাঠিয়েছিলো দুই দোস্তকে।'

'বোরিনসদের বাড়িতে গিয়েছিলো?' অবাক হলো রবিন।

'গিয়েছিলো। বাপের মুখে হয়তো শুনেছে আমি ওখানে গিয়েছি। তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে দেখার জন্যে, সত্যিই আমি গিয়েছি কিনা।'

অবাক হলো মুসা। 'কেন, সেখানে যাওয়ার কষ্টটা করতে যাবে কেন?'

শ্রাগ করলো কিশোর। 'কে জানে! হয়তো সারাক্ষণ আমাদের ওপর নজর রাখা দরকার মনে করেছে সে। মিসেস বোরিনসকে জিজ্ঞেস করেছি, ডনের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা, কথা বলেছেন কিনা। অস্বীকার করলেন। মহিলা এবং তার দেবর, দু'জনেই। অথচ, রান্নাঘরের দরজার নিচে তার মোটরসাইকেলের চাকার দাগ দেখেছি। ওরকম একটা জায়গায় ছিলো ও, কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি, এটা হতে পারে না...'

থেমে গেল কিশোর। দ্বিধান্বিত। সব কিছু খাপে খাপে মিলছে না।

'চলো, হেডকোয়ার্টারে যাই,' বললো সে। 'ওখানে বসেই আলোচনা করে জটগুলো ছাড়ানোর চেষ্টা করবো।'

বাইশ

আরেকবার আটচল্লিশটা ছবি ছড়িয়ে নিয়ে বসলো তিন গোয়েন্দা। যেগুলোতে ডন রয়েছে, সেগুলো বেছে নিলো।

'এই যে,' একটা ছবিতে আঙুল রাখলো মুসা, 'অন্যদের পেছনে ঝুঁকে রয়েছে। আমি শিওর, মাটি থেকে সোনার মোহর তুলছে সে।'

'আমাকে ছবি তুলতে দেখেছিলো,' রবিন বললো। 'সে-জন্যেই কেড়ে নিতে চায় ওগুলো।'

ছোট ঘরটায় পায়চারি করছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। ডেস্কের ধারে এসে দাঁড়ালো। একটা ছবি তুলে নিয়ে পায়চারি শুরু করলো আবার। দেখা শেষ করে সেটা রেখে আরেকটা ছবি তুলে নিলো। এভাবেই এক এক করে পরীক্ষা করতে লাগলো ছবিগুলো।

'হ্যাঁ, এই ছবিগুলোই ডন ফেরত চায়,' অবশেষে কথা বললো গোয়েন্দা-প্রধান। 'ছবি দেখে বলা যাচ্ছে না আসলে সে কি করছিলো। কিন্তু সে সেটা জানে না। মোহরগুলো অন্য কেউ দেখে ফেলুক, এই ঝুঁকিও নিতে চায় না। সবাইকে ভয় দেখিয়ে দ্বীপ থেকে তাড়াতে চেয়েছে, যাতে নিরাপদে সমস্ত গুপ্তধন তুলে আনতে পারে।'

আবার একটা একটা করে ছবি দেখতে লাগলো সে। 'মুখোশধারী লোক দুটো তার হয়ে কাজ করছে। আমাদের নেগেটিভগুলো চুরি করেছে ওরা। প্রিন্টগুলোও নেয়ার চেষ্টা করছে,' রবিন বললো। 'ডন ওদেরকে পাঠিয়েছে তোমাকে কিডন্যাপ করে আনার জন্যে, যাতে ছবিগুলো দিতে বাধ্য করতে পারে তোমাকে। এবং কিছুতেই কাউকে জানতে দিতে চায় না যে সে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে।'

'এমনও হতে পারে,' মুসা বললো, 'যেখানে পেয়েছে ওগুলো সেখানে রাখেনি। সরিয়ে ফেলেছে দ্বীপেরই অন্য কোনোখানে। জাহাজ সহ চোর দুটোকে ভাড়া করেছে ওগুলো দ্বীপ থেকে তুলে আনতে তাকে সাহায্য করার জন্যে।'

'কাল রাতে কুয়াশার মধ্যে গিয়েছিলো সে-জন্যেই,' রবিন বললো। 'কিন্তু আমাদের জন্যে পারেনি।' কুয়াশা ছিলো বলেই দ্বীপে লোক থাকা সত্ত্বেও পরোয়া করেনি। ভেবেছে, কেউ খেয়াল করবে না।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'যুক্তিতে মিলে যায়। কিন্তু সেই একই সমস্যা থেকে গেল। কেন লোকদুটোকে দরকার হলো ডনের? কেন নিজেই সব নিয়ে নিচ্ছে না?' তার নিজের বোট আছে। দ্বীপের কোথাও যদি লুকিয়েই রেখে থাকে, থাকলো। অল্প অল্প করে তুলে আনলেই তো পারে"। কেউ জানবেও না, কোনো ঝামেলাও হবে না। ভাগও দিতে হবে না। সেটাই কি স্বাভাবিক ছিলো না?'

'হতে পারে,' মুসা যুক্তি দেখালো, 'আমরা ছবি তুলে আনায় ঘাবড়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে তুলে আনার জন্যে লোক ঠিক করেছে।'

'তা হতে পারে,' ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। পত্রিকায় ছবি বেরিয়েছে যে একথা কি করে জানলো ডন? রবিনের আব্বার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যে লোক পাঠালো। আর মনে করে দেখো, ডাক্তার ইংমার বলেছেন, মঙ্গলবারে রবিনের কাছ থেকে যখন নেগেটিভগুলো কেড়ে নেয়া হয়, তখন দ্বীপে ছিলো ডন।'

'ডন না পাঠালে তাহলে কে পাঠালো, কিশোর?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'তাছাড়া,' মুসা মনে করিয়ে দিলো, 'পিয়ারে ওদের সাথে ডনকে কথা বলতে দেখেছে রবিন।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করলো কিশোর, 'ওরা একসাথেই হয়তো কাজ করেছে।'

'তাহলে কি এখন গিয়ে ইংমার আর প্রিনসিপাল স্যারকে জানাবো?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'আর পুলিশকে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ নীরবে। তারপর বললো, 'ডন যে সোনাগুলো পেয়েছে, তার কোনো প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। আর আমার মনে হয় না, শুধু সোনা নিয়েই এই গণ্ডগোল। আরও কিছু রয়েছে। ডন এমন কিছু করেনি, যে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কিছু বলতে পারবো। কিডন্যাপও সে করেনি আমাকে। এ-ব্যাপারে তার কথা কিছু বলা যাবে না। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে জোরালো প্রমাণ জোগাড় করতে হবে আমাদের। আর তা করতে হলে রেকার'স রকে যেতে হবে। ডাক্তার আর প্রিনসিপাল স্যারের সঙ্গে আজ রাতে আবার দ্বীপে যাবো আমরা। বাড়ি যাও এখন। গোসল-টোসল করে শুকনো কাপড় পরো। বাড়িতে বলে আসবে আজ রাতে ফিরছো না।'

রবিনের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচটার বেশি বেজে গেল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবিগুলো যারা চুরি করতে চেয়েছিলো, তাদের ব্যাপারে আর কিছু জেনেছো?'

'আমরা অনুমান করছি,' জবাব দিলো রবিন, 'ওদের সাথে ডন র‍্যাগনারসনের সম্পর্ক রয়েছে। স্টার অভ পানামার হারানো সোনা খুঁজে পেয়েছে সে। কাউকে

সেকথা জানতে দিতে চায় না।'
'সোনার ছবি তোলোনি তো তুমি!'
'আমরা তা-ই ভাবছি। অথবা ওরকমই কোনো কিছুর।'
নিজের ঘরে চলে এলো রবিন। গা ধুয়ে এসে শুকনো জামাকাপড় পরলো। তারপর শুকনো জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে নেমে এলো আবার নিচতলায়।
'বাবা, মাকে বলো আজ রাতে ফিরবো না আমি। কিশোর আর মুসার সঙ্গে আবার রেকার'স রকে যাবো। সারারাত থাকতে হতে পারে।'
'যাও সাবধানে থেকো।'
'আচ্ছা।'
বিকেলের উষ্ণ রোদের মধ্যে সাইকেল চালিয়ে আবার স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে এলো রবিন। এসে দেখলো, মুসা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখছে সাইকেল। উত্তেজিত হয়ে আছে কিশোর। রবিনকে দেখেই বলে উঠলো, 'এখুনি যেতে হবে। ট্রাক নিয়ে বসে আছে বোরিস। আমাদেরকে বন্দরে পৌছে দেবে। অন্ধকার হওয়ার আগেই দ্বীপে পৌছতে হবে আমাদের।'
'খাইছে! কিশোর, কি হয়েছে?'
'এখনও শিওর না,' দ্রুত বললো কিশোর, 'তবে রেকার'স রকে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে। আমাদের কল্পনারও বাইরে। ছবিগুলো আবার দেখেছি। দেখেই মনে হয়েছে একথা।'
'কিন্তু এতো তাড়া কিসের?' ট্রাকের দিকে এগোতে এগোতে রবিন জিজ্ঞেস করলো।
'কারণ ডন চলে গেছে ওখানে। অন্ধকার হয়ে গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে।'
'মিস্টার ইংমার আর ডেভিডকে বলবে না?'
'বন্দরে পৌছে গেছেন। তোমরা যাওয়ার পরপরই ফোন করেছিলাম। তাঁরা, এবং আর যারা যারা দ্বীপে যেতে চায় আজ, ছ'টার মধ্যে রওনা দেবে।'
'আমাদের পোশাক-টোশাক?' মুসা জানতে চাইলো।
'লাগবে না। ডন জেনে গেছে আমরা কে, কি করছি। ছদ্মবেশ আর দরকার নেই।'
ট্রাকের পেছনে চড়লো তিনজনে। স্টার্ট দিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলো বোরিস।
মুসা আর রবিন অবাক হয়ে ভাবছে, ছবিগুলোতে কি দেখতে পেয়েছে কিশোর? জিজ্ঞেস করলে বলবে না, জানা আছে ওদের। সময় না হলে কিছুতেই মুখ খুলবে না সে। কাজেই অযথা প্রশ্ন করলো না।
বন্দরে এসে সাইকেল র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে খুশি হলো মুসা। 'আছে। ঠিকঠাকই আছে।'
'সাইকেল তো দুটো, মুসা,' রবিন বললো।
'তাই তো! কিশোরেরটা!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।
'বোরিস,' কেবিনের জানালার পাশে ঝুঁকে ডাকলো কিশোর, ট্রাক থামান।'

কিশোরের সাইকেলটা কাছে থেকে দেখলো তিনজনে। কোনো ক্ষতি করা হয়নি। মুসারটার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। স্যাডল ব্যাগটাও জায়গামতোই রয়েছে।

'পুলিশ নিয়ে ফিরে আসতে পারি,' কিশোর বললো, 'এই ভয়ে এটা এখানে রেখে গেছে। যাক, ভালোই হয়েছে। সাইকেলটা ফেরত পেলাম।'

'এখন আর কিডন্যাপিঙের ঘটনাটাও প্রমাণ করতে পারবো না,' নিরাশ হয়ে বললো রবিন।

'না পারার জন্যেই তো করেছে এরকম,' কিশোর গম্ভীর। 'প্রমাণ দিতে পারবো না। পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবো না।'

সাইকেল দুটো ট্রাকে তুলে নিলো ওরা। নিজেরাও চড়লো আবার। পাবলিক পিয়ারে ট্রাক নিয়ে এলো বোরিস, যেখানে র‍্যাগনারসনদের বোটগুলো বাঁধা রয়েছে। কয়েকজন র‍্যাগনারসন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিন গোয়েন্দাকে নামতে দেখে এগিয়ে এলেন ইংমার আর প্রিনসিপাল।

'সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে!' প্রিনসিপাল জানালেন। 'একটাকেও স্টার্ট দিতে পারবো না।'

'স্যাবোটাজ করে দিয়ে গেছে!' ডাক্তার বললেন।

তেইশ

'ডনের কাজ!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। পাঁচ গ্যালনের প্লাস্টিক জগে করে রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে এসেছিলো যে ডন, সেকথা জানালো। 'নিশ্চয় পেট্রোল ট্যাংকে ঢেলে দিয়েছে। যাতে এঞ্জিন স্টার্ট না হয়। এমন ভাবে ঢালছিলো, যে কেউই দেখলে ভাববে পেট্রোল ঢালছে।'

'তাহলে একাই রকে চলে গেল!' মুসা বললো সাগরের দিকে তাকিয়ে। 'এমন ব্যবস্থা করে রেখে গেছে, যাতে আর কেউ যেতে না পারে।'

'আর কোনো বোট নেই, স্যার?' প্রিনসিপালকে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'আমাদের যে ক'টা ছিলো,' রেগে গিয়ে বললেন প্রিনসিপাল, 'সব নষ্ট করে দিয়ে গেছে। করছে যে কি ছেলেটা, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সে-ই ভূত, মায়ানেকড়ে, সব কিছু,' বলে দিলো মুসা।

'হারানো সোনাগুলো খুঁজে পেয়েছে সে,' বললো রবিন।

'সোনা?' বুঝতে পারলেন না প্রিনসিপাল।

'হ্যাঁ, স্যার।' কিশোর বুঝিয়ে দিলো, 'স্টার অভ পানামাকে ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় ওটার ক্যাপ্টেন। সোনাগুলো নিয়ে রেকার'স রকে উঠেছিলো হয়তো সে। এখন আমরা জানি অন্তত কিছুটা হলেও সোনা রয়ে গেছে দ্বীপে। হয়তো সবই রয়েছে, জানি না। এবারে সেলিব্রেশনে গিয়ে সেগুলো কোনোভাবে বের করে ফেলেছিলো ডন। কাউকে ভাগ দিতে চায়নি। তাই ভয় দেখিয়ে সবাইকে তাড়াতে চেয়েছে।'

'কাল রাতে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিলো,' রবিন বললো। 'আপনারা দু'জন আর আমাদেরকে বাদে আর সবাইকে তাড়িয়েছিলো। আজকে সব বোটগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে যাতে দ্বীপে কেউ যেতে না পারেন।'

'বোধহয় দুজন জেলেকে বাদে,' মুসা বললো।

'একটা বোট ভাড়া করতে পারি আমরা,' প্রিনসিপাল বললেন।

'তার দরকার হবে না,' কিশোর বললো। 'আমার অনুমান সত্যি হলে ডন এখন র‍্যাকার'স রকে রয়েছে দু'জন ডেনজারাস লোকের সঙ্গে, যারা আমাদের নেগেটিভ চুরি করেছে। আমাকে কিডন্যাপ করেছে।' কি করে তার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দি করেছে, খুলে বললো কিশোর। 'সোনা ছাড়াও আরও কোনো কিছুতে জড়িত রয়েছে ডন। সে জানে না লোকগুলো কতটা খারাপ। পেশাদার চোর, কিডন্যাপার। যা-ই করুক, আমার ধারণা মারাত্মক বিপদে রয়েছে এখন সে। ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে জানানো দরকার, যেন পুলিশ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসেন।'

'চীফের সাথে কথা বলা দরকার,' ডাক্তার বললেন।

'আমার গাড়িটা কাছেই, চলো,' বললেন প্রিনসিপাল।

বোরিসকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলো কিশোর। ওরা তিনজন আর ডাক্তার ইংমার মিলে পাঁচজনে ঠাসাঠাসি করে বসলো প্রিনসিপালের গাড়িতে। থানায় চললো। ডেস্কে বসা সার্জেন্টকে বললেন ডেভিড, ক্যাপ্টেনকে খবর দিতে। ফ্লেচার নিচে এসে তাদেরকে অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। দ্রুত তাঁকে সব কথা জানালো কিশোর।

'ওই লোকগুলোর সাথে যে কিভাবে জড়ালো, ডাক্তার বললেন দুঃখ করে, 'বলতে পারবো না। ওদের কথায় বুঝলাম, ক্যাপ্টেন, এবার ভালো বিপদে জড়িয়েছে সে। জলদি চলুন।'

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'শুনে তো সেরকমই মনে হচ্ছে। লোকগুলোকে বোধহয় চিনতে পারছি। টার আর ডরিস হ্যাংম্যান। জেলে। আগেও কয়েকবার বেআইনী কাজ করে পুলিশের তাড়া খেয়েছে। বন্দরেই রয়েছে পুলিশের লঞ্চ। চলুন।'

বন্দরে ফিরে এলেন প্রিনসিপাল। তাঁর গাড়িতে করেই এলেন ইংমার আর তিন গোয়েন্দা। পুলিশের গাড়িতে করে এলেন ইয়ান ফ্লেচার আর তিন পুলিশ অফিসার। পুলিশের বোটে উঠলো সবাই। একটুও দেরি না করে ছেড়ে দিলো বোট।

সাতটা বেজে গেছে। দিগন্তের কাছাকাছি নেমে পড়েছে সূর্য। বোটের রেলিঙে দাঁড়িয়ে রেকার'স রকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

'সময় মতো পৌঁছতে পারলেই হয় এখন,' বললো কিশোর।

'ডন বিপদের মধ্যে রয়েছে ভাবছো কেন?' জিজ্ঞেস করলে ইংমার।

'কেন বলতে পারবো না। মনে হচ্ছে, তাই,' জবাব দিলো কিশোর। 'অন্ধকার হওয়ার পর পরই পৌঁছতে পারলে ভালো হতো।'

সূর্যের দিকে তাকালেন চীফ। 'হুঁ, অন্ধকার হওয়ার আগে পারবোও না।'

'সেটাই ভালো হবে। ওদের অলক্ষ্যে নামতে পারবো দ্বীপে। দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বলবেন। একটা আলোও যেন না জ্বলে।'

'বলবো।'

রেকার'স রকে যখন বোটটা পৌঁছলো অন্ধকার জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে তখন। এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। ভেসে ভেসে চলেছে এখন বোট, আপন গতিতে। সৈকতের ওপর অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে র‍্যাগনারসনদের তাঁবুগুলো।

অন্ধকার খাঁড়িতে থামলো বোট। লাইফবোট আর রবারের দুটো ভেলা নামিয়ে তাতে চড়ে বসলেন দুই র‍্যাগনারসন, তিন গোয়েন্দা, চীফ আর তাঁর তিনজন অফিসার। নিঃশব্দে এসে তীরে ভিড়লো ওগুলো।

'কিশোর, দেখো,' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

'ডনের বোট,' চিনতে পারলেন ইংমার।

সৈকতে টেনে তুলে রাখা হয়েছে ছোট বোটটা। আউটবোর্ড মোটরটা ওপর দিকে তোলা। খাঁড়িতে শুধুমাত্র ওই একটাই বোট, আর নেই।

'আর তো নেই, কিশোর,' শান্ত কণ্ঠে বললেন চীফ। সাগরের দিকে তাকালেন।

'না, নেই,' দ্বীপের ওপরে ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। 'থাকার কথাও নয় এখানে। দ্বীপের অন্য পাশে গিয়ে দেখা দরকার। টিলাটার কাছে।'

'বেশ, চলো,' রাজি হলেন ক্যাপ্টেন। 'ছড়িয়ে পড়তে হবে আমাদের। যাতে পুরো দ্বীপটাই কভার করা যায়।'

অফিসারদেরকে নির্দেশ দিলেন চীফ। কিশোরের নির্দেশে রবিন চলে গেল উত্তরে। প্রিনসিপাল নিজের ইচ্ছেতেই চললেন দক্ষিণের নিচু চূড়াটার দিকে। এর মাঝামাঝি অংশে ছড়িয়ে পড়লো অন্যেরা। পশ্চিমের টিলার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো সবাই। একটা জায়গায় মিলিত হবে।

টিলার গোড়ায় জুনিপারের সারির কাছে পৌঁছে, মোড় নিয়ে, হলুদ ফুলওয়ালা গুল্ম জন্মে রয়েছে যে জায়গাটায় সেদিকে চললো কয়েকজন। অসমতল ভূমিতে ফেলে রাখা বাক্সটার গায়ে হোঁচট খেলো মুসা। সোনার মোহর আর তালগুলো ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

'এখানেই কোথাও আছে ডন,' বললো সে। 'বাক্সটা ফেলে গেছে কোনো কারণে।'

কিন্তু ডনের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও।

'খুঁজতে হবে,' চীফ বললেন।

'ওকে বের করার আরও সহজ উপায় আছে, চীফ,' কিশোর বললো।

চব্বিশ

'কি উপায়, কিশোর?' জানতে চাইলেন ফ্লেচার।

'আসুন আমার সাথে,' কিশোর বললো। 'দেখাই। টর্চ জ্বালবেন না কেউ।'

আগে আগে চললো কিশোর। গুল্মে ঢাকা জায়গাটা পেরিয়ে চলে এলো খাঁড়ির কাছের উঁচু জায়গাটায়। নীরবে তাকে অনুসরণ করলো অন্যেরা। কুয়াশা নেই। চাঁদও ওঠেনি এখনও। টর্চ জ্বালতে পারছে না। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেতে পারে, তাই সতর্ক হয়ে হাঁটছে সবাই।

'এখানেই ভূতটাকে দেখেছিলাম,' ফিসফিস করে বললো মুসা।

'ভূতফূত কিছু নেই,' মনে করিয়ে দিলো রবিন। 'ডনই ক্যাপ্টেন কুল্টারের ছদ্মবেশ নিয়েছিলো।'

'তারপরেও···।' কথাটা শেষ করলো না মুসা।

ওদেরকে চুপ করতে বলে বসে পড়লো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে খাঁড়ির অন্য পাড়ে মাথা তুলে থাকা বিশাল টিলাটার দিকে।

'কি দেখছো?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'মনে হয়···'

শেষ হলো না তার কথা। খুদে খাঁড়ির পাড় থেকে জ্বলতে-নিভতে শুরু করলো একটা টর্চ। সাগরের দিকে মুখ করে।

'ডন?' ফিসফিস করলেন ফ্লেচার।

'কিশোর জবাব দেয়ার আগেই মুসা বলে উঠলো, 'দেখো! দেখো!'

একটা চলমান জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের দিকে ঘুরে এগিয়ে আসছে। এঞ্জিন বন্ধ। নিঃশব্দে ভেসে এসে খাঁড়িতে ঢুকলো জাহাজটা। নোঙর ফেললো। হুইল হাউসের উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো খাঁড়ির পাড়ে সৈকতে।

'এটাই ভূতের জাহাজ!' নিচু গলায় বললো রবিন।

এক মাস্তুলের সেই জাহাজটা। কুয়াশার মধ্যে যেটার ধূসর পাল দেখেছে ওরা। এখন চিনতে পারলো, পাল নয়, জাল। বুম থেকে ঝুলছে। কুয়াশার জন্যে মনে হয়েছিলো অসংখ্য ফুটোওয়ালা একটা পাল। শরীরটা মনে হয়েছিলো ধূসর, আর শ্যাওলায় ঢাকা। এই ট্রলারের বুমে উঠেই কিশোরকে বের করে এনেছিলো রবিন। দু'জন লোককে দেখা গেল।

'ওরাই হ্যাংম্যান,' চীফ বললেন। 'কিশোর, ওরাই কিডন্যাপ করেছিলো তোমাকে? চিনেছো?'

'ওদের মতোই তো লাগছে। মুখে মুখোশ ছিলো তখন, চেহারা দেখিনি। তবে একজন লম্বা। আরেকজন বেঁটে আর ভারি। তাদের সাথে মিলে যায়।'

ট্রলার থেকে একটা রবারের বোট নামানো হলো। লম্বা লোকটা তাতে চড়ে দাঁড় বেয়ে চলে এলো কিনারে। লাফিয়ে বালিতে নেমে টেনে বোটটা তুলে আনলো শুকনোয়। তারপর দাঁড়িয়ে রইলো যেন কোনো কিছুর অপেক্ষায়।

'কিসের অপেক্ষা করছে?' প্রিনসিপাল জানতে চাইলেন।

'হয়তো ডনের জন্যে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

কিছু বললো না কিশোর। ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে চুপ থাকার ইশারা করলো।

সৈকতে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলো লোকটা।

টিলার দিকে তাকালো কিশোর। 'ওই যে,' তার কণ্ঠে খুশির আমেজ। ফিরে তাকালো অন্যেরা।

যেন টিলাটার গোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোক দুটো। তাদের একজন ডন র‍্যাগনারসন।

আরেকজন খাটো, মোটা, মাঝবয়েসী। পরনে হালকা পোশাক আর স্কি জ্যাকেট।

'আরে, সেই জ্যাকেটটার মতোই তো লাগছে!' অবাক হয়ে বললেন প্রিনসিপাল। 'তাবু থেকে চুরি গেছে যেটা!'

ডনকে আগে রেখে ঠেলতে ঠেলতে যেন লম্বা লোকটার কাছে নিয়ে গেল মোটা লোকটা। এমন ভাবে চলেছে ডন, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। জোর করা হচ্ছে যেন তাকে। হঠাৎ মোটা লোকটার হাতে ঝিক করে উঠলো কিছু, তারার আলোয়।

'ছুরি!' ভয় পেয়ে গেলেন ইংমার। 'ডনকে বন্দি করেছে ওরা!'

উঠে দাঁড়ালেন চীফ। চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন, 'দাঁড়াও! পুলিশ! ছুরিটা ফেলে দাও!'

একসাথে জ্বলে উঠলো কয়েকটা টর্চ। পুলিশ অফিসার আর চীফের হাতের পিস্তল দেখতে পেলো মোটা লোকটা। ট্রলারের দিকে পিস্তল আর টর্চ তাক করলো একজন অফিসার। গলুইয়ে দাঁড়ানো বেঁটে লোকটার গায়ে আলো পড়লো।

'ওর হাত দেখেছো!' বলে উঠলো মুসা। 'টাট্টু! মারমেইড!'

'তার মানে ওরাই,' কিশোর বললো। 'হ্যাংম্যানরা দুই ভাই। আমাকে ধরেছিলো।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো মোটা লোকটা আর দুই জেলে। উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ওদের। অবশেষে ছুরি ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুললো মোটা লোকটা।

সবাই নিচে নামলো, সৈকতে, শুধু একজন অফিসার বাদে। যে ট্রলারের দিকে পিস্তল তাক করেছে। ভুরুর ঘাম মুছলো ডন। বোকার মতো মাথা ঝাঁকালো বাবা আর তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে।

'তোমাদের দেখে সত্যি খুশি হয়েছি,' গোয়েন্দাদেরকে বললো সে। 'কি করে বুঝলে?'

'কিশোর,' চীফও জানতে চাইলেন, 'এবার বলে ফেলো তো? কি ঘটতে যাচ্ছিলো এখানে? ওই লোকটা কে?' মোটা লোকটাকে দেখালেন তিনি। জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

'মিস্টার ডেনমার বোরিনস, চীফ,' কিশোর বললো। 'মরে যাওয়ার আগেই

যিনি মরে গেছেন বলে খবর ছড়িয়েছেন।'

'বোরিনস?'

'হ্যাঁ, স্যার। ইনিই ডুবে মরেছেন বলে ভাবা হচ্ছিলো। বীমা কোম্পানিকে ঠকানোর জন্যেই একাজ করেছেন। পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার পরিকল্পনা করে এসে লুকিয়ে থেকেছেন এই দ্বীপে। তাঁকে তুলে নিয়ে আজ রাতেই দেশের বাইরে পাচার করে দিতো তাঁর জেলে বন্ধুরা। তাঁর বিধবা স্ত্রী তখন বীমার টাকাটা তুলে নিয়ে চলে যেতো স্বামীর কাছে। নিশ্চয় অনেক টাকার বীমা করিয়েছেন মিস্টার বোরিনস।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বললেন বোরিনস। বোধহয় গালই দিলেন। বোঝা গেল না। বোঝার চেষ্টাও করলো না কিশোর। বলতে থাকলো, 'তাঁর কপাল খারাপ, ঠিক তখনই সেলিব্রেট করবার সময় এসে গেল র‍্যাগনারসনদের। দলবল নিয়ে দ্বীপে হাজির হলো তারা। এতো লোকের সামনে জাহাজে চড়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না তিনি। কাল রাতে ভয় পেয়ে র‍্যাগনারসনরা যখন বেশির ভাগই চলে গিয়েছিলেন, আর ঘন কুয়াশা পড়েছিলো, তখন একবার পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, কুয়াশার মধ্যে কেউ খেয়াল করবে না। সব মাটি করেছি আমরা।'

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি এসব, শয়তান ছেলে কোথাকার!' আর সহ্য করতে পারলেন না বোরিনস, চেঁচিয়ে উঠলেন। 'দুর্ঘটনায় পড়ে স্মৃতি হারিয়েছিলাম আমি। একটু আগে ফিরে পেয়েছি।'

হেসে উঠলো কিশোর। 'বেবি ক্লাসের ছেলেরাও এর চেয়ে ভালো গল্প শোনাতে পারে, মিস্টার বোরিনস।'

ভ্রূকুটি করলেন গাড়ির ব্যবসায়ী।

'অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে, মিস্টার বোরিনস,' কঠোর পুলিশী কণ্ঠে বললেন চীফ। 'থানায় যেতে হবে।'

'প্ল্যানটা তিনি ভালোই করেছিলেন,' কিশোর বললো। 'র‍্যাগনারসনরা দ্বীপে না এলে সফল হয়ে যেতেন।'

'আর তিন গোয়েন্দা নাক না গলালে!' মুচকি হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার।

পঁচিশ

'কখন সন্দেহ করলে,' জিজ্ঞেস করলেন হলিউডের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, 'ডেনমার বোরিনস যে মরেনি?'

এক হপ্তা পর কেসের রিপোর্ট নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

'যখন মিসেস বোরিনসের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম,' জবাব দিলো কিশোর। 'এবং যখন ডনকে দেখার কথা অস্বীকার করলেন মহিলা। তার আগেই

অবশ্য ভাবতে শুরু করেছি, ডন ছাড়াও আরও কেউ আমাদের তোলা ছবিগুলো চায়। কারণ, মিস্টার মিলফোর্ডকে যখন আক্রমণ করলো দু'জন মুখোশধারী চোর, তখন ডনের জানারই কথা নয় যে পত্রিকায় ছবিগুলো ছাপা হয়েছে।

'ভাবলাম, ছবিতে গুপ্তধনের কোনো চিহ্ন হয়তো ফুটেছে, তাই ছবিগুলো নিয়ে যেতে চায় ডন। কাজেই রবিন আর মুসা ভেজা কাপড় বদলাতে বেরিয়ে যাওয়ার পর আরেকবার ভালোমতো দেখলাম ওগুলো।' একটা খাম থেকে চারটে ছবি বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে মিস্টার ক্রিস্টোফারের দিকে ঠেলে দিলো কিশোর। 'ভালোমতো দেখলে আপনিও দেখতে পাবেন, বড় টিলাটার গোড়া থেকে একটা মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে। লড়াইয়ের জন্যে তখন মার্চ করে চলেছে র‍্যাগনারসনরা।'

প্রথমে খালি চোখে দেখলেন পরিচালক। তারপর একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করলেন আরও ভালোমতো দেখার জন্যে। 'হুঁ, খুব ভালো করে না দেখলে চোখেই পড়বে না। একটা ঝোপের কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।'

'ঠিক,' কিশোর বললো। 'তখনই মনে হলো আমার, মিস্টার বোরিনস বেঁচে নেই তো? হয়তো লুকিয়ে রয়েছেন রেকার'স রকে। হতে পারে, রবিনকে ছবি তুলতে দেখেছেন তিনি। ভয় পেয়ে গেলেন, বীমা কোম্পানির লোকেরা এই ছবি দেখে ফেললে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'এই বীমার ব্যাপারটা এখনও কিছু বুঝতে পারছি না আমি।'

'কেন পারছো না? সহজ ব্যাপার। লাইফ ইনশিওরেন্স কি জানো না নাকি? আশ্চর্য!' রবিন বললো। 'ধরো পরিবারের কেউ একজন একটা বীমা করালো। কাউকে নমিনি করে যাবে। তার পর থেকে মাসে মাসে অল্প অল্প করে টাকা জমা দিতে থাকবে কোম্পানিতে। প্রিমিয়াম। যদি সেই লোকটি অসময়ে মারা যায়, যার নামে নমিনি, তাকে তখন বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য থাকবে কোম্পানি। প্রিমিয়ামে যা জমা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। যতো টাকার বীমা করানো হয়েছিলো ততো টাকা।'

'আচ্ছা, বুঝলাম।'

'পাঁচ লক্ষ ডলারের বীমা করিয়েছিলেন মিস্টার বোরিনস।'

'খাইছে! এ তো জুয়া খেলা! মরাবাঁচার ওপর হারজিত নির্ভর করে!'

'বলাটা একটু অন্য রকম হয়ে গেছে বটে,' পরিচালক বললেন, 'তবে ঠিকই বলেছো তুমি। দুই পক্ষই জুয়া খেলে। বীমা কোম্পানি চায় মক্কেল তাড়াতাড়ি না মরুক। আর মক্কেল অবচেতন ভাবে চায় সে এমন সময় মরুক যখন তার পরিবার টাকাটা পেয়ে যেতে পারে। তবে পরিবারের জন্যে টাকাটা চায়নি বোরিনস, নিজের জন্যেই চেয়েছে। নিজে জীবিত থেকে ভোগ করতে চেয়েছে টাকাটা। টাকার কষ্টে পড়েছিলো বোধহয়?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো কিশোর। 'বেশি খরুচে স্বভাবের, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। গত কয়েক বছর ধরে গাড়ি বিক্রি কমে গেছে, ব্যবসার অবস্থা খারাপ। এই

অবস্থায় আর কোনো উপায় না দেখে বীমা কোম্পানিকে ফাঁকি দেয়ার প্ল্যান করেছিলেন ওঁরা। একটা দুর্ঘটনা সাজিয়েছেন। বোটে, হ্যাটে রক্ত লাগিয়ে রেখেছিলেন। ছেঁড়া জ্যাকেটে রক্ত মাখিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন পানিতে। তারপর গিয়ে রকে উঠেছিলেন বোরিনস। রাত পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতেন। তখন হ্যাংম্যানরা এসে ট্রলারে তাঁকে তুলে নিয়ে চলে যেতো।'

'কিন্তু র‍্যাগনারসনদের সেলিব্রেশন আর রবিনের তোলা ছবি সর্বনাশ করে দিলো তাঁর,' মুসা বললো হেসে।

'রবিন যে ছবি তুলছে এটা দেখতে পেয়েছেন বোরিনস,' কিশোর বললো। 'তখন হ্যাংম্যানদেরকে রেডিওতে বলেছেন ছবিগুলো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার জন্যে। আরও বলেছেন, র‍্যাগনারসনরা রকে থাকতে তিনি বেরোতে পারবেন না দ্বীপ থেকে। ওখানে থাকার উদ্দেশ্যে নামেননি তিনি, তাই সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর খাবার রাখেননি। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁবু থেকে কাপড় আর খাবার চুরি করেছেন, বাঁচার তাগিদে।'

'হ্যাংম্যানরা তুলে নিতে এতো দেরি করলো কেন তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'প্রথম দু'রাত আকাশ পরিষ্কার ছিলো,' জবাবটা দিলো মুসা। 'দ্বীপ তখন জমজমাট। ওই সময়ে এসে র‍্যাগনারসনদের চোখে পড়তে চায়নি কেউই।'

'কিন্তু তৃতীয় রাতে,' মুসার কথার খেই ধরলো রবিন, 'বেশ কুয়াশা পড়েছিলো। তাছাড়া ভয় দেখিয়ে ডন বেশির ভাগ সেলিব্রেটরকেই বিদেয় করেছে ততোক্ষণে। ঝুঁকিটা নেবেন ঠিক করলেন বোরিনস। রেডিওতে খবর পাঠালেন হ্যাংম্যানদের। ওরা এলে টর্চ জ্বেলে সংকেত দিলেন যে তিনি হাজির। কিন্তু তাঁর কপাল খারাপ। আমরা তাঁকে দেখে ফেলেছি। ডনও।'

'হ্যাঁ, এবার ডনের কথা বলো,' পরিচালক বললেন। 'রহস্যের দ্বিতীয় ভাগ। সে-ও কি বীমা জালিয়াতিতে জড়িত?'

'না,' কিশোর বললো। 'অন্তত সরাসরি ভাবে নয়। সোনার সন্ধান সে সত্যিই পেয়েছে। সেটার ভাগ দিতে চায়নি কাউকে। নিরাপদে যাতে একলাই তুলে নিয়ে যেতে পারে সে-জন্যে ভয় দেখিয়ে সবাইকে তাড়াতে চেয়েছে। তাই ভূত সেজে আর নেকড়ের ডাক টেপ করে এনে শুনিয়ে আতংক সৃষ্টি করেছে। ওসব করতে গিয়েই বোরিনসকে টিলার কাছে দেখে ফেলে সে। ওর সাথে কথা বলে। ব্ল্যাক-মেইলের চিন্তা ঢোকে মাথায়। ভালো টাকা পাওয়া যাবে, বুঝতে পারে। তাই আমি যাওয়ার আগেই গিয়ে মিসেস বোরিনসের সাথে দেখা করে। রাজি না হয়ে উপায় ছিলো না মহিলার। তখন হ্যাংম্যানদের সাথে কাজ শুরু করে ডন। তাদেরকে সাহায্য করে যাতে নিরাপদে বোরিনসকে রক থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে ওরা। সে-জন্যেই র‍্যাগনারসনদের সমস্ত বোট অচল করে দেয় সে। তারপর চলে যায় রেকার'স রকে।'

'ছেলেটা অতিরিক্ত লোভী,' মন্তব্য করলেন পরিচালক। 'এসব মানুষের কখনও ভালো হয় না। আর একের পর এক বিপদে পড়ে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার,' মাথা দোলালো মুসা। 'ডনের বেলায়ও তাই হয়েছে। কায়দা করে তার কাছ থেকে সাহায্যটা ঠিকই আদায় করেছে বোরিনস। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো ট্রলারে। ওর ভাগ্য ভালো, কিশোর বুঝে ফেলেছিলো। নইলে হাঙরের পেটে হজম হয়ে যেতো এতদিনে। শিওর, তাকে পানিতে ফেলে দিতো হ্যাংম্যানরা।'

'তোমাদেরকে দেখে খুশিটা হয়েছে সে-জন্যেই,' পরিচালক বললেন। 'তা ছন্নছাড়া স্বর্ণ-সন্ধানী এখন কোথায়?'

হাসলো কিশোর। 'বাড়িতে। বোরিনসকে সাহায্য করার অপরাধে বিচারক তাকে বাড়িতে থাকার আদেশ দিয়েছেন। অনেকটা গৃহবন্দির মতো। বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। রেকার'স রকে যেতে পারবে না।'

'সব র‍্যাগনারসনরা এখন দ্বীপে চলে গেছে,' হেসে যোগ করলো মুসা। 'সারা দিন ধরে শুধু মাটি খুঁড়ে চলেছে। মোহর খুঁজছে সবাই। হাহ্ হাহ্! ডন যখন মুক্তি পাবে, যাবে ওখানে, সোনার একটা কণাও আর খুঁজে পাবে না।'

'তেমন কিছু নেইও,' রবিন বললো। 'শুধু কয়েকটা সোনার মুদ্রা, ব্যস।'

'তার মানে ক্যাপ্টেন কুল্টার আর তার খুনী নাবিকেরা সত্যিই দ্বীপটায় নেমেছিলো,' পরিচালক বললেন। 'দ্বীপে কিছু সোনা ফেলে গিয়েছিলো কোনো-ভাবে। ওদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর সোনাগুলো গায়েব হয়ে যাওয়া রেকার'স রকের একটা বড় রহস্য।'

মাথা ঝাঁকালো তিন গোয়েন্দা।

'বোরিনস আর হ্যাংম্যানদের কি শাস্তি হলো?'

'খবরের কাগজে দেখেননি? ও।' কিশোর বললো, 'নানা রকম অভিযোগ আনা হয়েছে ওদের বিরুদ্ধে। জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, আক্রমণ, কিডন্যাপিং। বেশ কিছু দিন উকিল নিয়ে আদালতে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে ওদেরকে।'

'শেষ পর্যন্ত আরেকবার সত্যের জয় হলো।' মৃদু হাসি ফুটলো পরিচালকের ঠোঁটে। 'তা এতো কিছু যে করলে, তোমাদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করলেন প্রিনসিপাল ডেভিড র‍্যাগনারসন? নিশ্চয় খুব বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছো। তোমাদের যা স্বভাব…'

গালে লাল আভা ফুটলো কিশোরের। 'হ্যাঁ, স্যার, ঠিকই বলেছেন। আমাদের কাজে খুব খুশি হয়েছেন মিস্টার ডেভিড। ডাক্তার সাহেবের মন থেকেও ভার নেমে গেছে। চমৎকার ভাবে চলেছে সেলিব্রেশন, কেউ বিরক্ত না করায়। ডনের কোনো ক্ষতি না হওয়ায় দু'জনেই খুশি।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'তবে একেবারে খালি হাতে আমাদের ছাড়েনি প্রিনসিপাল স্যার।' পাশের চেয়ারে রাখা ন্যাপস্যাকটার চেন খুললো কিশোর। সেদিকে তাকিয়ে হাসলো রবিন আর মুসা।

'এই যে,' বলে ব্যাগ থেকে বের করে আনলো একটা চামড়ার মুখোশ, যেটা রেকার'স রকে গিয়ে পরেছিলো কিশোর। ভারি জিনিসটা মুখে পরে প্রতিটি ক্ষণ

অস্বস্তিতে ভুগেছে সে। টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললো, 'আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন মিস্টার ডেভিড। কিছু যদি মনে না করেন, স্যার, আমরা আপনাকে উপহার দিলাম।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই,' আগ্রহের সঙ্গে টেনে নিলেন পরিচালক। 'ওরকম একটা জিনিসের শখ আমার অনেক দিনের। ছবি বানাতে কাজে লাগে। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত মিউজিয়মে···' মুখোশটা মুখে পরলেন তিনি। 'কেমন লাগছে?'

হাসলো কিশোর। সেটা সংক্রমিত হলো রবিন আর মুসার মাঝে। কিশোরের হাসি বাড়লো। অন্য দু'জন হাসতে হাসতে চেয়ারের ওপরেই গড়িয়ে পড়লো।

তাঁকে দেখতে কেমন লাগছে, আন্দাজ করতে পারছেন পরিচালক। মুখোশের আড়ালে তিনিও নিঃশব্দে হাসলেন। সেটা দেখতে পেলো না তিন গোয়েন্দা।

–ঃ শেষ ঃ–

জাদুচক্র

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯২

'এই, কি করছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো এলিনর হেস। নুবার প্রেসের মেইল রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

'আমরা?' মুসা জবাব দিলো, 'চিঠি বাছাই করছি।'

'বাজে কথা!' ধমকে উঠলো হেস। চেহারাটা ভালোই তার। তবে রেগে যাওয়ায় তেমন ভালো আর দেখাচ্ছে না। 'মেইল ক্লার্কের ভান করছো। কিন্তু আমি জানি, তোমরা গোয়েন্দা!'

নুবার প্রেসের তরুণ প্রকাশক হেস, কর্মচারীরা নাম রেখেছে উলফ, হাসতে শুরু করলো। রাগের ভান করেছে এতোক্ষণ। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ তোমরা, তাই না?'

'খাইছে! সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

রবিন হাসলো। 'এই গরমে গোয়েন্দাগিরি তেমন জমছে না। তাই অফিসের কাজ শিখতে এসেছি। চুপ করে বসে থাকার চেয়ে তো ভালো।'

'আমাদের পরিচয় জানলেন কি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়ায় কৌতূহল।

'কাল রাতে হলিউডে যাওয়ার জন্যে একটা লিমুজিন ভাড়া করেছিলো আমার চাচা হাইমার হেস,' এলিনর জানালো। 'সোনালি কাজ করা একটা রোলস রয়েস। শোফার একজন ইংরেজ, নাম হ্যানসন।'

'ও, এই কথা,' হাসলো কিশোর। 'তাহলে হ্যানসনই বলেছে আমাদের কথা।'

'হ্যাঁ, প্রচুর কথা বলে লোকটা। রেগুলার মক্কেলদের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। তোমাদের নাম বলে দিলো। আরও বললো, যেখানে যাও তোমরা সেখানেই নাকি রহস্য হাজির হয়।'

'হাজির হয় ঠিক বলা যাবে না,' মুসা বললো। 'খুঁচিয়ে বের করে কিশোর পাশা।'

'তখন আর তাকে সাহায্য না করে উপায় থাকে না আমাদের,' যোগ করলো রবিন।

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

'বাহ্, একেবারে প্রফেশনাল,' হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললো উলফ। 'ভালোই হলো। কখনও গোয়েন্দার দরকার পড়লে তোমাদের ডাকবো। আমার কাজ করে দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই। এটাই তো আমাদের হবি। যে কোনো রহস্যের সমাধান করতে রাজি আমরা। যতো জটিল হবে, ততো খুশি।'

'তাই? তাহলে এখুনি একটা রহস্য বোধহয় দিতে পারি। ধরো, অফিসের ফটোকপির মেশিনটা এতো আওয়াজ করে কেন...'

মেইল রুমের বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। পিছিয়ে গিয়ে হলে ঢুকে বাড়ির সামনের দিকে তাকালো উলফ। 'ও, চাচা। এতো দেরি করলে কেন?'

তার পাশে এসে দাঁড়ালেন লম্বা, পাতলা, ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ। ছোট গোঁফ। তিনিই মিস্টার হাইমার হেস। চেহারাটা যেমন মার্জিত, পরনের পোশাক আশাকও তেমনি। মেইল রুমে উঁকি দিয়ে গোয়েন্দাদের দেখলেন। ভাইপোর প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'গাড়িটা গ্যারেজে দিয়ে দিলাম, ভাবলাম, পাবো বুঝি আরেকটা। কিন্তু দিতে পারলো না, বাড়তি গাড়ি নাকি নেই। শেষে ট্যাক্সি ডেকে আসতে হয়েছে। এতো সময় লাগলো। বিরক্তিকর! আজকাল আর কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই!'

'ঠিকই বলেছো,' একমত হয়ে বললো তাঁর ভাইপো। 'চাচা, আজকেই তো পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসার কথা লেমিল ডিফ-এর। তার সাথে দেখা করতে চাও?'

'লেমিল ডিফ?' অবাক মনে হলো হেসকে। একই সাথে বিরক্ত।

'তাকে তুমি চেন, চাচা। থালিয়া ম্যাকাফির বিজনেস ম্যানেজার। মহিলার বই ছাপা নিয়ে সে-ই কথাবার্তা বলছে।'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শোফার।'

'হ্যাঁ, মহিলার গাড়িটা চালায় বটে,' কিছুটা অধৈর্য মনে হলো উলফকে। 'তবে সে থালিয়া ম্যাকাফির বিজনেস ম্যানেজার। আর যে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আসছে, সেটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করবে। মহিলা যখন অভিনেত্রী ছিলেন, তখনকার হলিউড স্টুডিওতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে মহিলা চেনেন না। তাঁর স্মৃতিকথা বই আকারে বেরোচ্ছে, একথা শুনলে পাগল হয়ে যাবে লোকে! কিনবেই!'

'সাড়া জাগাবে আমিও জানি। লোকের কাণ্ডকারখানাই মাথায় ঢোকে না আমার। একসময় না হয় অভিনেত্রী ছিলোই, তখনকার কথা আলাদা। এখন কেন তাকে নিয়ে এতো মাতামাতি? যাকগে। আমাদের ব্যবসা করা দরকার। তার বই ছেপে টাকা এলে ছাপতে কোনো দোষ দেখি না।'

'থালিয়াকে এতো ছোট করে দেখো না।'

'তো কিভাবে দেখবো? তিরিশ বছরের মধ্যে একটাও ছবি করেনি।'

'তাতে কি? কিংবদন্তী হয়ে আছেন তিনি।'

'তাতেই বা কি হলো?' প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা করলেন না তিনি। একটু পরেই সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ছেলেরা। দোতলায় উঠে যাচ্ছেন, তাঁর অফিসে। বেশ অসন্তুষ্ট মনে হলো উলফকে। চাচার সঙ্গে এধরনের আলোচনায় প্রায়ই বিরক্ত হতে হয় তাকে। তবে ভয় আর মান্যও করে বোঝা গেল।

'থালিয়া ম্যাকাফির সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

চোখ মিটমিট করলো উলফ। 'তাঁকে চেনো নাকি?'

'সিনেমা আর থিয়েটার নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি। তাঁর সম্পর্কে পড়েছি। সুন্দরী। ভালো অভিনেত্রী। তবে এখনকার দর্শকদের সেটা আর যাচাই করার উপায় নেই। কোনো হলে তাঁর ছবি চলে না। এমনকি টেলিভিশনেও না।'

'না, পরিচয় নেই,' উলফ জানালো। 'একা একা থাকতে ভালোবাসেন। কারো সঙ্গে দেখা করেন না। সব কাজই করেন লেমিল ডিফের মাধ্যমে। খুব ভালো ম্যানেজার লোকটা। শুরু করেছিলো শোফারের চাকরি দিয়ে। নিজের গুণে উঠে এসেছে এতো ওপরে। অবসর নেয়ার পর নিজের অভিনীত ছবিগুলোর নেগেটিভ প্রডিউসারদের কাছ থেকে কিনে নিজের বাড়িতে বিশেষ ভল্টে রেখে দিয়েছেন থালিয়া। মালিবুর কাছে তাঁর এস্টেট। ডিফ এই ইঙ্গিতও দিয়েছে, খুব তাড়াতাড়িই সেগুলো টেলিভিশন কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে তাঁর বই বেস্টসেলার হবেই হবে।'

ভালো যে হবে একথা ভেবে হাসি ফুটলো উলফের মুখে। মেইল রুম থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আওয়াজ শোনা গেল। হোঁচট খেলো একবার, সেটাও বোঝা গেল। মৃদু শিস দিতে দিতে দোতলায় উঠে গেল সে।

'চমৎকার লোক,' মুসা মন্তব্য করলো। 'তবে খুব অগোছালো। নিজেকেও সামলাতে পারে না। খালি আছাড় খায়।'

একথার জবাব দিলো না কেউ। গত তিন হপ্তা ধরে নুবার প্রেসের অফিসে কাজ করছে ওরা। জানে, প্রতিদিন সকালে সিঁড়িতে হোঁচট খায় উলফ। বিশাল চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল শরীর। কিন্তু দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটার সঙ্গে আরেকটার কিছু অমিল রয়েছে। যেমন, পিপের মতো ছাতির সঙ্গে পা দুটো বেমানান, কিছুটা খাটো। পায়ের পাতা আরও ছোট। নাকটা ভাঙা। ওরকমভাবে হোঁচট খেয়ে কোথাও পড়ে গিয়েই বোধহয় ভেঙেছে। চ্যাপ্টা হয়ে গেছে এখন ওটা, তোবড়ানো। বেশ ঘন চুল, খুব ছোট করে ছাঁটা। তারপরেও কিভাবে যেন এলোমেলো হয়ে যায়। কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করে কাপড় পরে, তবু কুঁচকে থাকে কোথাও কোথাও। সব কিছু মিলিয়ে চেহারাটা ভালো, আন্তরিক ব্যবহার, তাকে পছন্দ করে তিন গোয়েন্দা।

ঘরের একপাশে একটা লম্বা টেবিল। চিঠি বেছে বেছে তাতে সাজিয়ে রাখতে লাগলো ওরা। চিঠি বোঝাই বড় একটা ক্যানভাসের বস্তা খুলছে কিশোর, এই সময় সেখানে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন ধূসর চুলওয়ালা একজন মানুষ, কেমন যেন নির্জীব।

'গুড মরনিং, মিস্টার রাইট,' কিশোর বললো।

'মরনিং,' জবাব দিলেন মিস্টার রাইট। অফিস ম্যানেজার তিনি। পাশের একটা ছোট ঘরে চলে গেলেন। তাঁর ডেস্কে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার হেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে। এই ক'মিনিট আগে তাঁর অফিসে গেছেন।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন রাইট। হাইমার হেসকে পছন্দ করেন না তিনি। কর্মচারীদের কেউই করে বলে মনে হয় না। জোর করেই নাকি কোম্পানিতে ঢুকেছেন তিনি, সবাই বলে। নুবার প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উলফের বাবা। নৌ-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তিনি, ছেলের বয়েস তখন উনিশ। উইল অনুযায়ী প্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন হাইমার। উলফের বয়েস তিরিশ হওয়াতক প্রেসটা চালানোর দায়িত্ব তাঁর।

'মনে হয়,' একদিন তিন গোয়েন্দাকে বলেছিলেন রাইট, 'সম্পত্তি আর উলফকে বাঁচানোর জন্যেই এরকম উইল করে গেছেন মিস্টার হেস। ছেলেটা যেন কেমন! তার সম্পর্কে কিছুই ঠিক করে বলা যায় না। সবাই ভেবেছে, প্রকাশনা ব্যবসা তাকে দিয়ে কোনোদিন হবে না, অথচ ভালোই তো পারছে। কোন্ বই চলবে, কোন্টা চলবে না, ঠিক বুঝে ফেলে। ব্যবসা ভালো চালাতে পারবে। আর কিছু দিন, এই আসছে এপ্রিল পর্যন্ত মিস্টার হাইমারকে সহ্য করতে হবে আরকি আমাদের। তখন উলফের বয়েস তিরিশ হবে। কি জ্বালায় যে জ্বলছি! টাকার ব্যাপারটা পুরোপুরি তার কন্ট্রোলে। অফিসের জন্যে কিছু কিনতে হলে তাঁকে বলতে হয়, এমনকি একটা পেন্সিল কিনতে হলেও। এভাবে কাজ করা যায়?'

হাইমারের কথা বলতে গেলেই রেগে যান রাইট। এখনও তাই হয়েছেন। কিছু বললেন না। কাজ শুরু করলেন। মুসা যখন চিঠিগুলো অন্য অফিসে দিয়ে আসতে যাচ্ছে, তখনও দেখলো বিরক্ত হয়ে ফাইলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

নুবার অ্যাডাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নুবার প্রেস। একটা পুরনো ঐতিহাসিক দোতলা বিল্ডিং। দু'পাশে দুটো আধুনিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। জায়গাটা সান্তা মনিকার ব্যস্ততম এলাকা প্যাসিফিক অ্যাভিনিউতে। এই অ্যাডাবের সৃষ্টি হয়েছে সেই সময়ে, যখন ক্যালিফোর্নিয়া শাসন করতো মেকসিকোর গভর্নররা। দেয়ালগুলো পুরু, অ্যাডাবের যেমন থাকে। প্রচণ্ড গরমের দিনে বাইরে যখন আগুন জ্বলতে থাকে, ভীষণ কড়া রোদ, তখনও ভেতরে চমৎকার ঠাণ্ডা। নিচতলার সমস্ত জানালায় কারুকাজ করা লোহার গ্রিল লাগানো, বাড়িটাকে আকর্ষণীয় করেছে।

প্রথমে অ্যাকাউনটিং ডিপার্টমেন্টে ঢুকলো মুসা। বেশ বড় ঘর। মেইল রুম থেকে বেরিয়ে হল পেরিয়েই এই ঘরটা পড়ে। মাঝবয়েসী রুক্ষ স্বভাবের একজন মানুষ এই ডিপার্টমেন্টের প্রধান। অ্যাডিং মেশিনে একগাদা ইনভয়েস নিয়ে কাজ করছে দু'জন মহিলা। তাদের কাজ দেখছেন তিনি গম্ভীর মুখে।

'গুড মরনিং, মিস্টার ওয়ালটার,' বলে এক বাণ্ডিল খাম তাঁর টেবিলে রেখে দিলো মুসা।

ভুরু কোঁচকালেন ডেভিড ওয়ালটার। 'ওই বাক্সে রাখো, এখানে কি? মনে থাকে না? রোজ বলে দিতে হয় কেন?'

'ওয়ালটার,' পেছন থেকে বললেন মিস্টার রাইট, 'ওকে কিছু বলার দরকার হলে আমাকে বলবেন।' হলঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। 'ও আমার ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কিছু বোঝাতে হলে আমি বুঝিয়ে দেবো। আপনি

ধমকাবেন না!'

এসব পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে পড়ে যায় মুসা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। আসার আগে রাইটকে বিড়বিড় করতে শুনলো, 'ঝগড়া করার ওস্তাদ! একটা বছরও টিকবে না এখানে! ওষুধের কোম্পানিটা যে কি করে পাঁচ বছর সহ্য করেছে ওকে, ঈশ্বর জানে!'

অ্যাড়াবের সামনের দিকে আরেকটা বড় ঘরে রয়েছে রিসিপশনিস্টের ডেস্ক। সেখানে কয়েকটা চিঠি এনে রাখলো মুসা। তারপর সিঁড়ির দিকে চললো দোতলায় ওঠার জন্যে। সম্পাদক মণ্ডলী, বইয়ের ডিজাইনার আর প্রোডাকশনের লোকেদের অফিস ওখানে।

বিকেলের আগে একজন আরেকজনের সঙ্গে আর কথা বললেন না রাইট এবং ওয়ালটার। তারপর মেইল রুমের কোণে যে ফটোকপির মেশিনটা রয়েছে সেটা গেল বিকল হয়ে। এককথা দু'কথা থেকে বেধে গেল তুমুল ঝগড়া ওয়ালটার বলতে লাগলেন, মেশিনটা তক্ষুণি মেরামত করতে হবে। রাইট বললেন, আগামী সকালের আগে কিছুতেই আসতে পারবে না মিস্ত্রী।

বিকেল চারটের একটু আগে, তখনও কথা কাটাকাটি করেই চলেছেন দু'জনে, এই সময় কিশোর চললো দোতলায়, সমস্ত ডেস্ক থেকে চিঠি সংগ্রহ করে নেয়ার জন্যে, যেগুলো বাইরে পাঠাতে হবে। উলফের অ্যাসিসটেন্ট মিসেস সাইমন হাসলেন কিশোরের দিকে তাকিয়ে। গোলগাল মসৃণ মুখ তাঁর। কুমড়োর মতো মোটা শরীর। অনেক বছর হলো চাকরি করছেন এখানে। উলফের আগে তার বাবার অ্যাসিসটেন্ট ছিলেন। দুটো খাম বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে। তারপর তাকালেন সিঁড়ির দিকে, কাউকে আসতে দেখেছেন।

তারপর উলফের অফিসের খোলা দরজা দেখিয়ে মানুষটাকে বললেন, 'উনি বসে আছেন আপনার জন্যে।'

ঘুরে তাকালো কিশোর। পাতলা, কালো চুল একজন লোক এসেছে। পরনে হালকা রঙের গ্যাবার্ডিনের সুট। তার পাশ কাটিয়ে উলফের অফিসের দিকে চলে গেল।

'উনি মিস্টার লেমিন ডিফ,' মিসেস সাইমন বললেন নিচুস্বরে। 'থালিয়া ম্যাকাফির ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে এসেছেন বোধহয়।' শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'সারাটা জীবনই মহিলার ওখানে কাটিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। কেমন রোমান্টিক, না?'

এতে রোমান্টিকতার কি দেখলেন মহিলা, বুঝতে পারলো না কিশোর। সে মুখ খোলার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলো উলফ, হাতে একগাদা কাগজ। 'ও, কিশোর। তুমি আছো, ভালোই হয়েছে। এটা পাণ্ডুলিপি। যাও তো, চট করে গিয়ে কপি করে নিয়ে এসো তো। হাতে লেখা। বাড়তি কপি নেই। ডুপ্লিকেট করে রাখা উচিত। মিস্টার রাইট হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যাতে খোয়া না যায়।'

'মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে,' কিশোর জানালো। 'বাইরে কোনখান থেকে করে আনবো?'

দরজায় বেরিয়ে এলেন ডিফ। 'না। এখানে থাকাই নিরাপদ। বাইরে বের করা ঠিক হবে না।'

'ভাববেন না। যত্ন করেই রাখবো আমরা,' উলফ কথা দিলো তাঁকে।

মাথা ঝাঁকালেন ডিফ। 'গুড। ম্যানুস্ক্রিপ্ট তো পেলেন। দয়া করে চেকটা যদি দেন তো এখন যেতে পারি।'

'চেক?' প্রতিধ্বনি করলো যেন উলফ। 'অ্যাডভান্সের কথা বলছেন?'

'নিশ্চয়ই। কন্ট্রাক্ট হয়েছে, এটা দিলেই আপনি মিস ম্যাকাফিকে পঁচিশ হাজার ডলার অগ্রিম দেবেন।'

'মিস্টার ডিফ,' মুখ কালো করে ফেলেছে উলফ, 'পাণ্ডুলিপি পেলে আগে পড়ে দেখি আমরা। চেক তৈরিই হয়নি এখনও।'

'তাই নাকি? বেশ, যাই ডাকে পাঠিয়ে দেবেন চেকটা।' সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন লেমিল ডিফ।

'টাকার খুব দরকার বোধহয় লোকটার,' মিসেস সাইমন মন্তব্য করলেন।

'পাবলিশিঙের ব্যাপারে কিছু জানে না আর কি চুক্তিপত্রটাও মনে হয় ঠিকমতো পড়েনি। পরিষ্কার লেখা রয়েছে সবকিছু। পড়েনি বলেই ওভাবে টাকা চেয়েছে।'

অফিসে গিয়ে ঢুকলো উলফ। মেইল রুমে ফিরে এলো কিশোর।

'ওভারটাইম করতে পারবে?' রাইট জিজ্ঞেস করলেন। 'পাখির ওপরে লেখা বইটার সার্কুলার পাঠাতে হবে। রেডি হয়েছে এইমাত্র জানালো প্রিন্টার। খামে ভরে ঠিকানা লিখে ফেলতে হবে আমাদের। আমি নিজে পোস্ট অফিসে নিয়ে যেতে চাই ওগুলো।'

বাড়তি কাজ করতে আপত্তি নেই ছেলেদের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলো ফিরতে দেরি হবে। ছুটি হলে অন্যান্য কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল। তখন পুরোদমে কাজ চলছে তিন গোয়েন্দার। পৌনে ছ'টায় খামের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে উঠলেন রাইট। পোস্ট অফিসে যাবেন। বললেন, 'চিঠিগুলো পোস্ট করে ফেরার পথে কিছু ফ্রাইড চিকেন নিয়ে আসবো। মোড়ের দোকান থেকে।'

তিনি বেরিয়ে গেলে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো ছেলেরা। মেইল রুমের খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে যেন ঢুকে পড়লো একঝলক দমকা হাওয়া। দড়াম করে লাগিয়ে দিলো একটা দরজা। আবার কাজ করতে বসেছিলো ওরা, প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো।

সোয়া ছ'টায় কাজ থামিয়ে নাক কুঁচকে ফেললো রবিন। 'উঁহু, ধোঁয়ার গন্ধ মনে হয়?'

বন্ধ দরজার দিকে তাকালো মুসা। প্যাসিফিক অ্যাভিনিউতে যানবাহনের গুঞ্জন কানে আসছে। সেসব ছাপিয়ে কানে এলো আরেকটা চাপা শব্দ; অ্যাডাবের পুরো দেয়ালের জন্যে আওয়াজটা স্পষ্ট হতে পারছে না।

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত রাখলো খোলার জন্যে। গরম লাগলো কাঠ। নবে হাত দিয়ে দেখলো আরও গরম। সাবধানে আস্তে করে

দরজাটা খুললো সে।

কানে এসে যেন ধাক্কা মারলো ভারি গর্জন। গলগল করে এসে ঘরে ঢুকতে লাগলো ঘন ধোঁয়া।

'খাইছে!' চিৎকার করে বললো মুসা।

একধাক্কায় আবার পাল্লাটা লাগিয়ে দিলো কিশোর। ফিরে তাকিয়ে জানালো, 'আগুন! হলঘরে আগুন লেগেছে!'

দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে এখন ধোঁয়া চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে খোলা জানালার দিকে। জানালার বাইরে অ্যাডাব আর পরের বাড়িটার মাঝে সরু একটা পথ, হেঁটে যাওয়া যায়। তবে লোহার গ্রিল আটকে দিয়েছে ওদেরকে ঘরের মধ্যে জানালার কাছে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলো সে, 'আগুন! আগুন!'

কেউ জবাব দিলো না। ঠেলে দেখলো গ্রিলগুলো, নড়লোও না।

একটা ধাতব চেয়ার নিয়ে গিয়ে গ্রিলের ওপর ঠেসে ধরে ঠেলতে শুরু করলো রবিন আর মুসা। একটা পা বাঁকা হয়ে ভেঙে গেল ওটার, গ্রিলের কিছু হলো না

'লাভ নেই,' মিস্টার রাইটের অফিসে চলে গেছে কিশোর, সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'টেলিফোনটাও ডেড!' মানুষজনও কেউ নেই যে আমাদের চিৎকার শুনবে!'

দ্রুত আবার এসে দাঁড়ালো হলে ঢোকার দরজার কাছে। 'বেরোতে হবে আমাদের। আর এটাই একমাত্র পথ।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। আরেকবার খুললো দরজাটা। খোলা পেয়েই ভলকে ভলকে এসে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করলো। কেশে উঠলো রবিন। মুসার চোখ দিয়ে পানি গড়াতে শুরু করলো। দু'জনেই এসে বসেছে কিশোরের পাশে, হলের ভেতরে তাকিয়ে রয়েছে। ধোঁয়া তো নয়, যেন কঠিন কালচে-ধূসর কোনো পদার্থ দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে ঘর। আগুনের শিখা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে দেয়াল থেকে সিঁড়ির দিকে।

মুহূর্তের জন্যে আগুনের দিক থেকে মুখ ফেরালো কিশোর। শ্বাস নিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো একবার নিজের অজান্তেই। দম বন্ধ করে ফেলে আবার তাকালো আগুনের দিকে। দরজা দিয়ে বেরোবে কিনা ভাবছে, এই সময় একঝলক গরম বাতাস এসে লাগলো গায়ে, যেন জড়িয়ে ধরলো উত্তপ্ত একটা দানবীয় থাবা। নাকমুখ কুঁচকে ফেলে ঝটকা দিয়ে দরজার কাছে সরে এলো সে।

'পারবো না,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'এই আগুনের ভেতর দিয়ে বেরোনো যাবে না! আর কোনো পথ নেই! আটকাই পড়লাম আমরা!'

দুই

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলো তিনজনেই। তারপর ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে মুসা বললো, 'কারো না কারো চোখে পড়বেই ধোঁয়া! দমকলকে খবর দেবে!' শ্বাস নিতে গিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোলো গলার ভেতর থেকে।

পাগলের মতো চারপাশে চোখ বোলালো কিশোর। জিনিসটা এই প্রথম চোখে পড়লো তার, যেটা একটা উপায় করে দিতেও পারে। যে লম্বা টেবিলটায় চিঠি বাছাইয়ের কাজ করে ওরা, সেটার নিচে একটা ট্র্যাপডোর।

হাত তুললো সে। 'দেখ! নিশ্চয় সেলার-টেলার রয়েছে! আর বাতাসও ওখানে ভালো হবে, এখানকার চেয়ে।'

ছুটলো ওরা। টেবিল সরিয়ে টেনে ঢাকনা তুললো মুসা। নিচে তাকালো। পাতালঘর আছে নিচে। ইঁটের দেয়াল। প্রায় আট ফুট নিচে কাঁচা মেঝে। বাতাস ভেজা ভেজা, পুরনো গন্ধ। দ্বিধা করলো না ওরা। যতোই খারাপ হোক, এখানকার চেয়ে অন্তত ভালো। ফোকরের দুই কার্নিস ধরে দোল দিয়ে নিচে নেমে গেল মুসা। তার পরে নামলো অন্য দু'জন। নিরাপদে নেমে মুসার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঢাকনাটা আবার নামিয়ে দিলো রবিন।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো ওরা। আগুনের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখান থেকেও। ওরা নিরাপদ ঠিকই, তবে কতোক্ষণের জন্যে? কল্পনায় দেখছে কিশোর, ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সব কিছু পোড়াতে পোড়াতে উঠে যাচ্ছে ছাতের দিকে। যদি ধসে পড়ে ছাত? জ্বলন্ত ভারি কড়িকাঠগুলো খসে পড়বে যখন, সামলাতে পারবে ওপরের মেঝেটা? নাকি ভেঙে যাবে? আর যদি না-ও ভাঙে, কেউ কি বুঝবে ওরা রয়েছে এখানে? মুক্ত করতে আসবে?

'এই,' কিশোরের হাত খামচে ধরলো মুসা, 'শুনছো?'

দূরে সাইরেন শোনা যাচ্ছে।

'আসছে!' রবিন বললো।

'জলদি করো, ভাই, তাড়াতাড়ি এসো!' দমকলের লোকদের উদ্দেশ্যে বললো মুসা। 'সময় বেশি নেই!'

এগিয়ে আসছে সাইরেন। আরও সাইরেনের শব্দ যোগ হলো প্রথমটার সাথে। তারপর কাছে এসে এক এক করে চুপ হয়ে যেতে লাগলো।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচাতে লাগলো মুসা। 'এই যে, আমরা এখানে!'

অপেক্ষা করে রইলো তিনজনে। মনে হলো পুরো একটা যুগ পরে ওপরে মচমচ আর ধুড়ুম-ধাড়ুম আওয়াজ শুনতে পেলো।

'নিশ্চয় জানালা খুলছে,' রবিন বললো। 'টেনে ছাড়িয়ে নিচ্ছে গ্রিলগুলো।'

ওদের ওপরে পানি ছিটানোর আওয়াজ হচ্ছে। মুখে পানি পড়লো কিশোরের। তার পর পরই হাতে আর কাঁধে। ময়লা পানি এসে কয়েক ধারায় পড়তে লাগলো তার ওপর।

'আরে ডুবে মরবো তো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'এই থামুন, থামুন, মেরে ফেলবেন তো!'

পানির শব্দ থেমে গেল।

ট্র্যাপডোরটা খুলুন!' চিৎকার করে বললো রবিন।

বেশ কিছু থ্যাপথুপ দুপদাপ আওয়াজের পর খুলে গেল ঢাকনা। দেখা গেল একজন ফায়ারম্যানের মুখ। নিচে তাকিয়ে রয়েছে।

'এই যে এখানে!' বলে উঠলো সে। 'অ্যাইই, পেয়েছি, পেয়েছি ছেলে-গুলোকে!'

লাফিয়ে সেলারে নামলো লোকটা। মুহূর্ত পরেই রবিনকে তুলে ধরলো ওপর দিকে। ওপর থেকে তার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরে টেনে তুলে নিলো আরেকজন ফায়ারম্যান। তারপর ধরে ধরে নিয়ে চললো জানালার দিকে। লোহার গ্রিল নেই। দুটো হোস পাইপ মরা সাপের মতো নেতিয়ে রয়েছে মেইল রুমের মেঝেতে। হাচড়ে-পাচড়ে কোনোমতে জানালার চৌকাঠে উঠে ওপাশের সরু রাস্তায় নামলো রবিন।

কয়েক পা এগোনোর পরই কানে এলো কিশোরের কণ্ঠ। আরেকটু পড়ে মুসার। যে লোকটা ওদেরকে টেনে তুলেছে সে এলো পেছন পেছন। 'দৌড় দাও!' বলে উঠলো সে। 'জলদি! ছাত ধসে পড়বে!'

দৌড় দিলো ছেলেরা। বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসার আগে আর থামলো না। রাস্তার মুখ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দমকলের গাড়ি। কয়েকটা হোস পাইপ চলে গেছে পথের ওপর দিয়ে, এখন নেতিয়ে রয়েছে, পানি ছিটানো বন্ধ রাখায়।

'আল্লাহ। বেঁচে আছো তোমরা! গুড!' মিস্টার রাইট বললেন। হাতে একটা কাগজের ব্যাগ, তাতে ফ্রাইড চিকেন।

'এই, সরুন, সরুন!' হুঁশিয়ার করলো একজন ফায়ারম্যান।

রাস্তায় জনতার ভিড়। সেদিকে সরে গেলেন রাইট। তাঁর সঙ্গে গেল ছেলেরা। 'ওরা আমাকে ঢুকতে দেয়নি,' কৈফিয়তের সুরে ছেলেদেরকে জানালেন তিনি। 'তোমরা ভেতরে রয়েছো বলেছি ওদেরকে। তার পরেও দিলো না।' এখনও বিমূঢ় ভাবটা যেন পুরোপুরি কাটেনি তাঁর।

'হয়েছে, মিস্টার রাইট,' কিশোর বললো, 'আর ভাবতে হবে না। আমরা ভালোই আছি।' বুড়ো মানুষটার হাত থেকে খাবারের ব্যাগটা নিয়ে সামনের একটা শপিং সেন্টারের নিচু দেয়ালে তাঁকে বসতে সাহায্য করলো।

'মিস্টার রাইট! মিস্টার রাইট!'

ডাক শুনে চারজনেই তাকিয়ে দেখলো ছুটে আসছেন মিস্টার ওয়ালটার। ভিড় সরিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। 'কি হয়েছে, মিস্টার রাইট? ধোঁয়া দেখলাম। কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছিলাম। দেখি ধোঁয়া। লাগলো কি করে?'

মিস্টার রাইট জবাব দেয়ার আগেই পথের মোড় ঘুরে ছুটে আসতে দেখা গেল উলফকে। পেছনে আসছেন হাইমার হেস। তাঁর পেছনে মিসেস সাইমন।

'মিস্টার রাইট!' চিৎকার করে বললো উলফ, 'আপনি ঠিক আছেন? এই ছেলেরা, তোমরা ভালো?'

'ভালো,' মুসা বললো।

রাইটের পাশে এসে বসে পড়লো উলফ।

'খবর দিতাম আপনাকে,' রাইট বললেন। 'কিন্তু ছেলেগুলোর জন্যে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'ধোঁয়া দেখে ছুটে এসেছি,' উলফ জানালো। 'বাসায়ই ছিলাম।'

চিৎকার করে উঠলো জনতা। অ্যাডাবের কাছ থেকে হুড়াহুড়ি করে সরে চলে এলো ফায়ারম্যানেরা। বিকট শব্দ করে ধসে পড়লো বাড়িটার ছাত।

লাফ দিয়ে যেন আকাশে উঠে গেল আগুনের শিখা। পুরনো বিল্ডিংটার পুরু দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও, কিন্তু সেদিকে নজর দিলো না ফায়ার-ম্যানেরা। ছাতটা যেখানে ধসে পড়েছে সেখানে আর রাস্তার দিকে বেরিয়ে আসা আগুনের ওপর পানি ছিটাচ্ছে।

মিসেস সাইমনের দিকে তাকালো কিশোর। মহিলা কাঁদছেন।

'থাক, কাঁদবেন না,' অনুরোধ করলো উলফ। 'প্লীজ, মিসেস সাইমন। বাড়িই তো গেছে একটা, আর তো কিছু না।'

'তোমার বাবার এতো সাধের পাবলিশিং হাউস!' ফোঁপাতে শুরু করলেন মিসেস সাইমন। 'কি যে ভালোবাসতেন তিনি!'

'জানি। বিল্ডিং গেছে গেছে। মানুষজনের যে···'

থেমে গেল তরুণ প্রকাশক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ছেলেদের দিকে।

'সব শেষে বেরিয়েছি আমরা,' রবিন বললো। 'তিনজনেই ভালো আছি। জখম-টখম হয়নি।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটালো উলফ। মিসেস সাইমনের দিকে ফিরে বললো, 'এটাই হলো আসল কথা। কেউ আহত হয়নি। আর নুবার প্রেসেরও পথে বসার অবস্থা হয়নি। ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। তবে কাটিয়ে ওঠা যাবে। বইয়ের মালমশলা সব ওয়্যারহাউসে যত্ন করে রাখা আছে। নষ্ট হবে না। এমনকি মিস ম্যাকাফির পাণ্ডুলিপিটাও নিরাপদেই আছে।'

'আছে?' মিসেস সাইমনের প্রশ্ন।

'আছে। ব্রিফকেসে ভরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছি। তারমানে বুঝতেই পারছেন, খুব একটা ক্ষতি···'

আরেকবার কথার মাঝখানে থেমে যেতে হলো উলফকে। ক্যামেরা নিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে একজন মানুষ।

'ও, এসে গেছে,' উলফ বললো। 'কি করে যে খবর পায় এরা! টেলিভিশন। ভালোই, স্টোরিটা কভার করুক। একটা ফোন করতে হবে।'

'কাকে?' জানতে চাইলেন মিস্টার হেস।

'লেমিল ডিফকে। তাকে জানাতে হবে পাণ্ডুলিপি ঠিক আছে। খবর পাবেই। জানবে নুবার প্রেস জ্বলে গেছে। আগে থেকেই জানিয়ে না রাখলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে।'

কোণের পেট্রোল পাম্পটার দিকে রওনা হলো উলফ। ঠিক ওই সময় একটা লোকের ওপর চোখ পড়লো কিশোরের। রাস্তা পেরোচ্ছে লোকটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। মাথার একটা কাটা থেকে রক্ত পড়ছে।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা।

গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে লোকটার শার্টের সামনেটা ভিজে গেছে।

'ব্যাপারটা কি?' হাইমার বললেন।

পা বাড়ালো কিশোর। এই সময় পথের ওপরই লুটিয়ে পড়লো লোকটা। ছুটে গেল একজন ফায়ারম্যান। তাকে সাহায্য করতে গেল দু'জন পুলিশ। চিত করে শোয়ালো তাকে। দ্রুত পরীক্ষা করলো কপালের কাটাটা।

'দেখি তো দেখি, মনে হয় চিনি!' বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো একজন মোটা মহিলা। পুলিশকে বললো, 'ওকে চিনি। ওই যে ওখানে কাজ করে। ফিল্মের কাজকর্ম হয়।' গ্রীন পিকচার ল্যাবরেটরিটা দেখালো সে। নুবার প্রেসের পাশে লাল ইঁটের একটা বাড়ি। 'বহুবার তাকে ওখানে ঢুকতে বেরোতে দেখেছি।'

উঠে দাঁড়ালো একজন পুলিশ। 'অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে,' সঙ্গীকে বললো সে। 'তারপর যাবো ফিল্ম ল্যাবে। খোঁজখবর নেয়া দরকার। ও এখন কিছু বলতে পারবে বলে মনে হয় না। হুঁশ ফিরতে কতোক্ষণ লাগে কে জানে।'

তিন

টেলিভিশনের লেট নাইট নিউজে সংক্ষিপ্ত ভাবে জানানো হলো নুবার প্রেসে আগুন লাগার কথা। চাচা-চাচীর পাশে বসে খবরটা শুনলো কিশোর। পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো 'লস অ্যাঞ্জেলেস নাউ' শোতে আগুন লাগার সচিত্র প্রতিবেদন দেখার জন্যে।

'আবার কি দেখছিস?' রেগে গেলেন মেরিচাচী। রান্নাঘরের কাউন্টারে রাখা পোর্টেবল টিভিটা দেখছে কিশোর। 'একবার যে মরতে মরতে বেঁচে এসেছিস, আক্কেল হয়নি? এতো আগ্রহ কেন আর?'

চেয়ারে বসে পড়ে কমলার রসে চুমুক দিলো কিশোর। 'লোকটার খবর-টবর বলতে পারে।'

'রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলো যে লোকটা?' চাচীও বসে পড়লেন দেখার জন্যে।

আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলেন রাশেদ পাশা।

টেলিভিশনের পর্দায় সংবাদ পাঠক এডি কনসারের চেহারা বিষণ্ন, গম্ভীর। 'গতকাল সান্তা মনিকায় মস্ত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে,' বলছে সে। 'প্যাসিফিক অ্যাভিনিউতে ঐতিহাসিক নুবার অ্যাডাবে আগুন লেগেছিলো বিকেল ছ'টার দিকে। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে, নুবার প্রেসের তিনজন জুনিয়র মেইল ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ ছিলো না ভেতরে। আগুনে আটকা পড়ে ওরা। তবে ফায়ারম্যানরা তাদের উদ্ধার করে। ওদের কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।'

পর্দা থেকে সরে গেল কনসারের মুখ। তার জায়গায় দেখা গেল নুবার প্রেসের ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপ। আড়াল থেকে তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'অ্যাডাব বিল্ডিংটা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। টাকার ক্ষতি আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।'

'আগুন লেগে বাড়িটা যখন পুড়ছে, তখন একটা ডাকাতি হচ্ছিলো পাশের বাড়িটায়, গ্রীন পিকচার ল্যাবরেটরিতে, পুলিশ পরে জানতে পেরেছে সেটা। বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে ঢুকেছিলো ডাকাতেরা। পুরনো ফিল্ম সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ওই ল্যাবরেটরি। তিরিশ বছর আগে থালিয়া ম্যাকাফির

অভিনীত ছবির একশোর বেশি রিল নিয়ে কাজ করেছে ওরা। একসময় বেশ উঁচু দরের অভিনেত্রী ছিলেন মিস ম্যাকাফি। তাঁর অভিনীত অনেকগুলো ছবির নেগেটিভ বিক্রি করেছেন হারভে ভিডিওর কাছে। ওই কোম্পানিই আমাদের এই টিভি স্টেশন কে এল এম সি-র মালিক।'

আবার পর্দায় দেখা গেল কনসারকে। 'ডাকাতির একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া গেছে বলে পুলিশের ধারণা। ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানের কাজ করে সে, নাম নীল ও'ম্যান। ডাকাতেরা লোকটাকে পিটিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কোনোমতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলো লোকটা, ওখানে এসে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। আজ সকালে সান্তা মনিকা হাসপাতালে তার হুঁশ ফিরেছে। ডিটেকটিভদের কাছে সে বিবৃতি দেবে বলে আশা করছে পুলিশ।'

সামনের বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। কলিং বেল বাজলো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো কিশোর। রবিন আর মুসা ঢুকলো।

'খবর দেখছো?' মুসা বললো। 'ভোরেরটা দেখেছি আমি। সান্তা মনিকা ল্যাব থেকে অনেকগুলো সিনেমার রিল চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'আর ছবিগুলো কার জানো?' যোগ করলো রবিন, 'খালিয়া ম্যাকাফির। যোগাযোগটা কেমন লাগছে? কাকতালীয় না?'

'বেশি কাকতালীয়,' ঘোষণা করলো কিশোর।

তার পিছু পিছু রান্নাঘরে চলে এলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। টেলিভিশনে তখন মিস ম্যাকাফির কেসের লেটেস্ট নিউজ দিচ্ছে কনসার, 'আজ সকালে হারভে ভিডিওর প্রেসিডেন্ট মিস্টার হগ জালমোরের কাছে একটা টেলিফোন আসে। তাঁকে বলা হয়, পঁচিশ লাখ ডলার নগদ দিলে ফিল্মগুলো আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে। ছবিগুলো খুব দামী, কোনো সন্দেহ নেই। এখনও হ্যাঁ-না কিছু বলেননি মিস্টার জালমোর।'

'আশ্চর্য!' মুসা বললো। পুরনো ফিল্ম চুরি করে নিয়ে গিয়ে এখন টাকা দাবি করছে!'

বলে চলেছে কনসার, 'কাল বিকেলে সান্তা মনিকা ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি, ক্রাইম রিপোর্টার হেনরি ফগ। দেখা করেছেন লেমিল ডিফের সঙ্গে। বহু বছর ধরে মিস ম্যাকাফির বিজনেস ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন মিস্টার ডিফ। টেপ করে আনা সেই সাক্ষাৎকার দেখুন এখন।'

বাঁয়ে টেলিভিশন মনিটরের দিকে তাকালো কনসার। পর্দায় দেখা গেল আরেকজন লোককে। রোদে পোড়া মুখ। শাদা চুলের বোঝা মাথায়। হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছে। পেছনের ম্যানটেলে রাখা একটা ঘড়িতে সময় দেখা যাচ্ছে সাড়ে নয়টা।

'গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান,' লোকটা বললো, 'আমি হেনরি ফগ বলছি, কে এল এম সির ক্রাইম রিপোর্টার, মালিবুর কাছে ম্যাকাফি এস্টেট থেকে।

'আজ বিকেলে গ্রীন পিকচার ল্যাবরেটরি থেকে কতগুলো ফিল্ম ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে-সম্পর্কেই এখন কথা বলবো মিস ম্যাকাফির অনেক

দিনের বন্ধু আর বিশ্বস্ত কর্মচারি মিস্টার লেমিল ডিফের সঙ্গে। আশা করি মিস থালিয়া ম্যাকাফির কথাও কিছু বলবেন আমাদেরকে তিনি, যা শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন দর্শকরা'

ফগের ওপর থেকে সরে গেল ক্যামেরা। দেখা গেল লেমিল ডিফকে। ক্রাইম রিপোর্টারের আকর্ষণীয় চেহারার কাছে তাঁকে নেংরাই লাগছে, চোখে পড়ার মতো কোনো ব্যক্তিত্ব নয়। যাই হোক, বেশ গুরুগম্ভীর একটা ভঙ্গি নিয়েছেন তিনি। যেন বোঝানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা যে ফগের চেয়ে কোন অংশেই কম নন তিনি

'মিস্টার ফগ' বললেন তিনি, 'আমি শিওর, মিস ম্যাকাফিকে ভালো ভাবেই মনে রেখেছেন আপনারা। যদি ভুল না হয় আমার, আপনিও অভিনয় করেছেন একসময়। মিস ম্যাকাফির শেষ ছবি 'দি আউফোর্ডেল স্টোরি'তে কটন মাদারের অভিনয় করেছিলেন। ওটাই ছিলো আপনার প্রথম ছবি, তাই না?'

'হ্যাঁ' স্বীকার করলেন ফগ। 'কিন্তু...'

'এবং শেষ,' বাধা দিয়ে বললেন ডিফ।

'লোকটা অভদ্র!' বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'এমন করে বলে নাকি কেউ। মনে হয় মিস্টার ফগকে পছন্দ করে না।'

'হতে পারে,' কিশোর বললো

লাল হয়ে গেছে ফগের মুখ। তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, 'ফিল্মগুলো চুরি গেছে শুনে নিশ্চয় খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মিস ম্যাকাফি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'রিপোর্টারদের সঙ্গে দেখা করেন না মিস ম্যাকাফি। আর এখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। ডাক্তার তাঁকে ঘুমের ওষুধ প্রেসক্রাইব করে গেছেন। ফিল্মগুলো ডাকাতি হওয়ায় মন খুব খারাপ হয়ে গেছে তাঁর।'

'হবেই,' মোলায়েম গলায় সহানুভূতি জানালেন ফগ। 'মিস্টার ডিফ, অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর মিস ম্যাকাফির কোনো ছবিই আর দেখানো হয়নি। এখন কি কারণে টেলিভিশন কোম্পানিকে ছবিগুলো বিক্রি করে দিলেন তিনি?'

হাসলেন ডিফ। 'তিরিশ বছর আগে স্টুডিও একজিকিউটিভরা বুঝতে পারেনি টেলিভিশনে কতোখানি সাড়া জাগাবে ওসব ছবি, কতোটা আবেদন সৃষ্টি করবে। তবে মিস ম্যাকাফি বুঝতে পেরেছিলেন। টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা ছিলো তাঁর। যদিও জিনিসটা তাঁর তেমন পছন্দ নয়।'

'তিনি টেলিভিশন দেখেন না?'

'না, দেখেন না। তবে তিরিশ বছর আগে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন কতোটা জরুরী হয়ে উঠবে এই যন্ত্রটা। তাই যতোগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন সবগুলোর কপিরাইট কিনে নিয়েছিলেন। তিন হপ্তা আগে ঠিক করেছেন তিনি, সময় হয়েছে, এইবার বিক্রি করা যায় ছবিগুলো। হারভে ভিডিওর সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র সই করলেন। আজ সকালে নেগেটিভগুলো নিয়ে যায় কোম্পানি, মেরামত আর পরিষ্কার করার জন্যে পাঠিয়ে দেয় গ্রীন পিকচার ল্যাবরেটরিতে।'

'তারমানে ছবিগুলো পাওয়া না গেলে পুরো ক্ষতিটা হবে হারভে কোম্পানির,'

ফগ বললো।

'হ্যাঁ। তবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে সারা দুনিয়ার। মিস ম্যাকাফি খুব বড় অভিনেত্রী। মনে রাখার মতো অনেক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি—ক্লিওপেট্রা, জোয়ান অভ আর্ক, ক্যাথরিন দা গ্রেট অভ রাশিয়া, হেলেন অভ ট্রয়। ছবিগুলো পাওয়া না গেলে এসব রেকর্ড চিরতরে হারিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই খুব খারাপ হবে সেটা,' ফগ বললো। 'যারাই করেছে কাজটা গুরুতর অপরাধ করেছে, খুব অন্যায়। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যতো শীঘ্র সম্ভব দুই ডাকাতকে খুঁজে বের করবেন, উদ্ধার করবেন ফিল্মগুলো।'

ক্যামেরা আরও কাছে সরে গেল। বড় হলো ফগের মুখ, সামনে এসে গেল, তার বক্তব্যের আন্তরিকতা মুখেই প্রকাশ পাচ্ছে। বললো, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, আমি হেনরি ফগ বলছি ম্যাকাফি এস্টেট থেকে, যেখানে বাস করছেন এই বিখ্যাত অভিনেত্রী, যে জায়গার অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে কাজের প্রেরণা জুগিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এবং যে জায়গা তাঁকে সব সময় লুকিয়ে রেখেছে তাঁর অসংখ্য ভক্ত আর বন্ধুদের কাছ থেকে, যাদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি তিনি। লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে।'

শূন্য হয়ে গেল পর্দা। তারপর আবার ফুটলো কনসারের মুখ। 'এবার অন্যান্য সংবাদ...' শুরু করলো সে।

সেটটা অফ করে দিলো কিশোর 'বিজ্ঞাপন করে গেল যেন একেবারে, পাবলিসিটি স্টান্ট,' আনমনেই বললো সে। 'তবে তা হয়তো নয়।' বন্ধুদের দিকে তাকালো। 'মিস ম্যাকাফির মেমোয়ারসের কথা বলার একটা বড় সুযোগ হারালেন মিস্টার ডিফ। বিজ্ঞাপনের জন্যে হলে এটার কথাও
বাদ রাখতেন না।'

ঠিক এইসময় বারান্দায় কি যেন পড়ে গেল। 'ধুর!' বলে উঠলো একটা বিরক্ত কণ্ঠ।

প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুললো কিশোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উলফ হেস। 'একটা ফুলের টব ভাঙলাম। সরি।'

লিভিং রুমে ঢুকলো সে 'কিশোর, সাহায্য লাগবে আমার।' তার চোখের কোণে কালি পড়েছে। 'হ্যানসন বলেছে, তোমাদের খুব বুদ্ধি, ভাল কাজ করতে পারো। তিন গোয়েন্দার সাহায্য চাই আমি। বড় কোনো গোয়েন্দা সংস্থায় হয়তো যেতে পারতাম, কিন্তু খরচ দিতে রাজি হবে না চাচা।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন আর মুসা। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে উলফকে দেখে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলো কিশোর।

'ম্যাকাফি মেমোয়ারস,' উলফ জানালো, 'স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি। চুরি করে নিয়ে গেছে কেউ!'

চার

'স্বীকার করছি, আমি চলাফেরায় ভারি, অনেক কিছুই গোলমাল করে ফেলি,' উলফ বললো। 'জিনিসপত্র ভেঙে ফেলি, হোঁচট খেয়ে পড়ি। কিন্তু ব্যবসা ভালোই বুঝি। ওখানে গোলমাল করি না। পাণ্ডুলিপিটা আমি হারাইনি, জোর গলায় বলতে পারি। চুরি গেছে ওটা।'

'ননসেন্স!' বিড়বিড় করলেন হাইমার হেস।

রকি বীচ থেকে তিন গোয়েন্দাকে পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসের উঁচু উঁচু যে বাড়িগুলো রয়েছে, সেখানে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে উলফ, ওদের অ্যাপার্টমেন্টে। আধুনিক বাড়ি। সিকিউরিটি সিস্টেম খুব কড়া। সোনিক ডিভাইসের সাহায্যে খোলে গ্যারেজের দরজা। লবি থেকে যে দরজাটা ইনার কোর্টে গিয়ে ঢুকেছে, সেটাতে নজর রেখেছে ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা। লিভিং রুমে ঢুকে হাইমারকে সোফায় বসে থাকতে দেখেছে তিন গোয়েন্দা। দাঁতে চেপে ধরা লম্বা, সরু একটা চুরুট। ছাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শূন্য দৃষ্টিতে।

'ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে সময় নষ্ট করতে আমি নারাজ, ঘোষণা করে দিলেন তিনি। 'ভুলে কোথাও রেখে দিয়েছো, মনে নেই আর, তোমার যা স্বভাব। ঠিকই বেরোবে কোনোখান থেকে, দেখো। আর এজন্যে কোনো গোয়েন্দা আমাদের দরকার নেই। ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর আঙুলের ছাপ তোলার পাউডার নিয়ে এসে ছোঁক ছোঁক করবে কয়েকটা ছোকরা, সেটা আরও অসহ্য।'

'পাউডার আনিনি আমরা, স্যার,' কিশোর বললো।

'কৃতজ্ঞ করেছো আমাকে, আরকি,' ছাতের দিক থেকে চোখ সরালেন না হাইমার। 'উলফ, বীমা কোম্পানির লোক এসেছিলো। গাধার মতো অনেক প্রশ্ন করেছে। জবাব দিইনি। ওর কথাবার্তাই পছন্দ হয়নি আমার। এমন ভাবে বলছিলো, যেন পোড়া বাড়ির জন্যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা পেলে আমার বিরাট লাভ হয়ে যাবে।'

'চাচা, প্রশ্ন তো করবেই ওরা

'তাই বলে লোককে চোরের মতো জেরা করবে নাকি?' ধমকে উঠলেন হাইমার। 'টাকা দিতে দেরি না করলেই খুশি হই আমি। অফিস ঠিকঠাক করে আবার চালু করতে বহু টাকা বেরিয়ে যাবে।'

'পাণ্ডুলিপিটা পেলেই আমি কাজ শুরু করে দিতে পারতাম।'

'তাহলে খোঁজো।'

'খুঁজেছি। নেই।'

'উলফ, আমরা যদি খুঁজি আপত্তি আছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'আপনি যখন বলছেন, নেই, তো নেই। তবু আরেকবার খুঁজতে অসুবিধে কি?'

'বেশ দেখো না,' রাজি হলো উলফ। বসে রইলো সে চাচার সঙ্গে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে, চাচার ওপর বিরক্ত, নজরেই বোঝা যায়।

তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ছেলেরা। প্রতিটি আসবাবপত্রের পেছনে, আনাচে কানাচে, আলমারি আর বুককেসের ভেতরে। পাওয়া গেল না পাণ্ডুলিপিটা।

'নেই,' অবশেষে বললো কিশোর। 'গোড়া থেকে শুরু করা যাক আবার। কখন দেখেছেন ওটা নেই?'

নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়েছে রবিন। উলফের বক্তব্য লিখে নেয়ার জন্যে।

'কাল রাতে, এই সোয়া ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ। বাসায় এনে ব্রিফকেস থেকে খুলে পাণ্ডুলিপিটা পড়ছিলাম, এই সময় আগুন দেখে ছুটলাম। ফিরে এসে আর পড়ার মানসিকতা রইলো না। মনে হলো পরিশ্রম করা দরকার, মনটাকে শান্ত করার জন্যে। তাই পাণ্ডুলিপিটা কফি টেবিলের ওপর রেখে কাপড় বদলে সুইমিং সুট পরে চলে গেলাম পুলে, সাঁতার কাটার জন্যে।'

'আপনি কি তখন এখানে ছিলেন, স্যার?' হাইমারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা নাড়লেন তিনি। 'কাল রাতে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে গিয়েছিলাম। দুটোর সময় ফিরেছি।'

'আর আপনি যখন পুল থেকে ফিরে এলেন,' উলফের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর, 'পাণ্ডুলিপিটা তখন নেই, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঘরে ঢুকেই দেখেছি, নেই।'

'আপনি পুলে যাওয়ার পর কি তালা খোলা ছিলো দরজার? খোলা রেখে বেরোনোর অভ্যেস আছে?'

'কখনও না। তালা দেয়া ছিলো, আমি শিওর। শিওর হচ্ছি, তার কারণ চাবি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পরে ম্যানেজারের কাছে রাখা বাড়তি চাবি দিয়ে খুলে ঢুকেছি।'

উঠে গিয়ে দরজার নব, তালা, সব পরীক্ষা করতে লাগলো কিশোর। 'জোর করে তালা খোলার কোনো চিহ্ন নেই। আর লবির দরজাটা নিশ্চয় সব সময় তালা দেয়া থাকে, তাই না? তাছাড়া এই ঘরটা বারো তলায়, জানালা দিয়ে ঢোকাও সম্ভব নয়। তার মানে যে-ই ঢুকুক, তার কাছে চাবি থাকতেই হবে।'

মাথা নাড়লো উলফ। 'বাড়তি কোনো চাবির গোছা নেই। ম্যানেজারের কাছে যেটা আছে সেটা মাস্টার কী। আর ম্যানেজার লোকটা আছে বহু বছর ধরে, তাকে বিশ্বাস করি আমরা।'

নোটবুক থেকে মুখ তুললো রবিন। 'চাবির গোছা তাহলে আপনার কাছে এক সেট, আর আপনার চাচার কাছে এক সেট, এইই?'

একটু ভাবলো উলফ। 'বাড়তি গোছা বাড়িতে নেই। তবে আরেক সেট আছে আমার ডেস্কে, অফিসে। আমার কাছে যেটা সব সময় থাকে সেটা হারিয়ে গেলেও যাতে বিপদে না পড়ি সেজন্যে রেখেছিলাম গোছাটা। তবে এখন আর বলে লাভ

নেই। ডেস্ক গেছে পুড়ে, ওই চাবি আর পাওয়া যাবে না।'

'হুঁমম!' মাথা দোলালো কিশোর, 'সেরকমই লাগছে।' দরজার কাছ থেকে সরে এসে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিচের পুলের দিকে তাকালো। 'এখানে ঢোকা কঠিন, কিন্তু ঢুকেছিলো লোকটা,' আনমনে বললো সে। 'এই ঘরে ঢুকেছিলো, কফি টেবিলে পাণ্ডুলিপিটা দেখেছিলো, তুলে নিয়ে চলে গেছে। কি করে করলো?'

পাশে এসে দাঁড়ালো মুসা। পুলের দিকে না তাকিয়ে সে তাকালো আকাশের দিকে। 'ছাতের ওপর দিয়ে উড়ে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঢুকেছে। খুব ছোট্ট একটা হেলিকপ্টারে করে। এটাই একমাত্র জবাব।'

'হেলিকপ্টার কেন, ঝাড়ুবাঁধা ডাণ্ডা হলে আরও ভালো,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন হাইমার। 'ডাইনীরা যেগুলোতে চড়ে চলাফেরা করে। তাহলে আমাদের সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। কোনো ডাইনী এসেই নিয়ে গেছে।'

এমন ভঙ্গিতে তাকালো উলফ যেন তার মাথায় বাড়ি মারা হয়েছে। 'ডাইনী!'

'কেন? হেলিকপ্টারের যুক্তিটার চেয়ে কি ভালো না এটা?'

'আশ্চর্য! পাণ্ডুলিপিটা কিছুদূর পড়েছি আমি। তাতে ডাইনীর কথা লেখা আছে। আর হলিউডের ভেতরের মানুষদের সম্পর্কে উদ্ভট কথাবার্তা। একজন পরিচালকের কথা বলেছেন মিস ম্যাকাফি, লোকটার নাম ওয়েসলি থারগুড, একটা ডিনার পার্টি নাকি দিয়েছিলেন। মিস বলেছেন, লোকটা নাকি জাদুকর, কালো ডাইনী। সাইমন ম্যাগাসের পেনটাকল পরতো।'

পকেট থেকে কলম বের করে একটা খামের ওপর আঁকতে শুরু করলো উলফ। 'এই যে, পাণ্ডুলিপিতে এরকম পেনটাকল আঁকা ছিলো। একটা চক্রের ভেতরে পাঁচ-কোণাওয়ালা তারা। মিস ম্যাকাফি বলেছেন পেনটাকলটা সোনার তৈরি, মাঝখানে রুবি পাথর বসিয়ে একটা চক্র আঁকা। সাইমন মেগাসের নাম আমি আগেই শুনেছি। প্রাচীন রোমের জাদুকর ছিলো সে। লোকে বলে, সে নাকি উড়তে পারতো।'

'চমৎকার!' হাততালি দিলেন হাইমার। 'তাহলে তো মিটেই গেল। মিস ম্যাকাফির এই জাদুকর বন্ধুটি ওই পেনটাকল পরে উড়ে এসে ঢুকেছে ঘরে, পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে চলে গেছে। যাতে কেউ জানতে না পারে তার মতো একটা দুষ্ট জাদুকর এখনও আছে আমেরিকায়।'

'উড়ে আর যে-ই এসে থাকুক,' হাসলো না কিশোর, 'ওয়েসলি থারগুড নন। দশ বছরেরও বেশি আগে তিনি মারা গেছেন। উলফ, ওরকম উদ্ভট কাহিনী আরও কিছু ছিলো পাণ্ডুলিপিটায়?'

মাথা নাড়লো উলফ। 'জানি না। বেশি দূর পড়তে পারিনি। তবে থাকতে পারে। অনেক ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিলো মিস ম্যাকাফির।'

'এই জন্যেই। বুঝলেন, মনে হয় এই কারণেই চুরি হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা। সেই লোকটা চাইছে মেমোয়ারসটা প্রকাশিত না হোক।'

'কিন্তু এটা যে এখানে আছে সেই লোক কি করে জানলো?'

'সহজ!' পায়চারি শুরু করলো কিশোর। উত্তেজনায় কুঁচকে গেছে ভুরু।

'উলফ, কাল রাতে আপনি লেমিল ডিফকে ফোন করে বলেছিলেন পাণ্ডুলিপিটা নিরাপদে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি বলেছেন মিস ম্যাকাফিকে। তারপর মিস ম্যাকাফি তাঁর কোনো বন্ধুকে বলেছেন, কিংবা ডিফ বলেছেন তাঁর কোনো বন্ধুকে। এভাবে ছড়াতে পারে খবরটা।'

'তাহলে মিস ম্যাকাফি বলেননি। ডিফ বলেছে, মহিলা নাকি টেলিফোনই ব্যবহার করেন না। তবে ডিফ নিজে খবরটা ছড়িয়ে থাকতে পারে, ক্ষতিটা কি হতে পারে সেটা না জেনেই। মিস ম্যাকাফির সেক্রেটারি এখনও তাঁর সাথেই থাকে। তার নাম এলিনা ফিউজ। সে-ও বলে থাকতে পারে।'

'তা পারে। মিস ম্যাকাফির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। আপনি ব্যবস্থা করতে পারেন? তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কার কার সম্পর্কে লিখেছেন।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবেন না তিনি। কারো সঙ্গেই করেন না। যা করার ডিফই করেন।'

'তাহলে ডিফের সঙ্গেই কথা বলুন। নিশ্চয় তিনি পড়েছেন পাণ্ডুলিপিটা।'

গুঙিয়ে উঠলো উলফ। 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই না আমি। করলেই অ্যাডভান্সের কথা জিজ্ঞেস করবেন। আর পাণ্ডুলিপি না পড়ে সেটা দিতে চাই না আমি। আছেই মাত্র একটা কপি, সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। নইলে পাণ্ডুলিপি হারানোর কথা শুনলে স্ট্রোক করেই মারা যাবেন বেচারা।'

'তাহলে তাঁকে বলার দরকার নেই,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'বলবেন, ওটা ছাপার ব্যাপারে কিছু আইনগত বাধা আছে এখন। অ্যাডভান্স দেয়ার আগে আপনার উকিলের সাথে আলোচনা করতে চান। জিজ্ঞেস করবেন পাণ্ডুলিপিতে লেখা কাহিনীগুলো যে সত্যি, তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন কিনা মিস ম্যাকাফি। আরও জিজ্ঞেস করবেন, কারও সাথে এখনও তাঁর যোগাযোগ আছে কিনা। এলিনা ফিউজের আছে কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'আমি পারবো না। গোলমাল করে ফেলবো। ঠিক বুঝে ফেলবে ডিফ, কোনো কিছু গড়বড় হয়েছে।'

'তাহলে কিশোরকে সাথে নিয়ে যান,' মুসা বললো। 'লোকের কাছ থেকে কথা আদায় করতে ওস্তাদ ও। ওরা বুঝতেই পারবে না যে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে।'

কিশোরের দিকে তাকালো উলফ। 'সত্যি পারবে?'

'পারবো।'

'বেশ।' পকেট থেকে একটা অ্যাড্রেস বুক বের করে ফোনের দিকে এগোলো উলফ।

'কাকে করবে?' জিজ্ঞেস করলেন হাইমার। 'লেমিল ডিফকে?'

'হ্যাঁ। আজ বিকেলেই কিশোরকে নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি তার সঙ্গে।'

পাঁচ

'মালিবুর কোস্টাল কম্যুনিটির কাছে এসে একটা সাইড রোডে নেমে গাড়ির গতি কমালো উলফ। এতোক্ষণ কথা বললেও এখন একেবারে চুপ হয়ে আছে। পাহাড়ী পথ ধরে নীরবে গাড়ি চালালো আরও পাঁচ মিনিট, তারপর ব্রেক কষলো। মোড় নিয়ে নেমে পড়লো সরু একটা খোয়া বিছানো পথে। আরও পোয়াটাক মাইল এগোনোর পর মরচে পরা একটা লোহার গেটের সামনে এসে থামলো। গেটের ওপরে লেখা দেখে বোঝা গেল, টুইন সার্কেল র‍্যাঞ্চে পৌছেছে ওরা।

'কি দেখবো ভেবেছিলাম বলতে পারবো না,' উলফ বললো। 'তবে এরকম কিছু দেখবো আশা করিনি।'

'খুব সাধারণ মনে হচ্ছে,' কিশোর বললো। 'মিস ম্যাকাফির মতো একজন অভিনেত্রীর বাড়ি হওয়া উচিত ছিলো প্রাসাদের মতো। কিংবা কোনো দুর্গটুর্গ, যেহেতু তিনি একা থাকতে পছন্দ করেন। নিদেন পক্ষে বাড়ির চারপাশে দশ ফুট উঁচু দেয়াল তো থাকারই কথা। অথচ এখানে গেটে তালা পর্যন্ত নেই।'

নেমে গিয়ে পাল্লা খুলে দিলো সে। গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢুকলো উলফ। কিশোরকে আবার তুলে নিয়ে চললো লেবুবনের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ ধরে।

'একটা ব্যাপার অবাক লাগছে আমার,' কিশোর বললো। 'মিস ম্যাকাফি সব ফিল্ম বিক্রি করে দিয়েছেন, একথা কাল ডিফ বললেন না কেন আপনাকে?'

'হ্যাঁ,' একমত হলো উলফ। 'বইয়ের কাটতির ব্যাপারে এর বিরাট আবেদন রয়েছে।'

'পাণ্ডুলিপিটা আপনাদেরকে দেয়ার কথা কে ঠিক করেছেন? ডিক নাকি মিস ম্যাকাফি?'

'শিওর না। মাস দেড়েক আগে একদিন ডিফ জানালো, মিস ম্যাকাফি তাঁর স্মৃতিকথা ছাপতে চান। মহিলার সবকিছুই দেখাশোনা করে ম্যানেজার। কাজেই কার ইচ্ছেতে ছাপছে এ কথাটা জিজ্ঞেস করার কথা মনে আসেনি একবারও। ভাবভঙ্গিতে যতোটা দেখাক আসলেই ততোটা বুদ্ধিমান কিনা সে, তা-ও জানি না। ফিল্মগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, একথাটা আমাকে জানানো উচিত ছিলো তার।'

লেবুবনের ভেতর থেকে বেরোলো গাড়ি। শাদা রঙের একটা র‍্যাঞ্চ হাউস দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় বাড়িটা। অসাধারণ কিছু নেই তার মধ্যে। সামনে লম্বা, ছড়ানো বারান্দা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লেমিল ডিফ, রোদ পড়ায় চোখমুখ কুঁচকে রেখেছেন।

উলফকে গাড়ি থেকে বেরোতে দেখে বললেন, 'গুড আফটারনুন। বনের ভেতরে থাকতেই আপনার গাড়ির ধুলো দেখেছি।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কে?'

'আমার খালাতো ভাই, কিশোর পাশা,' মিথ্যে কথা বললো উলফ। কিশোরই শিখিয়ে দিয়েছে একথা বলতে। এটুকু বলতেই লাল হয়ে গেল মুখ। 'কাল নুবার প্রেসে ওকে দেখেছেন আপনি। কাজ শিখছে। সিনেমার ব্যাপারে খুব আগ্রহ, তাই তার ওপর একটা কোর্স করছে। নিয়ে এসে বিরক্ত করলাম না তো? মিস ম্যাকাফির বাড়িতে আসছি শুনেই লাফিয়ে উঠলো।'

'না না, ঠিক আছে,' লেমিল বললেন। 'তবে আজ আপনাকে দেখে অবাকই হয়েছি। কাল আগুন লাগলো, আজকে আপনি চলে এলেন। নিশ্চয় আরও অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে আপনার।'

'বাড়িতে থাকতে ভালো লাগলো না বলেই চলে এলাম। খালি দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো।'

'হওয়ারই কথা,' মাথা ঝাঁকালেন ডিফ। ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে গেলেন। ঘরে না ঢুকে বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসে পড়লেন। মেহমানদেরকেও বসতে ইশারা করলেন।

বসলো উলফ। ভূমিকা করলো না। সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো, 'মিস্টার ডিফ, আপনার চেকটা পেতে কিছুদিন দেরি হবে। কিছু অসুবিধে আছে। পাণ্ডুলিপিটা আমি পড়েছি। কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো আইনগত ভাবে বিপদে ফেলতে পারে। এই যেমন ধরুন, তিনি লিখেছেন হলিউডের একজন চিত্রপরিচালক জাদুকর ছিলেন। জানি, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর বংশধর কেউ থাকতে পারে। তারা কেস করে দিতে পারে। তাই আমি আমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবো ভাবছি। আপনার কাছে এসেছি, মিস ম্যাকাফিকে বলে কিছু সাক্ষিপ্রমাণের ব্যবস্থা যদি করে দেন। আর সেই সব লোকের ঠিকানাও দরকার।'

'ঠিকানা দেয়া যাবে না। অনেক দিন আগের কথা এসব। এতোদিন নিশ্চয় ঠিকানা রেখে দেননি মিস ম্যাকাফি।'

'তাহলে আপনি হয়তো বলতে পারবেন, অন্তত দু'চারজনের কথা তো পারবেনই, যাদের সঙ্গে কথা বলতে পারা যাবে।' অস্বস্তি বোধ করছে উলফ, তার কপালের ঘাম দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। 'পাণ্ডুলিপিটা তো পড়েছেন। আমার বিশ্বাস…'

'না,' বাধা দিলেন ডিফ। 'পড়িনি। কাল বিকেলে আমার হাতে ওটা দিয়েছেন মিস ম্যাকাফি। না, কোনো ভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। ওই সব লোকের সঙ্গে আমার আন্তরিকতা ছিলো না। তখন আমি ছিলাম সাধারণ এক শোফার। আর তাঁরা ছিলেন বড় বড় মানুষ।'

'তাঁর সেক্রেটারিকে ধরলে কেমন হয়?'

'এলিনা ফিউজ?' অবাক হলেন ডিফ। 'বহু বছর ধরে এই এলাকা থেকেই বেরোয়নি সে।'

চুপ হয়ে গেল উলফ। তাকে সাহায্য করলো কিশোর। চারপাশে তাকিয়ে নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'মিস ম্যাকাফির সঙ্গে দেখা হবে না?'

'আমি আর এলিনা ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করেন না তিনি। আর আজকে তো দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। ফিল্ম চুরির শোকেই কাতর। ওপরতলায় শুয়ে আছেন। এলিনা রয়েছে তাঁর কাছে। আর দয়া করে তোমরা যদি একটু আস্তে কথা বল, ভালো হয়।'

'সরি,' কৌতূহলী দৃষ্টিতে আরেকবার চারপাশে তাকালো কিশোর। 'মিস ম্যাকাফি তাহলে একা থাকতেই পছন্দ করেন, না? সন্ন্যাসিনী। আপনি আর এলিনা ছাড়া আর কেউ থাকেন না। তারমানে চাকর-বাকর কেউ নেই?'

'খুব সাধারণ জীবন যাপন করি আমরা। চাকরের দরকার হয় না।'

'আজ সকালে টেলিভিশনে দেখেছি আপনার সাক্ষাৎকার। মিস ম্যাকাফি টেলিভিশন দেখেন না, সত্যি?'

'সত্যি। আমি দেখি। কোনো খবর তাঁর শোনার মতো হলে, শুনতে চাইলে, আমিই বলি।'

'অনেক বেশি একলা থাকেন। কারো সাথেই দেখা করেন না? আপনিও না? মানে, একা থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যান না আপনারা? এলিনা ফিউজও হন না?'

'না। আমিও একা থাকতেই ভালোবাসি। আর এলিনা তো মিস ম্যাকাফি বলতে পাগল। আমরা দু'জনেই শুধু তাঁর সঙ্গে থাকতে পারলেই খুশি।'

উলফের দিকে তাকালো কিশোর। 'দেখলেন তো? কোনো ভাবনা নেই। আপনার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

উলফের দিকে তাকালেন ডিফ। 'দুশ্চিন্তা? কিসের?'

'ইয়ে, মানে, উলফ আসার সময় বলছিলো, তার নাকি ভয় লাগছে,' কিশোর বললো। 'তার মনে হয়েছে, ফিল্মগুলোর মতোই কেউ যদি পাণ্ডুলিপিটা চুরি করে নেয়, তারপর টাকা দাবি করে? আপনি যদি কাউকে বলে দিয়ে থাকেন, ওটা কোথায় আছে…'

'আমি কাকে বলতে যাবো?'

'সেকথাই তো বলছি। আপনি কাকে বলবেন? ফোনটোন করে কাউকে যদি…কিংবা কেউ যদি আপনাকে ফোন করে…'

'ডিরেকটরিতে তোলা হয়নি, এরকম একটা নম্বর ব্যবহার করি আমরা। লোকে ফোন করে না। বেশি দরকার না হলে আমরাও করি না। যখন আর-কোনো উপায় থাকে না শুধু তখন।'

'তাই! ইস্কুলে গিয়ে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।' উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'হাত ধোয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই,' একটা দরজা দেখালেন ডিফ। 'হলঘর দিয়ে সোজা পেছনে চলে যাও। সিঁড়ির পাশ দিয়ে গেলেই রান্নাঘর আর বাথরুম দেখতে পাবে।'

'থ্যাংকস,' বলে ঘরে ঢুকে পড়লো কিশোর।

বারান্দার রোদ থেকে এসে ঘরের আলো খুব সামান্য মনে হলো তার কাছে। পাশের লিভিং-রুমটা সাজানো হয়েছে পিঠখাড়া কাঠের চেয়ার দিয়ে। ডানের

ডাইনিং রুমে শুধু একটা সাধারণ কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি। চওড়া সিঁড়িতে কার্পেট নেই। ওটার পাশ কাটিয়ে গিয়ে বাথরুমটা পেয়ে গেল সে। ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে কল খুলে দিলো। তারপর সিংকের ওপরের মেডিসিন কেবিনেটটা খুললো। ভেতরে কিছুই নেই শুধু একটা জার ছাড়া, তার ভেতরে শুকনো কিছু পাতা। পুদিনার গন্ধ। কেবিনেটটা বন্ধ করে দিয়ে হাত ধুয়ে নিলো। হাত মুছলো দেয়ালের হুকে ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে। তোয়ালেটাও মনে হলো ঘরে বানানো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলো কিশোর পুরনো আমলের জিনিসপত্র দেখে চোখ মিটমিট করলো। আদিম রেফ্রিজারেটরের মাথার ওপরে কয়েলের তার বেরিয়ে রয়েছে। পুরনো গ্যাসের চুলাটার পাইলট লাইট পর্যন্ত নেই। সিংকের ওপরের টেপগুলো পিতলের, পুরনো হতে হতে ক্ষয় হয়ে গেছে। বহু বছর আগে ঘরটা তৈরি করার সময় লাগানো হয়েছিলো, তারপর আর নতুন করে বদলানো হয়নি।

সিংকের কাছে একটা কাউন্টারে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কাচের জার। লেবেলগুলো পড়ার জন্যে কাছে এগোলো সে। নানারকমের ভেষজ পাতা আর ফুলের নাম। ট্যানজি, লুপাইন, রোজ হিপস, টাইম আর পুদিনা। একটা জারের লেবেল অবাক করলো তাকে। ওটাতে রয়েছে মারাত্মক বিষাক্ত বিষকাঁটালি।

সারির শেষ মাথার একটা বড় জারে রয়েছে অনেকগুলো দিয়াশলাইয়ের কাঠি। কয়েকটা দেখলো সে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো। ঝট করে ঘুরে তাকালো জানালার দিকে। একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে বলে মনে হয়েছে।

বড় বড় কিছু ওকের জটলা হয়ে রয়েছে একজায়গায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সে। অনেক বয়েস হয়েছে গাছগুলোর। আঁকাবাঁকা কাণ্ড আর ডাল ছড়িয়ে রয়েছে। ডালগুলোকে দেখে মনে হয় বিকলাঙ্গ। কাঁটাওয়ালা সবুজ পাতা এতো ঘন হয়ে জন্মেছে, আকাশ ঢেকে দিয়েছে আলো আসতে পারছে না ঠিকমতো দেখতে লাগে মেঘলা দিনের মতো। মাঝখানে বেশ ফাঁক রেখে সারি দিয়ে লাগানো হয়েছিলো ওকগুলো। ওই ফাঁকে দু'জন মহিলা পাশাপাশি হাঁটছে। গাঢ় রঙের গাউন পরনে। কোমরের কাছটা বেশি আঁটো। তারপর থেকে ছড়িয়ে নেমে গেছে এতো নিচে, মাটি ছুঁয়ে যায় হাঁটার সময়। দু'জনেরই লম্বা চুল। মাথার পেছনে নিয়ে গিয়ে ঝুটি করে বেঁধেছে। পেছনে যেন তাদেরকেই তাক করে রয়েছে একটা কুকুর, ডোবারম্যান পিনশার।

বাড়ির দিকে তাকালো একজন মহিলা। চমকে গেল কিশোর। আরি, এ-তো থালিয়া ম্যাকাফি! সিনেমার ওপর লেখা বইতে ছবি দেখেছে তাঁর। পুরনো ওকের তলায় ধূসর আলোতেও মহিলাকে চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না তার। অভিনেত্রীর সোনালি চুল এখন শাদার কাছাকাছি। তবে সুন্দর মুখটা এখনও তেমন বুড়িয়ে যায়নি। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন

তিনি। কিশোরকে মনে হয় দেখেননি।

জানালার কাছে এগোলো কিশোর। ইস্, রোদ যদি থাকতো একটু। এমনিতেই ওক গাছ দেখলে কেমন গা শিরশির করে। সেই ওকের তলায় গাঢ় রঙের পুরনো ডিজাইনের গাউন পরা দুই মহিলাকে দেখতে দেখতে গায়ে কাঁটা দিলো তার।

পেছনে পায়ের শব্দ হতে চমকে উঠলো সে।

'হাত ধোয়া হয়েছে?' লেমিল ডিফ জিজ্ঞেস করলেন।

প্রথমে চমকে গেলেও মুহূর্তে সামলে নিলো কিশোর। জানালার দিকে হাত তুলে বললো, 'দেখুন কি বিচ্ছিরি লাগছে গাছগুলোকে। অন্ধকার করে দিয়েছে নিচেটা।'

'ওক ওরকমই। এখানেরগুলো তো আরও বাজে। রাস্তার ধারে আরেকজন র‍্যাঞ্চার থাকতো। সে বলতো, এখানকার ওকের জটলাগুলোতে নাকি ভূত আছে। দেখে কিন্তু সেরকমই লাগে। একসময় এখানে গোরস্থান ছিলো, আগের পরিবারটা যখন থাকতো। গাছের নিচে এখনও কবর আছে। মিস ম্যাকাফি জায়গাটা কেনার আগেই তারা চলে গেছে। এখানকার বন দেখলে এখনও গা ছম ছম করে আমার।' থেমে দম নিলেন ডিফ। তারপর বললেন, 'তোমার খালাতো ভাই তোমার জন্যে বসে আছে। চলো।'

ডিফের পিছু পিছু আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো কিশোর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে চেপে টুইন সার্কেল র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো দু'জনে।

'লাভ হলো না কিছু,' উলফ বললো। 'অযথা সময় নষ্ট করলাম। পাণ্ডুলিপিটা কে চুরি করেছে কিছুই বোঝা গেল না।'

'তবে ভাবনার অনেক খোরাক পেয়েছি।'

'মানে?'

'একটা কথা মিথ্যে বলেছেন ডিফ। মিস ম্যাকাফি দোতলায় নন। বাইরে, আরেকজন মহিলার সঙ্গে। বোধহয় এলিনা ফিউজই হবে। ওই একটা যখন বলেছেন, আরও মিথ্যে বলে থাকতে পারেন ম্যানেজার। রান্নাঘরে কিছু দেশলাই দেখলাম, বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে আনা। বলেন বটে বেরোন না, আসলে বেশ ভালোই বেরোন-টেরোন।'

'মিথ্যে বলবে কেন?'

'থালিয়া ম্যাকাফিকে বাঁচানোর জন্যে। তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন। বড় অদ্ভুত মহিলা। তিনি আর এলিনা কালো রঙের পুরনো ডিজাইনের গাউন পরেছেন। তীর্থযাত্রীদের মতো। আর রান্নাঘরে একটা জার দেখলাম, তাতে বিষকাঁটালি ভরা।'

'যাহ্!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বিষকাঁটালি তো বিষাক্ত!'

'বিষাক্ত বলেই তো কাঁটালির আগে বিষ শব্দটা জুড়ে দেয়া হয়েছে, জানা আছে আমার। থালিয়া ম্যাকাফি আজব মানুষ। তিরিশ বছরে খুব কমই বদলেছেন তিনি। দেখামাত্র চিনেছি। আজব কেন বলছি জানেন? তাঁর মতো একজন বয়স্কা মহিলা, যার রান্নাঘরে বিষকাঁটালি থাকে, যিনি তীর্থযাত্রীদের মতো কালো গাউন পরেন, এই অবেলায় পুরনো ওকের নিচের কবরস্থানে হাঁটাহাঁটি করেন, তাঁকে আর কি বলবো? লেমিল ডিফ বললেন, ভূতুড়ে বলে নাকি কুখ্যাতি আছে জায়গাটার। অন্তত লোকের নাকি তাই বিশ্বাস। আর দেখে যা মনে হলো আমার, ভুল বলে না লোকে। ওরকম জায়গায় ভূত দেখলে অবাক হবো না আমি।'

ছয়

'সাধারণ লোকের রান্নাঘরে তুমি বিষকাঁটালি দেখতে পাবে না,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। মোবাইল হোমের ভেতরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছে সে। 'বিষকাঁটালি অনেক ধরনের রয়েছে। কিছু কিছু ব্যবহার করা হয় বিষ বানাতে, আর কিছু হয় জাদুবিদ্যার কাজে। মানে হতো আর কি এক সময়।'

'তোমার মুখে শুনে তো আজবের চেয়েও আজব মনে হচ্ছে মহিলাকে,' মুসা বললো। 'রান্নাঘরে বিষকাঁটালি। বাড়ির পেছনে পুরনো কবরস্থান! আল্লিব্বাপরে!'

'এখন আর ওটা কবরস্থান নয়। একসময় ছিলো। তবে জায়গাটা দেখতে এখনও অদ্ভুত লাগে। দেখলে গা শিরশির করে।'

'কবরস্থান। বিষাক্ত ভেষজ।' নোটবুকে লিখে নিতে লাগলো রবিন। 'মিলছে! চমৎকারভাবে মিলে যাচ্ছে!'

নোটবুকের পাতা ওল্টাতে লাগলো সে। 'পাণ্ডুলিপিতে জাদুবিদ্যার কথা লেখা আছে শুনেই গিয়ে বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আমি। ওয়েসলি থারগুডের পেনটাকলটা নিশ্চয় খুব নাড়া দিয়েছে মহিলাকে। নইলে এতো কষ্ট করে ওটার নকশা আঁকতে যেতেন না।

'ডাইনীর কথা কিছু বলি। কয়েক ধরনের ডাইনী আছে। হ্যালোউইনদের কথাই ধরা যাক। কুৎসিত চেহারার বুড়ি। গালে আঁচিল থাকবে। এরা লোককে হাসায়, ক্ষতিটতি করে না। তার পর রয়েছে শয়তানের পূজারিরা, এরা ক্ষতিকর। লোকের সর্বনাশ করে। ওদের গুরু হলো শয়তান। শয়তানই নাকি ওদেরকে নানা কুকাজে সহায়তা করে।'

'একটা বর্ণও বিশ্বাস করলাম না আমি,' হাত নাড়লো মুসা। 'সব ছেলেভোলানো গপ্পো। যা-ই বলো, তাড়াতাড়ি শেষ করো। এসব শুনতে একটুও ভাল্লাগছে না আমার।'

'লাগবে, এখনই। এক ধরনের ডাকিনীবিদ্যা আছে, যাকে বলে ওল্ড রিলিজিয়ন। যারা এর চর্চা করে তারা বলে অনেক পুরনো আমল থেকেই শুরু হয়েছে এটা। এরা বিশ্বাস করে, এই বিদ্যার সাহায্যে নানারকম ফলফলাদি ফলানো যায়, ফসল জন্মানো যায়। তাই এ-বিদ্যাটাকে ভালোই বলা চলে।

মানুষের ক্ষতি না করে উপকারের জন্যেই এর চর্চা করে মানুষ। ডাইনীরা বিশ্বাস করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো তাদের শক্তির উৎস। সেটাকে কজা করতে পারলেই মহাশক্তিধর হয়ে যাওয়া যায়। জোট বেঁধে কাজ করে এই বিদ্যার অনুসারীরা, একেকটা জোটকে বলা হয় কোভেন। এক কোভেনে থাকে তেরোজন করে সদস্য। বিশেষ জায়গায় মিলিত হয় ওরা, এই যেমন চৌরাস্তার মোড়ে। তবে তার চেয়েও ভালো জায়গা আছে। আন্দাজ করতে পারো, কোথায়?'

'ইয়ে, কবরস্থান?' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো কিশোর।

'হ্যাঁ। নিয়মিত অনুষ্ঠানের সময় ওরকম জায়গায় মিলিত হয় ওরা। তাজা খাবার খায়। আর সেলিনা, অথবা চন্দ্রদেবী ডায়নার পূজা করে। রাতেই অনুষ্ঠান করে ওরা। খারাপ বলে নয়। পড়শীরা দেখে ফেললে নানারকম মন্তব্য করবে, কানাঘুষা করবে, এই ভয়ে। অনুষ্ঠান যে কোনো সময় করা যায়। তবে বছরের চারটি বিশেষ দিনে হয় বিশেষ অনুষ্ঠান, একে বলে স্যাবাট। একজন ওল্ড রিলিজিয়ন ডাইনী অবশ্যই যোগ দেবে স্যাবাটে। তারিখগুলো হলো, তিরিশে এপ্রিল, পয়লা অগাস্ট, একত্রিশে অকটোবর, আর দোসরা ফেব্রুয়ারি। হ্যালোউইনও হয় একত্রিশে অকটোবরে।'

নোটবুক বন্ধ করলো রবিন। 'আজ এইই পেয়েছি। জাদুবিদ্যার ওপরে লেখা আরও অনেক বই আছে। দরকার হলে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়তে পারি, কিংবা বইও নিয়ে আসতে পারি। ভাবছি, যে মিস ম্যাকাফির পাণ্ডুলিপিটা গায়েব করে দিতে চেয়েছে, সে কি কোনো ডাইনী? ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করে? সিনেমার কোনো লোক হতে পারে। হয় সে ওল্ড রিলিজিয়নের সদস্য–ব্যাপারটা জানাজানি হতে দিতে চায় নাঃ নয়তো সে স্যাটানিস্ট, শয়তানের পূজারি।'

কেঁপে উঠলো মুসা। 'যদি ওল্ড রিলিজিয়নের ভালো কোনো ডাইনীর কাজ হয়ে থাকে এসব, তাহলে আমি আছি। নইলে আমাকে বাদ রাখতে পারো। শয়তানের পূজারি কোনো মহা শয়তানের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে মরতে পারবো না আমি গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ, শয়তানের পূজারিগুলো মহা শয়তানই হয়। বিপজ্জনক। যাই হোক, রবিন তো ডাইনী নিয়ে গবেষণা করবে, বই ঘাঁটবে। ততোক্ষণ আমরা দু'জনে কি করবো?'

'থালিয়া ম্যাকাফির ব্যাপারে পড়াশোনা করেছি আমি,' মুসা বললো। 'আরও করতে পারি। মাইক্রোফিল্মের ফাইল ঘাঁটতে পারি।'

পকেট থেকে কয়েক ভাঁজ করা কাগজ বের করলো সে। পেন্সিল দিয়ে নোট লিখে এনেছে। পড়তে শুরু করলো, 'আঠারো বছর বয়েসে ইনডিয়ানার ফোর্ট ওয়েইনি থেকে এদেশে এসেছেন থালিয়া ম্যাকাফি। একটা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার হিসেবে হলিউডে আসার সুযোগ পান। ফিল্ম আর্ট স্টুডিওতে তিনি ঘোরার সময় ওয়েসলি থারগুডের চোখে পড়ে যান। তিন হপ্তা পর ফিল্ম আর্টের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায়। থারগুডের একটা ছবিতে মেরি কুইন অভ স্কটসের অভিনয় করার জন্যে। চোখে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়ে

কোনো মেয়েকে ছবিতে নায়িকার রোল দিয়ে ফেলা, সিনেমার ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড।'

মুখ তুলে তাকালো মুসা। 'যতো জায়গায়ই পড়েছি, সবাই একটা কথা নির্দ্বিধায় বলেছে, মহিলা অসাধারণ সুন্দরী।'

'এখনও সুন্দরী,' কিশোর বললো। 'আজই দেখলাম। আর কিছু জেনেছো?'

'এই টুকিটাকি। তিনি খুব শান্তশিষ্ট। কোনো রকম স্ক্যাণ্ডাল নেই। অনেকগুলো ভালো ভালো ছবিতে কাজ করেছেন। বেশির ভাগই ঐতিহাসিক চরিত্র, এই যেমন ক্লিওপেট্রা, ক্যাথারিন দা গ্রেট। অনেক নামীদামী পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, কিন্তু কাজ ছাড়া তাঁদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক ছিলো না মিস ম্যাকাফির। কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিলো না। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ মানুষ বলতে যা বোঝায়। কোনো অভিনেতাকে জড়িয়ে কোনো রোমান্টিকতার বদনাম ছিলো না তাঁর, বেশির ভাগ নায়িকাদেরই যেমন থাকে। তবে, জিটার কার্লোসের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়।'

'কে তিনি?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'দি অ্যাজফোডেল স্টোরি ছবির পরিচালক। ছবিটা শেষ হওয়ার পর পরই তিনি মারা যান। একটা অদ্ভুত ছবি, ডাইনীদের নিয়ে তৈরি। অ্যাজফোডেলে ডাইনীদের বিচার অনুষ্ঠানের ওপর…'

'আবার সেই ডাকিনীবিদ্যা,' বাধা দিলো কিশোর।

'হ্যাঁ। ছবিটা বিচিত্র। কাহিনীটাও। এতে পিউরিটান কুমারীর চরিত্রে অভিনয় করেন মিস ম্যাকাফি। ডাইনী আখ্যা দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়। বিচারে সাব্যস্ত হয় ফাঁসি দেয়া হবে তাঁকে। এক ইনডিয়ান যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তখন প্রাণ বাঁচান। ইনডিয়ানের চরিত্রে অভিনয় করেন জিটার কার্লোস। ছবির শুটিং শুরু হওয়ার আগেই মিস ম্যাকাফির সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে যায় তাঁর। কেউ কেউ গুজব ছড়াতে শুরু করে, ওই এনগেজমেন্ট একটা ভাঁওতাবাজি, ক্যারিয়ার তৈরির জন্যে এটা করেন জিটার। এর আগেও নাকি বহুবার অনেক নামীদামী অভিনেত্রীর সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছেন তিনি। একই উদ্দেশ্যে। দি অ্যাজফোডেল স্টোরি শেষ হওয়ার পর পরই মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান জিটার। মিস ম্যাকাফির র‍্যাঞ্চে এক পার্টি শেষ করে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে এতোই মানসিক আঘাত পান মিস ম্যাকাফি, কাজের ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যায়। আর কোনো ছবিতে অভিনয় করতে পারেননি। তাঁর সমস্ত ছবির নেগেটিভ কিনে নিয়ে পরের তিরিশটা বছর কাটিয়ে দেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

'তাঁর পুরনো বন্ধুদেরকেও এড়িয়ে চলেন?' জানতে চাইলো কিশোর।

'বন্ধু থাকলে তো কেউ,' মুসা বললো। 'তবে পরিচিত লোক অনেকেই ছিলো। একটা ছবির ফটোকপি বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে। 'দি অ্যাজফোডেল স্টোরি যে বছর তৈরি হয়েছে, সে-বছর অ্যাকাডেমি পুরস্কারের পার্টিতে ডিনারের সময় তোলা হয়েছে এটা। থালিয়া ম্যাকাফির জাদুচক্র। –এই ছবিতে লেমিল ডিফ নেই।'

'তারমানে তখন বন্ধু…ইয়ে, তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন না আরকি,' মন্তব্য করলো কিশোর। 'শোফার ছিলেন তো।'

ছবিটা ভালো করে দেখলো কিশোর। ক্যাপশন পড়লো। টেবিলের মাথার কাছে বসেছেন থালিয়া ম্যাকাফি আর জিটার কার্লোস। চামড়া শাদা নয় জিটারের, বাদামী। বেশ সুন্দর চেহারা। তাঁর পাশে বসেছে হেনরি ফগ, তরুণ, সুন্দর। মিস ম্যাকাফির প্রিয় ক্যামেরাম্যান হ্যারি ব্যানার রয়েছেন ছবিতে। আছে চার্লস গুডফেলো নামে একজন অভিনেতা। অভিনেত্রী উইডমারের পাশে বসেছে। স্ক্রিপ্টরাইটার জন ভোরটেক্স আছেন, আর আছে এলিনা ফিউজ। বসেছে একজন চরিত্রাভিনেতা রালফ স্মিথের পাশে। অ্যাজফোডেল পিকচারের কসটিউম ডিজাইনার পলি ফ্রেনটিসকে চেনা গেল ক্যাপশন দেখে। চেনা গেল মারথা কলিনস আর শেরিনা থারগুডকেও, দু'জনেই অভিনেত্রী। সাধারণ একটা মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে, নাম লিলি অ্যালজেডো, জিটারের সেক্রেটারি ছিলো।

'ইনটারেসটিং!' মাথা নাড়লো কিশোর। 'জাদুচক্রই বটে! তেরোজন লোক। আর এক টেবিলে তেরোজনের একসঙ্গে বসাটাকে বলা হয় আনল্যাকি, অবশ্যই যদি না ডাইনীদের অনুষ্ঠান হয়। তেরোজনে এক কোভেন, নম্বর ঠিকই আছে।'

দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো কিশোর। 'দারুণ সব তথ্য নিয়ে এসেছো তোমরা, বুঝলে। রবিন এনেছো স্যাবাটের তারিখ। পয়লা আগস্ট, বছরের চারটে বিশেষ দিনের একটি। আজকে সেই তারিখ। মিস ম্যাকাফি কি ডাইনী? এখনও অনুষ্ঠান করেন? করলে, বর্তমানে কে কে আছে তাঁর কোভেনে? জানার একটাই উপায়। আজ রাতে মালিবু হিলসে যেতে হবে।'

'পাগল!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'তাহলে কি যাবে না তুমি?'

দাঁত বের করে হাসলো মুসা। আবার বললো, 'পাগল! না গিয়ে পারি! ভূতপ্রেতকে যতো বেশি ভয় পাই, ততো বেশি দেখতে ইচ্ছে করে। তা কখন রওনা হচ্ছি?'

সাত

গোধূলি বেলায় খোয়া বিছানো পথটায় এসে পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা, যেটা ধরে যেতে হয় মিস ম্যাকাফির র‍্যাঞ্চে। নেমে বাইকের সীটে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলো কিশোর। রবিন আর মুসা কাছে এসে থামলে হাত তুলে দেখালো বাঁয়ে।

'ওটাই ওঁর বাড়ি,' বললো কিশোর। 'এই এলাকার ম্যাপ ভালো করে দেখে নিয়েছি আমি। অনেকগুলো জায়গা আছে এখানে, যেখানে কোভেন মিলিত হতে পারে। এই যে এই চৌরাস্তাটার কথাই ধরো। তারপর রয়েছে রান্নাঘরের পেছনে ওকের জটলার নিচে সেই কবরস্থান। আরেকটা জায়গা, তাঁর বাড়ি থেকে আধ মাইল উত্তরে, যেখানে দুটো পায়েচলা পথ আড়াআড়ি ভাবে একটার ওপর দিয়ে

আরেকটা চলে গেছে। ছড়িয়ে পড়ে চোখ রাখতে হবে আমাদের। যাতে মিস ম্যাকাফি বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে চোখে পড়ে। অন্তত আমাদের নজর এড়িয়ে কোথাও যেতে না পারে।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো রয়েছে একটা ব্যাগ। সেটাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কিশোর বললো, 'একটা কুকুর দেখেছি মিস ম্যাকাফির সাথে। কাজেই সাবধান থাকতে হবে আমাদের। বাড়ির বেশি কাছাকাছি যেতে পারবো না। যোগাযোগ রাখার জন্যে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছি।'

তিনটে ছোট যন্ত্র বের করলো সে। একটা দিলো রবিনকে, আরেকটা মুসাকে। তৃতীয়টা নিজে রাখলো। 'ওকের জটলার পেছনে পাহাড়ের ওপর থেকে চোখ রাখবো আমি। রবিন, তুমি লুকাবে রাস্তা আর বাড়ির মাঝের লেবুবনটার ভেতরে। আর মুসা যাবে উত্তরে, বাড়ির বাঁয়ে। একটা মাঠ আছে ওদিকে, লম্বা লম্বা ঘাস, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারবে। মিস ম্যাকাফি বাড়ি থেকে বেরোলে দেখতে পাবোই আমরা, যেদিকেই যাক না কেন। মানুষ, গাড়ি, যা-ই আসুক, খেয়াল রাখবে। স্যাবাট হলে, কোথায় হয় সেটা ওদের যাওয়া দেখেই বুঝে ফেলবো।'

অন্য দু'জন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলো তার নির্দেশ। আবার সাইকেলে চাপলো তিনজনে। চলে এলো র‍্যাঞ্চের গেটের কাছে। পথের পাশে লম্বা ঘাসের ভেতরে সাইকেল লুকিয়ে রেখে আলাদা হয়ে রওনা হয়ে গেল যার যার পথে। লেবুবনের ভেতরে হারিয়ে গেল রবিন। খোয়া বিছানো পথ ধরেই উত্তরে চলতে থাকলো মুসা। কিশোর চললো মাঠের মধ্যে দিয়ে, কোণাকুণি, বাড়ি আর ওকের বনকে একপাশে রেখে। পাহাড়ে উঠে বাড়িটার পেছন দিকে ম্যানজানিটার একটা ঝোপ খুঁজে পেলো সে। ঢুকে পড়লো তার মধ্যে। ওয়াকিটকি বের করে তৈরি হয়ে বসলো।

'এক নম্বর বলছি,' মৃদুস্বরে বললো সে। 'শুনতে পাচ্ছো, দুই?'

'দুই বলছি,' ভেসে এলো মুসার কণ্ঠ। 'বাড়ির উত্তরে মাঠে চলে এসেছি আমি। বাড়ির ভেতরে পেছন দিকে আলো দেখতে পাচ্ছি। লোক চলাফেরা করছে। তবে কি করছে বুঝতে পারছি না। ওভার।'

'থাকো। চোখ রাখো। তিন নম্বর, তোমার কি খবর?'

'লেবুবাগানের ভেতরে বসে বাড়ির সামনের দিকে নজর রেখেছি,' রবিন জানালো। 'সামনেটা অন্ধকার। ওভার।'

'বসে থাকো,' নির্দেশ দিলো কিশোর। 'ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

পাহাড়ের ঢালে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইলো সে। ওকের জটলার জন্যে বাড়িটা দেখা যায় না। বিকেলের আলোয় যতোটা না ছিলো, তার চেয়ে বেশি রহস্যময় লাগছে গাছগুলোকে চাঁদের আলোয়। ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে চাঁদ, বিচিত্র কালো ছায়া যেন জড়িয়ে যাচ্ছে গাছগুলোর বিকলাঙ্গ শাখাপ্রশাখায়।

খড়খড় করে উঠলো রেডিও।

'দুই নম্বর বলছি,' মুসার কণ্ঠ শোনা গেল। 'এইমাত্র বাড়ির আলো নিভে

গেল। পেছনে খুব সামান্য আলো জ্বলছে। ওভার।'

গাছের নিচের অন্ধকারে কেঁপে উঠলো একটা ছোট্ট আলো। তারপর আরেকটা। আরও একটা।

রেডিওর বোতাম টিপলো কিশোর। 'ওকের জটলার দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। মোমের আলো দেখতে পাচ্ছি আমি।'

অপেক্ষা করতে লাগলো সে। বিকলাঙ্গ ডালের নিচে নড়ছে আলোগুলো। নড়াচড়া থেমে গেল। স্থির হয়ে জ্বলতে থাকলো বাতির শিখা তারপর আরও আলো দেখা গেল।

'কাছে যাচ্ছি আমি,' রেডিওতে দুই সহকারীকে জানালো কিশোর। 'তোমরা যেখানে আছো, থাকো।'

ঝোপের ভেতর থেকে বেরোলো সে। বসে পড়ে সমতল ঢাল বেয়ে পিছলে নেমে চলে এলো গোড়ায়। ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে এলো ওকের জটলার কাছে। মোমের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করতে লাগলো। আলোর কাছে এসে দাঁড়ালো একটা নারীমূর্তি, সরাসরি তাকালো সামনের অন্ধকারের দিকে। থালিয়া ম্যাকাফিকে চিনতে পারলো ও। তাঁর লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। মাথায় জড়িয়েছেন ফুলের মালা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন মোমের চক্রের দিকে।

মিস ম্যাকাফির পেছনে আরেকটা নড়াচড়া দেখা গেল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো আরেক মহিলা। হাতে একটা ট্রে, আতে ফল বোঝাই। সেদিন বিকেলে ওই মহিলাকেই দেখেছিলো মিস ম্যাকাফির সঙ্গে। কিশোর জানে, ও এলিনা ফিউজ। আলোক চক্রের ভেতরে ঢুকে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রাখলো সে।

অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে এলো আরেকটা মুখ, মোমের আলোয় চকচক করছে। লেমিল ডিফ। তিনিও একটা ফুলের মালা জড়িয়েছেন মাথায়। তাঁর শরীরের কোনো অংশই তেমন চোখে পড়ছে না। কালো আলখেল্লা পরে থাকায়। দু'জন মহিলার শরীরও দেখা যায় না। অন্ধকারে মিশে রয়েছে যেন কালো পোশাকে ঢাকা দেহ, শুধু মুখ দেখা যায়।

'আমি চক্র আঁকি,' ডিফ বললেন একঘেয়ে কণ্ঠে। নড়ে উঠলো তাঁর হাত, কালো আলখেল্লার পটভূমিতে ধবধবে শাদা। মোমের আলোয় ঝিক করে উঠলো একটা ছুরির ফলা।

ভূতুড়ে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পিছিয়ে এলো কিশোর। ওই তিনজন যাতে শুনতে না পায় এরকম দূরত্বে এসে রেডিওর বোতাম টিপলো। নিচু স্বরে বললো, 'রবিন, মুসা, আমি রয়েছি মাঠের ঠিক পেছনের জটলাটার মধ্যে। স্যাবাটের আয়োজন করছে ওরা।'

'আমি আসছি,' রবিন জবাব দিলো।

'আমিও,' বললো মুসা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল মুসা। নিঃশব্দে। তারপর গাছের আড়াল

থেকে এপাশে এসে দাঁড়ালো রবিন।

'মোটে তিনজন,' কিশোর জানালো। 'কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হচ্ছে ওরা। লেমিল ডিফের কাছে একটা ছুরি আছে।'

'বুঝতে পেরেছি, ছুরি দিয়ে কি করবে,' রবিন বললো। 'আজ সকালে পড়েছি। মাটিতে একটা চক্র আঁকবে। ডাইনীরা বিশ্বাস করে, চক্র ওদের ক্ষমতা বাড়ায়।'

'দেখি, কি করে,' কিশোর বললো।

গাছের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে কিশোরকে অনুসরণ করলো রবিন আর মুসা। তিনজনেরই বুক কাঁপছে উত্তেজনায়। কি দেখতে পাবে? কতোটা ভয়ংকর হবে অনুষ্ঠান? দেখলো, মোমের চক্রের ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন মানুষ, তিনটে শাদা মুখ শুধু নজরে পড়ছে। একটা পাত্র মাথার ওপরে তুলে ধরলেন মিস ম্যাকাফি। চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন। দম বন্ধ করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা।

তারপর হঠাৎ, আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো মুসা। অন্ধকার থেকে ছায়ার মতো নীরবে বেরিয়ে এসেছে একটা জানোয়ার। তার পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলো ওটা। ওটার গরম নিঃশ্বাস গায়ে লাগছে তার।

চাপা গর্জন করে উঠলো জানোয়ারটা।

আট

'কি হলো?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডিফ। 'কে ওখানে?'

বরফের মতো জমে গেছে যেন ছেলেরা। চাপা গরগর করেই চলেছে জানোয়ারটা।

মুখে হাত রেখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এলিনা ফিউজ। মিস ম্যাকাফি নড়লেন না। শ্বেতপাথরে খোদাই মূর্তির মুখের মতো লাগছে তাঁর মুখটা। কালো আলখেল্লার ভেতর থেকে টর্চ টেনে বের করলেন লেমিল ডিফ। তারপর এগিয়ে এসে আলো জ্বাললেন। কিশোর দেখলো মুসার পাশে দাঁড়ানো জীবটা একটা কুকুর, সেই ডোবারম্যান পিনশারটা, যেটাকে বিকেলে দেখেছিলো। শত্রুকে আটকে রাখার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে কুকুরটাকে, আক্রমণ করার নয়। সে-জন্যেই এতোক্ষণেও মুসার কোনো ক্ষতি করেনি ওটা।

'এই, কি করছো এখানে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডিফ।

কিশোর লক্ষ্য করলো, ম্যানেজারের দৃষ্টি তার দিকে। দমে গেল সে। কি করে বিশ্বাস করাবে, এলিনর হেসের খালাতো ভাই, বিকেলে যে এতো ভদ্র ছিলো, সে এসেছে এখন তাঁর আর দু'জন মহিলার ওপর গুপ্তচরগিরি করতে?

'কে, ডিফ?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস ম্যাকাফি।

'কয়েকটা ছেলে। সম্ভবত মালিবু থেকে এসেছে,' জবাব দিলেন ডিফ। 'শেরিফকে ডেকে ধরিয়ে দেয়া দরকার।'

পাগল হয়ে উঠলো কিশোরের হৃৎপিণ্ড। তাহলে কি লেমিল ডিফ তাকে চিনতে পারেননি?

'এই মিস্টার,' বেয়াড়া ছেলের মতো বললো সে, 'কুত্তাটাকে থামান। এতো গরগর করে কেন?'

'ডিঙ্গো, চুপ কর।'

চুপ হয়ে গেল কুকুরটা।

'বলো এখন, এখানে কি করছো?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ডিফ। 'সরকারী জায়গা নয় এটা, জান না?'

'অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম। পথ হারিয়ে এদিকে চলে এসেছি। এখন আর পথ পাচ্ছি না।'

'লেমিল!' অধৈর্য হয়ে উঠলেন মিস ম্যাকাফি। 'ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এসো এখানে। সারারাত তো বসে থাকা যাবে না।'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন ডিফ। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। তাঁর দিকে এক পা এগোলো কিশোর। তারপর আরেকটু এগিয়ে মিস ম্যাকাফিকে বললো, 'আমরা সত্যিই খুব দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাইনি।' বলতে বলতে একেবারে কাছে চলে এসেছে সে।

'সর্বনাশ করেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো এলিনা। 'চক্রকে অপবিত্র করে দিচ্ছে!'

এগিয়েই চলেছে কিশোর। একেবারে টেবিলের কাছে চলে এলো, যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই মহিলা। বার বার মাপ চাইছে। হাত চলে গেছে বেল্টের কাছে। ওয়াকি-টকির অ্যানটেনা খুলছে। আরেক হাতে রয়েছে রেডিওটা, পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে মহিলাদের চোখের আড়াল করে রেখেছে। সেও টেবিলের কাছে পৌঁছলো, অ্যানটেনাটা খুলে চলে এলো হাতে। তারপর ইচ্ছে করেই হোঁচট খেলো। লম্বা হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মাথা আর হাত আরেকটু হলেই টেবিলের নিচে চলে যেতো।

'লেমিল!' চিৎকার করে উঠলেন মিস ম্যাকাফি।

পলকের জন্যে কিশোরের একটা হাত চলে গেল টেবিলের কালো কাপড়ের তলায়। তারপর হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলো। 'সরি! আমি একটা ইয়ে। বিশ্বাস করুন, আপনাদেরকে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। পথটা কোনদিকে যদি বলতেন...' উঠে দাঁড়ালো সে।

'লেমিল,' মিস ম্যাকাফি বললেন, 'ছেলেগুলোকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে এসো।'

'থ্যাংক ইউ,' মহিলাকে বললো কিশোর।

বনের ভেতর থেকে তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে বের করে আনলেন ডিফ। মাঠের দিকে হাত তুলে দেখালেন। ভালো করেই চেনে ছেলেরা। তার ওপারেই রয়েছে খোয়া বিছানো পথ, এবং সেটা ধরে গেলে কোস্ট হাইওয়ে। 'ওই যে, ওদিকে,' ডিফ বললেন। 'সোজা এগোও, পথ পেয়ে যাবে। কিছুদূর এগিয়ে ডানে মোড়। খবরদার, আর এদিকে আসবে না।'

'না, আসবো না। থ্যাংকস,' মুসা বললো।

লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো তিন গোয়েন্দা। চাঁদের আলোয় আলোকিত। পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিফ।

'আমরা সরে না গেলে ও যাবে না,' রবিন বললো।

'তাকে দোষও দিতে পারি না,' বললো কিশোর। 'ওরকম গোপন অনুষ্ঠান তুমি যদি করতে, অচেনা কাউকে ঢুকতে দিতে? আমি শুধু আল্লাহ আল্লাহ করছি, ও যেন টেবিলের নিচে উঁকি না দেয়। ওয়াকি-টকিটা দেখে না ফেলে।'

'ও, এই কারণ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'এজন্যেই বলা নেই কওয়া নেই, শুকনোর মধ্যে ধড়াম!'

'মনে হলো, অনুষ্ঠানের সময় কি কি বলে ওরা, শোনা দরকার। ভালোই লাগবে হয়তো। বেশি দূর যাবো না। রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে আর কথা শুনতে পাবো না।'

মাঠ পেরিয়ে এসে খোয়া বিছানো পথে উঠলো ওরা। ফিরে তাকালো রবিন। লেমিল ডিফ চলে গেছেন। 'নেই। চলে গেছে।'

একটা ঝোপের ভেতরে এসে ঢুকলো তিনজনে।

'তোমার সেটটা অন করো,' রবিনকে বললো কিশোর। 'শুনি, কোভেন কি বলে?'

ঝোপের ভেতরে বসে রেডিওটা অন করে দিলো রবিন।

'...গেছে,' শোনা গেল লেমিলের কণ্ঠ। 'আর আসতে পারবে না। আসবে বলেও মনে হয় না। কলজেতে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ওদের ডিগু।'

'কুত্তাটাকে কোথাও আটকে রাখা যেতো!' বিড়বিড় করলো কিশোর।

আবার কথা বললেন লেমিল ডিফ, 'ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি।'

'আর কি করা যেতো?' মিস ম্যাকাফির প্রশ্ন।

'পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দিলেই হতো।'

'লেমিল!' চেঁচিয়ে উঠলো একটা মহিলা কণ্ঠ। মিস ম্যাকাফি নন, তারমানে এলিনা ফিউজ। ডিফের কথায় চমকে গেছে।

'বাচ্চাকাচ্চার এসব ছোঁক ছোঁক করা ভালো লাগে না আমার। বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলে দেবে। তার পরই ছুটে আসবে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকের দল। প্রত্যেকটা গাছের পেছনে লুকিয়ে থেকে দেখবে আমরা কি করি। হেডলাইনটা এখনই আন্দাজ করতে পারছি। চিত্রনায়িকার বাড়িতে ডাইনীর পূজা! চোখের পলকে হাজির হয়ে যাবে তখন পুলিশ...'

'পুলিশকে ভয় করার কিছু নেই,' মিস ম্যাকাফি বললেন। 'বেআইনী কিছু করছি না আমরা।'

'এখন করছি না!'

'কখনোই করবো না!'

'আপনি তাহলে চান পুলিশ আসুক? ছেলেগুলোর ওপর আপনার ক্ষমতা খাটানো উচিত ছিলো, জিটার কার্লোসের ওপর যেমন খাটিয়েছিলেন।'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস ম্যাকাফি। 'আমি কিছুই করিনি! আমার

সঙ্গে বেঈমানী করার পরেও না!'

'না, তা তো করেনইনি!' ব্যঙ্গ করে বললেন ডিফ। 'তার দীর্ঘ জীবন আর সুখই কামনা করেছিলেন শুধু!'

'লেমিল, থামো, প্লীজ!' অনুনয় করলো এলিনা।

কিন্তু মিস ম্যাকাফি চুপ করলেন না; বলতে লাগলেন, 'বার বার একই কথা বলো তুমি, একই প্রসঙ্গ তোলো!' খুব রেগে গেছেন তিনি। 'জিটারের ওপর রেগে গিয়েছিলাম আমি, ঠিকই, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করিনি। কারো ক্ষতি করতে আমার ক্ষমতা ব্যবহার করি না আমি, ভালো করেই তুমি জানো। আর এজন্যেই এভাবে কথা বলতে সাহস করো!'

'লেমিল, প্লীজ!' আবার অনুরোধ করলো এলিনা।

বিড়বিড় করে কি বললেন ডিফ, বোঝা গেল না। তারপর বললেন, 'আর এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। অনুষ্ঠান আর হবে না। চলুন, ঘরে চলুন।' গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'ডিগু! এই ডিগু!'

'কুত্তাটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে হতো,' এলিনা বললো। 'ছেলেগুলো যদি আবার ফিরে আসে?'

'আসবে না। বাইরে ছেড়ে রাখলেও শান্তি নেই। সারারাত বনের ভেতর ঘোরাফেরা করবে, চেঁচাবে, বিরক্ত করে ফেলবে। ঘুম থেকে উঠে গিয়ে তখন ধরে আনতে হবে আমাকেই। এতো কষ্ট করতে পারবো না। কুত্তা কুত্তাই। বেশি চালাক হলেও খারাপ, বোকা হলেও খারাপ।'

আর কোনো কথা শোনা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভারি দম নিলো কিশোর। 'লেমিল চেয়েছে আমাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করুন মিস ম্যাকাফি, যেভাবে জিটার কার্লোসের ওপর করেছিলেন,' বললো সে। 'ভাবছি, জিটারকে কি করেছিলেন তিনি?'

'কিছুই না, তাই তো বললেন,' রবিন মনে করিয়ে দিলো। 'তিনি বলেছেন, কারো কোনো ক্ষতি কখনও করেননি।'

'মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে জিটার,' মুসা বললো। 'রাতে পার্টি থেকে ফেরার পথে তার গাড়ির ব্রেক ফেল করেছিলো।'

'সেটা কি পার্টিই ছিলো?' কিশোরের প্রশ্ন। 'নাকি আজকের রাতের মতো কোনো অনুষ্ঠান? একটা ব্যাপারে আমরা এখন শিওর মিস ম্যাকাফি একজন ডাইনী। কিংবা তিনি মনে করেন তিনি ডাইনী। বিশ্বাস করেন, কোনো ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।'

'এতোই ক্ষমতা...একেবারে মানুষ খুন করে ফেলতে পারেন!' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেছে মুসার।

'জাদুর সাহায্যে খুন!' মাথা নাড়লো রবিন। 'অসম্ভব!'

'হয়তো,' কিশোর বললো। 'তবে মহিলার কথা থেকে বোঝা যায় জিটার কার্লোসের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা অপরাধবোধ রয়েছে তাঁর মধ্যে। জাদুর জোরে না হলেও অন্য কোনোভাবে কিছু একটা ক্ষতি তিনি করেছেন।'

'ওই লেমিল ডিফটা এতো খোঁচাখুঁচি করে কেন?' মুসা বললো, 'ইচ্ছে করেই যেন রাগিয়ে দিয়ে কথা বলায়। নাহলে ওভাবে অতীতের কথা খুঁচিয়ে বের করার কোনো মানে হয় না।'

'হয়তো সুযোগ নিচ্ছে। সারা বাড়িতে কাজের লোক বলতে তো ওই একজনই। সেই ক্ষমতাটাই ফলাচ্ছে আর কি।'

'লোকটাকে ভালো লাগেনি আমার।'

'আমারও না। মিস ম্যাকাফির প্রাইভেসি রক্ষার জন্যে মিথ্যে বলে থাকতে পারে। আর যে লোক অন্যকে বাঁচাতে মিথ্যে বলতে পারে, সে নিজেকে বাঁচাতে আরও বেশি পারবে।'

'কিশোর!' বলে উঠলো রবিন, 'পাণ্ডুলিপি চুরিতে তার হাত নেই তো?'

'কেন করবে, কিভাবে করবে বুঝতে পারছি না। নিজে সেটা চুরি করতে পারবে না, এই জন্যে যে, তখন হেনরি ফগের সঙ্গে ইন্টারভিউ চলছিলো তার। আর চুরির কোনো মোটিভও নেই। বরং উল্টোটা হলেই তার লাভ বেশি। মিস ম্যাকাফির বিজনেস ম্যানেজার সে। ব্যবসার একটা পার্সেন্টেজ নিশ্চয় পায়। বইটা ছাপা হলে, বিক্রি হলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও টাকা পাবে। তবে কারো সঙ্গে বইটা নিয়ে আলোচনা করে থাকতে পারে। মিস ম্যাকাফিও করতে পারেন। আজ রাতে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, ওই পাণ্ডুলিপি চুরির জবাব লুকিয়ে রয়েছে মিস ম্যাকাফির অতীত জীবনে।'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'যতোটা পারলাম করলাম। আজ রাতে আর কিছু করার নেই। ওয়াকিটকিটা আনতে যাচ্ছি আমি। সাইকেলগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াও। কাল···আগামী কাল কোভেনের ব্যাপারে তদন্ত চালাবো আমরা।'

'যদি মিস ম্যাকাফি সত্যিই কোভেন পরিচালনা করে থাকেন,' রবিন বললো।

'করেছেন, আমি নিশ্চিত।' রওনা হয়ে গেল কিশোর, মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো বিকলাঙ্গ ওকের ভূতুড়ে বনের দিকে।

নয়

'যাহ্, কি বলছো!' বিশ্বাস করতে পারছে না উলফ হেস। 'মিস ম্যাকাফি সত্যিই ডাইনী?'

সান্তা মনিকা বুলভার ধরে গাড়ি চালাচ্ছে সে। পাশে বসে রয়েছে কিশোর। পেছনের সীটে বসেছে রবিন আর মুসা।

'আগে কি ছিলেন জানি না,' কিশোর বললো। 'তবে এখন তিনি ডাইনী। আমার তো মনে হচ্ছে সিনেমায় যখন অভিনয় করতেন তখনও এর চর্চা চালিয়েছেন। আমরা ভাবছি, একটা কোভেন পরিচালনা করেছেন তিনি। সদস্যদেরই কেউ হয়তো এখন চাইছে না তাঁর স্মৃতিকথাটা বেরোক, তাহলে সবাই সব কিছু জেনে যাবে। নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে না সেই লোক। তাঁর ঘনিষ্ঠ যেসব মানুষ ছিলেন একসময়, তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবো আমরা,

কথা বলবো। গত দু'দিনে মিস ম্যাকাফির গতিবিধি কি ছিলো, জানবো। পাণ্ডুলিপিটা আগে কোথায় ছিলো, এখন কোথায় আছে তা-ও হয়তো বলতে পারবে কেউ।'

'জানলেই কি স্বীকার করবে নাকি,' বললো তরুণ প্রকাশক। 'যদি চুরি করে থাকে?'

'প্রথমে পাণ্ডুলিপিটার কথা তুলবোই না। আগে জানার চেষ্টা করবো কোভেনের কোন মানুষটা এখনও মিস ম্যাকাফির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। কিংবা তাঁর সংবাদ জানতে আগ্রহী। একথা বলতে মনে হয় কারো আপত্তি থাকবে না। অন্তত থাকার কথা নয়।'

উত্তরে মোড় নিয়ে লা ব্রিয়া অ্যাভেনিউ ধরে হলিউডে চললো উলফ। 'শুরুতে তাহলে হেনরি ফগের সাথেই কথা বলতে চাও? ফগ, ক্রাইম রিপোর্টার। লোকটাকে দেখে খুবই ভালো মনে হলো। সে এসব কোভেন ফোভেনে জড়াবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'সব সময় সে ক্রাইম রিপোর্টার ছিলো না। অভিনেতা ছিলো। মিস ম্যাকাফির শেষ ছবিটাতে অভিনয়ও করেছে। জিটার কার্লোসকে তার চেনার কথা। আর তার সাথে কথা বলাটাই এখন সহজ, কারণ কোথায় পাওয়া যাবে জানি। হারভে ভিডিওর অফিসে, যেটার একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কে এল এম সি স্টেশন। হলিউড বুলভারের ফাউনটেইন স্ট্রীটে অফিসটা। আজ সকালে ফোন করেছিলাম। দেখা করবে কথা দিয়েছে।'

'কি ব্যাপারে কথা বলতে চাও বলেছো?'

'না, তেমন ভাবে বলিনি। বলেছি ইস্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা প্রতিবেদন করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই পাবলিসিটি পছন্দ করে ফগ,' পেছনের সীট থেকে বললো মুসা। 'এমনকি ইস্কুলের কাগজেও নাম ছাপাতে রাজি।'

'আসলে, ওভাবে ভাবলে, সবাই আমরা পাবলিসিটি পছন্দ করি,' কিশোর বললো। 'কোন্ লোক চায় না তার নাম ছাপার অক্ষরে বের হোক, লোকে জানুক?' উলফের দিকে তাকালো সে। 'আমাদের এনে খুব উপকার করলেন। নইলে বাসে আসতে হতো।'

'এসে আমারও লাভ হয়েছে। বাড়িতে থাকলে পাণ্ডুলিপির চিন্তায় পাগলই হয়ে যেতাম।' উলফ বললো। 'অফিস নেই। সারাদিন ওখানে থেকে থেকে অভ্যেস হয়েছে। নেই বলে এখন মনে হয় একেবারে বাস্তুহারা হয়ে গেছি। তাছাড়া তোমাদের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে আমার। হেনরি ফগের মতো লোকের মুখোমুখি হতেও আর ভয় পাই না এখন।'

হেসে উঠলো রবিন। 'কিশোরের সাথে থাকলে ওরকমই হয়। কাউকে ভয় পায় না ও।'

'জাদুচক্রের অন্য লোকগুলোকে খুঁজে বের করবে কিভাবে?' জানতে চাইলো উলফ।

জবাব দিলো মুসা, 'আমার বাবা একটা ফিল্ম স্টুডিওতে ক   করে। ঠিকানাগুলো জেনে দেবে বলেছে।'

হলিউড বুলভারে পৌঁছলো গাড়ি। সাবধানে চালাচ্ছে এখন উলফ। ডানে মোড় নিয়ে ফাউনটেইন স্ট্রীটে পড়ে কিছুদূর এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামলো। দেখে মনে হয় যেন গাঢ় রঙের কাঁচের একটা বিশাল ছক্কা ওটা। 'আমরা এখানেই আছি। তুমি যাও।'

'আচ্ছা,' বলে নেমে পড়লো কিশোর। ঘুরে বাড়িটার দিকে রওনা হলো।

রিসিপশন রুমটা ঠাণ্ডা। পোলারাইজড কাঁচ দিয়ে বাইরের রোদ আর উত্তাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডেস্কে বসে রয়েছে এক মহিলা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামী। কোথায় যেতে হবে বলে দিলো কিশোরকে।

এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠতে লাগলো কিশোর।

সুন্দর সাজানো গোছানো অফিস হেনরি ফগের। ঘরের ভেতরে কাঁচ আর ক্রোমের অভাব নেই। চেয়ার সোফার গদি সব কালো চামড়ায় মোড়া। জানালাগুলো সব উত্তরমুখো, হলিউড হিলের দিকে। সেগুন কাঠের টেবিলের ওপাশে বসে রয়েছে ফগ, পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে। কিশোরকে দেখে হাসলো। 'এসো এসো। তোমার মতো ইয়াং ম্যানদের আমি খুশি হয়েই সাহায্য করি।'

কিশোরের মনে হলো, এরকম মন ভোলানো কথা আগেও হাজারবার বলেছে লোকটা। সে-ও ভদ্রভাবে বললো, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' নিরীহ মুখভঙ্গি করে তাকিয়ে রয়েছে ফগের দিকে, বোকা বোকা করে তুলেছে চেহারাটাকে। 'কাল সকালে আপনাকে টিভিতে দেখলাম। থালিয়া ম্যাকাফির এস্টেটে গিয়ে লেমিল ডিফের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। অবাকই লেগেছে! ভাবতেই পারিনি, আপনি অভিনেতা ছিলেন। মিস ম্যাকাফিকে চেনেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে।'

পলকে উধাও হয়ে গেল ফগের হাসি। 'মিস ম্যাকাফিকে চেনা আর অভিনয় করার চেয়ে অনেক জরুরী কাজ আছে দুনিয়ায়।' ঝটকা দিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে তাকালো বইয়ের তাকের দিকে। 'করেছিও। ওগুলোই তার প্রমাণ।'

তাকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। বইয়ের তাকে বই ছাড়াও রয়েছে নানারকম প্লাক, মেডালিয়ন, উপকূলের উজান-ভাটি সমস্ত শহর থেকে পাওয়া। ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা আর অ্যারিজোনার বিভিন্ন ছোটবড় শহরের পুলিশ প্রধানদের সাথে দাঁড়িয়ে তোলা ফগের ছবি আছে অসংখ্য। ফ্রেমে বাঁধাই পার্চমেন্টের ওপরে লেখা একটা বক্তব্য বলে দিচ্ছে শেরিফের পসিতেও একজন অনারারি মেম্বার সে।

'আরিব্বাবা!' এমন একটা ভঙ্গি করলো কিশোর, যেন ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেছে।

'কিছু স্ক্র্যাপবুকও আছে,' খুশি হয়ে বললো ফগ। 'ইচ্ছে করলে দেখতে পারো।'

'নিশ্চয় দেখবো,' আগ্রহ দেখালো কিশোর। 'শুনলাম ড্রাগ অ্যাবিউজেও নাকি অনেক কাজ দেখিয়েছেন। সাংঘাতিক লোক আপনি!'

গলে গেল ফগ। লাল হয়ে গেল চেহারা। 'হ্যাঁ, কিছু কিছু কাজ করেছি। এর ওপরে টিভিতে একটা সিরিজ করারও ইচ্ছে আছে। শুনলে অবাক হবে, বড় বড় ওষুধ কোম্পানিও আজকাল ড্রাগ চোরাচালানে অংশ নিচ্ছে। সবই খুঁচিয়ে বের করবো আমি। তবে এ বছর আর হবে না। অন্য ব্যাপারে ইন্টারেসটেড হয়ে উঠছে প্রডিউসার। টাকা খরচ কিসে করতে চায় জানো? পুরনো সিনেমার ওপর। ড্রাগ স্মাগলিঙের মতো একটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজের চেয়ে তার কাছে জরুরী হলো কিনা পুরনো মুভি!'

'যার যা পছন্দ। শুনলাম মিস থালিয়া ম্যাকাফির পুরনো ছবিগুলো নাকি খুবই দামী।'

'ডাকাতেরা যে টাকা দাবি করেছে, সেটা মিটিয়ে দেয়া হলে আরও দামী হয়ে যাবে ওগুলো।'

'আপনার কপালই খারাপ,' কিশোর বললো। 'অতো টাকা খরচ করার পর আর ড্রাগের ওপর সিরিজ করতে হয়তো রাজি হতে চাইবে না প্রযোজক। তবে আপনার জন্যে পুরোপুরি খারাপ খবর নয় ওটা। পাবলিসিটি হবে। কারণ একটা ছবিতে আপনিও অভিনয় করেছেন।'

'বাজে ছবি! দি অ্যাজফোডেল স্টোরি! এমনই ফ্লপ করেছিলো, ওটাতে অভিনয় করায় একেবারে বদনাম হয়ে গেল। আর কোনো ছবিতে চান্সই পেলাম না। তার পরেই তো অন্য কাজ খুঁজতে আরম্ভ করলাম। ভালোই হয়েছে, ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে উন্নতি করেছি।'

'আপনার হয়েছে, মিস ম্যাকাফির হয়নি।' কোনো কথাই পেটে রাখতে পারে না, এমন ভান করে বলতে লাগলো কিশোর, 'ছবিটা ফ্লপ করায় আর কোনো কাজ পাননি তিনিও। অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমার চাচী বলে, মিস ম্যাকাফি নাকি বেশ রহস্যময় মহিলা। লোকে নাকি নানা কথা বলে, তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে। কোভেন-টোভেন কি কি সব বলে।'

'কোভেন?' সতর্ক হয়ে উঠলো ফগ। যেন শত্রুর গন্ধ পেয়ে গেছে, কঠিন হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'কোভেন হলো গিয়ে ডাইনীদের একটা টিম।'

'হ্যাঁ, টিম, শুনেছি। আচ্ছা, আপনি তো মিস ম্যাকাফির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। সত্যিই কি কোভেন ছিলো?'

'মোটেও না! আমি যতদূর জানি, ওরকম কোনো কিছুই ছিলো না। মিস ম্যাকাফির বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে পার্টি অবশ্য দিতো মাঝে মাঝে, যাদের সাথে কাজ করেছে।'

'তাদেরকে চেনেন?'

'চিনি। আমিও তাদের একজন।'

'আপনি জানেন না এমন কিছু ওরা হয়তো জেনে থাকতে পারে।' স্থির দৃষ্টিতে ফগের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'তাদের সাথে যোগাযোগ আছে আপনার? জানেন কোথায় পাওয়া যাবে? মিস ম্যাকাফির সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?'

'কোনোটাই পারবো না! ওদের সাথে বহুদিন যোগাযোগ নেই আমার। কিছু বন্ধু আছে আমার যারা পুলিশে ঢুকে পড়েছে। মিস ম্যাকাফির সাথে দেখা হয় না আমার প্রায় তিরিশ বছর। আরও তিরিশ বছর দেখা না হলেও কিছু এসে যায় না। বদমেজাজী, নষ্ট হয়ে যাওয়া একজন অভিনেত্রী সে। ভিটার কার্লোসের মতোই, যার সাথে তার এনগেজমেন্ট হয়েছিলো। সাংঘাতিক বাজে লোক ছিলো!'

'মিস ম্যাকাফির বাড়ির পার্টি থেকে ফেরার পথে মারা গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তাই না?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ যেন বয়েস অনেক বেড়ে গেছে ফগের, অন্তত আসল বয়েসটা বোঝা যাচ্ছে। ভাঁজ পড়েছে চোখের কোণে, বোধহয় রেগে যাওয়াতেই। 'পার্টির পরে।'

সোজা হয়ে গা ঝাড়া দিলো সে। পানি ফেলার জন্যে কুকুর যেমন করে ঝাড়ে অনেকটা তেমনি ভঙ্গিতে। সে যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইছে একটা বাজে স্মৃতি। 'সেটা অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। আজকাল আর ওসব নিয়ে ভাবি না। আসলে ভাবতে চাই না। কে যায় অতীত নিয়ে মাথা ঘামাতে! আর মিস ম্যাকাফিকে নিয়েই বা এত্তো কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি তো এসেছো ক্রাইম-ফাইটিং প্রোগ্রামের কথা জানতে।'

'আমি এসেছি মিস থালিয়া ম্যাকাফির খোঁজখবর জানতেই,' সহজ ভাবে বলে ফেললো কিশোর। 'ফিল্মের ইতিহাস নিয়ে একটা গবেষণা করছি। ভালো করে লিখতে পারলে ইস্কুলের জার্নালে ছাপা হবে।'

হেনরি ফগের চেহারাই বলে দিলো বিরক্ত হয়েছে, নাড়া খেয়েছে খুব। 'আর কোনো কথা না থাকলে এবার এসো,' শীতল কণ্ঠে বললো সে। 'আমার কাজ আছে। আর সময় দিতে পারছি না, সরি। জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'বুঝেছি।' উঠলো কিশোর। ফগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

'হলো কিছু?' কিশোর গাড়িতে উঠলে জিজ্ঞেস করলো উলফ।

'মিস ম্যাকাফিকে দেখতে পারে না ফগ। তাঁর ছবি টেলিভিশনে দেখানো হবে, এটাও ভালো লাগছে না তার। ড্রাগের ওপর সিরিজ করে টাকা নষ্ট করতে রাজি নয় এখন হারভে ভিডিও, কারণ মিস ম্যাকাফির ছবির পেছনেই অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে। মিস ম্যাকাফির সঙ্গে তিরিশ বছর যোগাযোগ নেই ফগের, তাঁর কোনো বন্ধুর সাথেও দেখাসাক্ষাৎ নেই। কোভেনের কথাও অস্বীকার করলো সে। অন্যান্য ব্যাপারে হয়তো সত্যি কথাই বলেছে সে, তবে মনে হলো কোভেনের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু রয়েছে তার আচরণে। কী, সেটা বুঝলাম না।'

পেছনের সীটে থেকে হাসলো মুসা। 'তুমি বোঝনি একথা? বিশ্বাস করতে বলো? না বুঝলেও নিশ্চয় আন্দাজ করেছো। ও-ব্যাপারে তুমি ওস্তাদ। জিজ্ঞেস করলে বলবে না, তাই করলাম না। এই যে, আরও কাজ জোগাড় করে দিলাম। তুমি যাওয়ার পর বাবাকে ফোন করেছিলাম। একটা ঠিকানা বের করে ফেলেছে।

মিস ম্যাকাফির প্রিয় ক্যামেরাম্যান হ্যারি ব্যানারের ঠিকানা। এখন আর ক্যামেরার কাজ করে না। মেলরোজে টেলিভিশন মেরামতের দোকান খুলেছে। চলো, সেখানেই যাই।'

দশ

হ্যারি ব্যানারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গল্প বানিয়ে বলতে হলো না তিন গোয়েন্দাকে। কারণ ভূতপূর্ব ক্যামেরাম্যানের কাছে যাওয়ার পথে কোনো রিসিপশনিস্ট বাধা হয়ে নেই। ধুলোয় ঢাকা ছোট দোকানটায় ঢুকে পড়লো ওরা। দেয়ালে সরু একটা ফোকর দেখা গেল, একপাশে একটা নাপিতের দোকান, আরেক পাশে জমা হয়ে আছে সোফা মেরামতকারীর ফেলে দেয়া বাতিল ছোবড়া, স্প্রিং, এসব। ফোকরের ওপাশে খোড়লে বসা লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি মিস্টার ব্যানার না? মিস ম্যাকাফির প্রিয় ক্যামেরাম্যান?'

হালকা-পাতলা মানুষ ব্যানার। চামড়ায় কেমন হলুদ আভা। ঠোঁটে সিগারেট। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে বদ্ধ জায়গাটা। তার ভেতর দিয়ে চোখ সরু করে তাকালো লোকটা। 'তোমরা নিশ্চয় পুরনো ছবির ভক্ত?'

'অনেকটা তাই।'

হেসে একটা কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ক্যামেরাম্যান। 'মিস ম্যাকাফির সাথে আমি কাজ করেছি, তার প্রতিটি ছবিতেই। সাংঘাতিক অভিনয় করতো। হিংসে করার মতো!'

সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে ফেললো ব্যানার। 'সুন্দরীও ছিলো। বেশ কিছু নায়িকা ছিলো তখন, গ্ল্যামার কুইন। ক্যামেরায় তাদের ছবি তোলার সময় লাইটিংটা এমন ভাবে করতে হতো, যাতে প্রতিটি শটই ভালো হয়। নইলে খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। করতে করতে তিতিবিরক্ত হয়েই কিন্তু ওকাজ ছেড়ে এসেছি। এতো কষ্ট করতাম, তার পরেও অভিযোগ লেগেই থাকতো–আমাকে ঠিক ক্লিওপেট্রার মতো লাগছে না, নীলের রানীর মতো লাগছে না! কিন্তু থালিয়ার ছবি তুলতে ওসব কোনো ঝামেলাই ছিলো না। যেভাবেই তুলতাম, সুন্দর। আসলে সত্যিকারের সুন্দরী ছিলো সে। তাই তার ছবি তুলতেও ভালো লাগতো।'

'তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কেমন লাগতো?'

'কাজের নিজস্ব ধরন ছিলো তার। অন্যের কথা খুব একটা শুনতে চাইতো না, প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর। কিসব উদ্ভট ভাবনা ঢুকলো মাথায়। সেই জন্যেই তো ডাইনী নিয়ে তৈরি ওই ভয়াবহ বিচ্ছিরি ছবিটাতে অভিনয় করতে গেল!'

'দি অ্যাজফোডেল স্টোরি?'

'হ্যাঁ। জিটার কার্লোসের ধারণা ছিলো ছবিটা খুব ব্যবসা-সফল হবে, দুর্দান্ত ছবি। থালিয়া তখন জিটার বলতে অজ্ঞান। তাই কোনো কিছু বাছবিচার না করেই ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়ে গেল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম

তার ক্যারিয়ারের কথা ভেবে। নষ্ট না করে ফেলে।'

'তাই তো করেছিলেন?' মুসা বললো, 'জিটার কার্লোসই সর্বনাশ করে দিয়ে গেছেন তাঁর, তাই না? ভদ্রলোক মারা গেলে এতো ভেঙে পড়েন মিস ম্যাকাফি, যে আর অভিনয়ই করতে পারলেন না।'

'এ-ব্যাপারে অবশ্য নিজেকেই দোষ দেয় থালিয়া। গাড়িতে চড়ার আগে জিটারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলো সে। বাজে কথা বলে গালাগাল করেছিলো। তবে এর জন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না। এনগেজমেন্ট হওয়ার পরে আরেকজন নায়িকার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করেছিলো জিটার। মেয়েটার নাম জুন উইডমার। এতে জেলাস হয়ে ওঠে থালিয়া। তোমরা ওর নামে ফ্যান ক্লাব করো, কিংবা পত্রিকায় লেখ, যাই করো, এই অংশটা ভুলে যেও দয়া করে। পুরনো কলঙ্ক খুঁচিয়ে বের করে দুর্গন্ধ ছড়ানোর কোনো মানে নেই।'

'আজকাল কি আর মিস ম্যাকাফির সাথে দেখা হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'কথাটথা হয়?'

'না। কেউ তার সাথে দেখা করতে যায় না। তার সাথে কারো যোগাযোগ নেই।'

লাইব্রেরিতে পাওয়া ছবিটা বের করে দেখালো রবিন। ফটোকপি করে এনেছে। 'এখানে আছে। নিশ্চয় জুন উইডমার মিস ম্যাকাফির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। নইলে ডিনার পার্টিতে দাওয়াত পেতো না।'

'ও, এটা?' রবিনের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখলো ব্যানার। 'এটা জাদুচক্র। সবাই ছিলাম এতে। পুরো তেরোজন।'

'ডিনার টেবিলে তেরোজন কেমন অদ্ভুত না?' কিশোর বললো, 'আনলাকি থারটিন।'

হাসলো ব্যানার। 'না, আনলাকি নয়, যদি তারা জাদুকর হয়।'

প্রায় চিৎকার করে উঠলো রবিন, 'তাহলে কোভেন একটা ছিলো!'

শব্দ করে হাসলো ব্যানার। 'শিওর। কেন থাকবে না? থালিয়া ছিলো ডাইনী, অন্তত ভাবতো সে ডাইনী। ডাইনী শব্দটা অবশ্য খারাপ লাগতো তার, সেজন্যে বলতো ওল্ড রিলিজিয়নের অনুসারী। মাঝে মাঝে বলতো জাদুকরী। ঝাড়ুর ডাণ্ডায় বসে উড়াল দেয়া কিংবা শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দেয়ার মতো ব্যাপার নয় এটা। তবে সে ভাবতো কোনো ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। তার কথামতো কাজ করে যেতাম আমরা। সে ছিলো নায়িকা। তার কথা শুনতে বাধ্য হতাম আমরা, কাজ টিকিয়ে রাখার জন্যে। কোভেনের সদস্য হলাম। জুন উইডমার, মার্থা কলিনস, পলি ফ্রেনটিস, এমনকি বেচারি এলিনা ফিউজও হয়ে গেল ডাইনী।'

'আর হেনরি ফগ?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'সে-ও। এখন এটা জানাজানি হওয়াটা অবশ্য পছন্দ করবে না সে। টেলিভিশনে বেশ সুনাম কামিয়েছে। তবে একসময় জাদুকর ছিলো ও-ও।'

কিশোর হাসলো। 'কোভেনের অন্যান্য লোকের সাথে যোগাযোগ আছে

আপনার?'

'কয়েকজনের সাথে। আজকাল শুধু পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব ফগের, তাই পুরনো বন্ধুরা কেউ তার কাছে যায় না। বেচারি জুন-থালিয়া আর জিটারের মাঝে গণ্ডগোলের যে হোতা, তার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। প্রতিভা ছিলো না, কাজেই সুবিধে করতে পারেনি। এখন তো বুড়িয়ে গিয়ে দেখতে একেবারে দাদী হয়ে গেছে আমার। হলিউডে একটা কমদামী মোটেল চালাচ্ছে। মানুষ হিসেবে খারাপ না।'

'তার সাথে কথা বলতে গেলে বলবে?'

'বলবে। লোকে তাকে দাম দিলে খুব খুশি হয়। এই, তোমরা আসলে কাজটা কি করছো? ফ্যান ম্যাগাজিন?'

'সিনেমার ইতিহাসে আগ্রহী আমি। ইস্কুলের জন্যে…'

'ও।' রবিনের দেয়া ছবিটা হাতেই রয়েছে। আরেকবার দেখলো ব্যানার। 'জুন উইডমারের ঠিকানা দিচ্ছি। রালফ স্মিথের ফোন নম্বরও আছে আমার কাছে। চমৎকার লোক। আশি বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখনও ফিল্ম ছাড়েনি। কাজ করে যাচ্ছে। তাকে ফোন করলে আমার কথা বলো।'

'আর বাকিরা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'জিটার কার্লোস মারা গেছে। এলিনার সাথে কিভাবে কথা বলবে বুঝতে পারছি না। থালিয়ার সাথে থাকে সে। কারো সাথে দেখা করে না ওরা। স্ক্রিপ্টরাইটার জন ভোরটেক্স মারা গেছে। বছর কয়েক আগে, হার্ট অ্যাটাকে। পলি ফ্রেনটিসের কথা ভুলে যাও। দেখা হবে না তার সাথে। কোনো এক কাউন্ট না ডিউককে বিয়ে করে ইউরোপ চলে গেছে। আর ফেরেনি। মার্থা কলিনসও চলে গেছে হলিউড থেকে। তার জন্মস্থান মনটানার বিলসভিলের একটা ছেলেকে বিয়ে করে ওখানেই গিয়ে ঘর বেঁধেছে। আর শেরিনা থারগুড…সে-ও গেছে।'

'লম্বা চুলওয়ালা সুন্দর মেয়েটা, তাই না?' মুসা জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে তার?'

'মালিবু বীচে একদিন সাঁতার কাটতে গিয়ে জোয়ারের টানে পড়েছিলো। ডুবে মারা গেছে।'

'হায় হায়! কোভেনের তিনজন মরেই গেল!'

'ছবিটা নেয়া হয়েছে অনেকদিন আগে। অনেক বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। সবাই মোটামুটি ভালোই আছি, মৃতদেরকে বাদ দিলে। ও, জিটার কার্লোসের সেক্রেটারি লিলি অ্যালজেডোও বেঁচে আছে। সেনচুরি সিটিতে এক ব্রোকারের অফিসে চাকরি করে। দেখা হয় প্রায়ই। ডিনারে নিয়ে যাই।'

ছবিটা হাতে নিয়ে দেখলো কিশোর। একটা লোককে দেখালো, যার নাম চার্লস গুডফেলো। খুবই পাতলা শরীর, কালো চুল ঝুলে পড়েছে ঘাড়ের ওপর। 'পরিচিতই লাগছে। এখনও কি সিনেমায় কাজ করে?'

ভ্রূকুটি করলো ব্যানার। 'গুডফেলো? ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সিনেমায় চরিত্রাভিনেতা ছিলো। এই যেমন ট্যাক্সি ড্রাইভার, দারোয়ান, এসব। পুরনো

সিনেমা খুব বেশি দেখে থাকলে তাকে না দেখার কথা নয়। ওর কি হয়েছে বলতে পারবো না। এই একটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমার। আর ও এমনই এক মানুষ, যাকে সহজেই ভুলে যাবে লোকে। আমার শুধু মনে আছে, ও আমেরিকান। ছোটবেলাটা ওর হল্যাণ্ডে কেটেছে মা-বাবার সঙ্গে। আজব লোক। কথায় কথায় রেগে যেতো। এক স্যাবাটে একই কাপ থেকে পানি আর মধু খেতে বলায় তো ওর মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। বাধ্য হয়ে মুখে নিতো, কিন্তু একটু পরেই উঠে গিয়ে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে আসতো।'

হেসে উঠলো ছেলেরা।

'আপনি কিন্তু ডাইনীর কোভেনের মতো একটা ভয়ানক ব্যাপারকে হাস্যকর করে দিচ্ছেন,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর।

'ভয়ানক না ছাই! সব ছেলেমানুষী। জিটার মারা যাওয়ার পর অবশ্য কেউ কেউ ভয় পেয়ে যায়। বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে এর মধ্যে কিছু আছে।'

'মিস ম্যাকাফি কি জিটারকে অভিশাপ দিয়েছিলেন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ব্যানার। 'বলা হয়তো ঠিক হবে না। তা দিয়েছিলো…ওই আর কি, রেগে গেলে লোকে যেমন শাপশাপান্ত করে। থালিয়া বলেছিলো, রাস্তায় পড়ে মরুক জিটার। এটা একটা কথার কথা। সিরিয়াস ভাবার কোনো কারণ নেই। সে একথা বলার পর পরই গাড়িতে চড়ে জিটার। চলে যায়। পথে ব্রেক ফেল করে গাছের সাথে ধাক্কা খায় গাড়ি। তখনকার দিনে গাড়িতে সীটবেল্ট থাকতো না। উড়ে গিয়ে বাইরে পড়ে জিটার। আমরা তাকে পেয়েছি গাছের একটা দোডালার ফাঁকে, মাথা একদিকে পা আরেক দিকে করে ঝুলে ছিলো। ঘাড় ভেঙে গিয়েছিলো।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা।

'তার পরে কোভেন ভেঙে গেল। নির্বাসিত জীবন বেছে নিলো থালিয়া। সেই আমাদের শেষ দেখা। কারো সঙ্গেই এখন দেখা করে না ও।'

'ম্যানেজারের ব্যাপারটা কি বলুন তো? এককালে তো তাঁর শোফার ছিলো লোকটা,' কিশোর জানতে চাইলো।

'তাকে ভালোমতো চিনিই না আমি,' বলে কাউন্টার থেকে একটা প্যাড তুলে নিলো ব্যানার। তাতে জুন আর লিলির ঠিকানা, রালফ স্মিথের ফোন নম্বর লিখে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিলো।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ছেলেরা। তখনও কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো ব্যানার। চোখে কেমন শূন্য দৃষ্টি।

'ভালো লোক,' বাইরে বেরিয়েই বললো মুসা। 'কথা বলতে ভালোবাসে।'

'তা ঠিক,' কিশোর বললো। 'তবে আমার মনে হয় তার কিছু পুরনো বাজে স্মৃতিতে নাড়া দিয়ে এলাম। জিটারের কথা বলার সময় কিরকম চোখমুখ হয়ে গেছিলো লক্ষ্য করেছো? যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লাশটা। ডালের একপাশে মাথা, আরেক পাশে পা ঝুলে রয়েছে। ঘাড় ভাঙা।'

এগার

হলিউড বুলভারের একটা সাইড স্ট্রীটে জুন উইডমারের মোটেল। বেল বাজালো রবিন। দরজা খুলে দিলো একজন বয়স্কা মহিলা। কোঁকড়া সোনালি চুল। কালো কুচকুচে চোখের পাপড়ি।

'মিস উইডমার?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হ্যাঁ।' এমন ভাবে সরু করে ফেলেছে চোখ, যেন চশমার প্রয়োজন মহিলার।

'হ্যারি ব্যানার বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হবেন। ইস্কুলের একটা পত্রিকা বের করছি আমরা। তাতে পুরনো সিনেমার ইতিহাস নিয়ে বেশ বড় একটা প্রতিবেদন করবো।'

'ভালো, খুব ভালো,' মহিলা বললো। 'তোমাদের সাথে কথা বলতে আপত্তি নেই আমার।' দরজাটা হাঁ করে খুলে দিলো। ছোট, বদ্ধ ঘরটায় ঢুকলো ছেলেরা, যেটায় আংশিক অফিস, আংশিক লিভিং রুম। ওরা বসতেই পুরনো দিনের ফিল্ম জীবনের গল্প শুরু করে দিলো মহিলা। কিশোরী বয়েসে হলিউডে এসেছিলো। এক পরিচালককে ধরে স্ক্রীন টেস্ট দেয়। তারপর থেকে ছোটখাটো রোলে অভিনয় করতে থাকে। কয়েকটা বড় রোলেও করেছে। জুন উইডমারের ক্যারিয়ার খুব একটা ভালো না, তাই কথা ফুরিয়ে গেল দ্রুত। বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলো না সে।

মিস ম্যাকাফির কথা তুললো কিশোর। চোখের পলকে যেন বদলে গেল ছোট ঘরটার পরিবেশ।

'ওই ভয়ংকর মেয়েমানুষটা!' চিৎকার করে উঠলো জুন। 'আমাকে ঘৃণা করতো! দু'চোখে দেখতে পারতো না। আমিও সুন্দরী ছিলাম। তবে ওর মতো উঁচুতেও উঠতে পারিনি, নামও ছিলো না। তবে পারতাম। ওর জন্যেই হলো না। ওই শয়তানটা শয়তানী না করলে এখন আমাকে এই হতচ্ছাড়া মোটেল চালাতে হতো না। ও বাদ না সাধলে জিটারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতো আমার। এখন বাস করতাম বেল এয়ারের বিশাল কোনো বাড়িতে।'

স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। কিশোরের দিকে তাকালো জুন। চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো সে, 'মিস্টার ব্যানার বললেন একটা কোভেন নাকি ছিলো? ওটা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল মহিলার। ঝটকা দিয়ে ফিরে এলো আবার, যেন জোয়ার এলো, আগের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেল। 'আমরা…এটা ছিলো শুধুই একটা খেলা, বুঝলে। বিশ্বাস করতাম না। শুধু থালিয়া বাদে। সে পুরোপুরিই বিশ্বাস করতো।'

'তারমানে জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন না আপনি। এখন করেন?'

'অবশ্যই না!' চেঁচিয়ে উঠলো ভূতপূর্ব অভিনেত্রী।

'একটা কথা বললেন একটু আগে,' কিশোর বললো। 'মিস ম্যাকাফি বাদ না সাধলে নাকি এখন বেল এয়ারে বাস করতেন আপনি। কিভাবে? জিটার কার্লোস তো মারাই গেছে। মোটর দুর্ঘটনায়।'

'ওটা দুর্ঘটনা ছিলো না! ওটা…ওটা…' কথাটা শেষ করলো না জুন।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো রবিন। 'আমাদের সাথে যে কথা বলছেন, খুব খুশি হয়েছি। আর কারও নাম বলতে পারেন, যার সাথে আমরা দেখা করতে পারি? মিস ম্যাকাফির কোনো বন্ধু যার সাথে এখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় তাঁর? কিংবা তাঁর সেক্রেটারি এলিনা ফিউজের সাথে?'

'জানি না।'

'চার্লস গুডফেলো নামে একজন ছিলো আপনাদের কোভেনে। তার কি হয়েছে বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

শ্রাগ করলো মহিলা। 'জানি না। একদিন স্রেফ গায়েব হয়ে গেল। আর কোনো খোঁজ নেই।'

'তাই!' অবাক হওয়ার ভান করলো কিশোর।

আর কিছু বলার নেই জুন উইডমারের। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ছেলেরা।

'তেমন কিছু বলতে পারেনি,' রবিন বললো।

'একটা কথা অবশ্যই বলেছে,' মুসা বললো। 'জিটারকে খুন করেছে মিস ম্যাকাফি! মহিলাকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমি।'

'হ্যারি ব্যানারেরও তাই ধারণা,' বললো কিশোর। 'দেখি রালফ স্মিথের কাছে গিয়ে। কিছু বলতে পারবে কিনা কে জানে!'

'আমাদের সঙ্গে কথা বলবে কিনা তাই তো জানি না,' বললো রবিন।

'তা বলবে। এখনকার বড় খবর মিস ম্যাকাফি, ফিল্মগুলো চুরি হওয়ার পর। তাঁর সাথে নাম জড়াতে আপত্তি করবে না স্মিথ।'

কিশোরের অনুমানই ঠিক। দ্রুত লাঞ্চ সেরে নিয়ে স্মিথের ওখানে ফোন করলো সে, উলফের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। প্রথমবার রিং হতেই ধরলো অভিনেতা। টেলিফোনেই নির্দ্বিধায় কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলো। স্বীকার করলো, কোভেন একটা সত্যি ছিলো। তেরজন সদস্যও ছিলো। মিস ম্যাকাফির কথা ভালোই বললো। তবে অনেক দিন থেকে আর যোগাযোগ নেই।

'কারো সাথেই যোগাযোগ নেই তার,' স্মিথ জানালো। 'মিস ম্যাকাফি অবসর নেয়ার পর তার কাজের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে তার শোফার লেমিল ডিফ। ফোন করলে সে-ই ধরে। একটাই জবাব তার, ম্যাডাম কারো সাথে কথা বলবেন না। জিটার মারা যাওয়ার পর অনেক চেষ্টা করেছি আমি, ঘর থেকে বাইরে আনতে, সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ করাতে, পারিনি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি। হয়তো এখন কিছু একটা হবে। ছবিগুলো টেলিভিশনে দেখানোর পর হৈ-চৈ হলে তার জীবনের ধারা পাল্টাতেও পারে।'

'চুরি হয়ে গেছে তো,' কিশোর বললো। 'টাকা না দিলে ফেরত পাওয়া যাবে

না।'

'টাকা দিয়েই ফেরত আনা হবে,' জোর দিয়ে বললো স্মিথ। 'ওগুলোর দাম টাকা দিয়ে শোধ করা যাবে না। ছবিগুলো তো দেখানো হবে, দেখো, তারপর বলো আমাকে, ঠিক বলেছি কিনা।'

'আরেকটা কথা, মিস্টার স্মিথ, চার্লস গুডফেলোর কি হয়েছে বলতে পারেন? মিস ম্যাকাফির এই বন্ধুটির ঠিকানা এখনও বের করতে পারিনি।'

'গুডফেলো? না, আমিও জানি না। বেশি কথা কখনোই বলতো না। চুপচাপ থাকতো। হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে। কোথাও একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নিয়েছে। করবেই বা আর কি? হয়তো কেরানী-টেরানী হয়েছে কোনো লোহালক্করের দোকানে।'

তাকে ধন্যবাদ জানালো কিশোর। লাইন কেটে দিলো রালফ স্মিথ।

'কিছুই বলতে পারলো না,' বন্ধুদের জানালো কিশোর। 'অনেক বছর ধরে মিস ম্যাকাফির সাথে যোগাযোগ নেই।'

'লিলি অ্যালজেডোর সাথে কথা বলা হয়নি এখনও,' মনে করিয়ে দিলো রবিন। 'যে ব্রোকারের ওখানে কাজ করে তার ঠিকানা জোগাড় করেছে'?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'কথা বলা যাবে। তবে লাভ হবে না।'

অনেকটা নিরাসক্ত ভঙ্গিতেই লিলিকে ফোন করলো কিশোর। মিস ম্যাকাফির অন্য বন্ধুরা যা বলতে পেরেছে সে তা-ও পারলো না। বললো, 'অনেক দিন আগের কথা। ব্যাপারটা আর মোটেই জরুরী নয়।'

'তা নয়। আপনি কোভেনের একজন সদস্য ছিলেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ছিলাম। কি যে বিরক্ত লাগতো! কিছু বলতেও পারতাম না, সইতেও পারতাম না। রাত দুপুরে চাঁদের আলোয় অহেতুক নাচানাচি কার ভালো লাগে!'

মিস ম্যাকাফির সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই লিলির, অন্যদের মতো একই কথা বললো সে-ও। চার্লস গুডফেলো কোনো খবর বলতে পারলো না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন ঘোষণা করে দিলো, এলিনা ফিউজ একটা মেরুদণ্ডহীন মেয়েমানুষ, যার সম্পর্কে কারো কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। তারপর লাইন কেটে দিলো।

'কট্টর মহিলা,' মন্তব্য করলো কিশোর। 'ব্যবহার ভালো না। অন্যেরা যা বলেছে, সে-ও তাই বললো। কোভেন ছিলো। কিন্তু এটাই যদি মিস ম্যাকাফির গোপন কথা হয়, তাতে তো কারো ভয় পাওয়ার কিংবা অস্বস্তি বোধ করার কথা নয়। ওই ডাকিনীবিদ্যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। চার্লস গুডফেলোর খোঁজ পাচ্ছি না। সে কি বলতে পারতো জানি না...।' থেমে গেল সে। ভ্রূকুটি করলো। 'একজন অবশ্য কোভেনের মেম্বার ছিলো যে একথা স্বীকার করেনি। কিন্তু তার পক্ষে পাণ্ডুলিপিটা চুরি করা সম্ভব ছিলো না। চুরিটা যখন হয় তখন সে লেমিল ডিফের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলো।'

'কাউকে ভাড়া করে থাকতে পারে,' মুসা যুক্তি দেখালো। 'হয়তো ডিফই বলেছে তাকে পাণ্ডুলিপিটার কথা। কোথায় আছে তা-ও বলেছে। তারপর বলেছে

যে একথাই ভুলে গেছে।'

'সম্ভাবনাটা খুব সামান্য,' কিশোর মানতে পারলো না। 'চুরি করানোর জন্যে লোক ঠিক করার সময়টা পেলো কোথায় সে? লোকটাকে আমি সন্দেহ করছি না তা নয়। তার সম্পর্কে পুলিশের ধারণা জানতে পারলে হতো।'

'ধোঁকাবাজ মনে হয়?'

'মনে হয় অভিনয় করছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সমস্ত পুলিশ অফিসারকে চেনে সে, তার কথায় তাই মনে হয়েছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে চীফ ইয়ান ফ্লেচারকেও চেনার কথা। দেখি তাঁকে ফোন করে, কি বলেন। সাজিয়ে রাখা কিছু প্লাক আর স্ক্রলের চেয়ে পুলিশের একজন চীফের কথা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।'

বার

'হেনরি ফগ?' চেয়ারে হেলান দিলেন ইয়ান ফ্লেচার। ফোনে কথা বলতে পারেনি কিশোর, তিনি তখন অফিসে ছিলেন না। তাই অফিসেই চলে এসেছে, বসে ছিলো কিছুক্ষণ, তাঁর ফেরার অপেক্ষায়। 'অবশ্যই চিনি তাকে। সমস্ত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার জানাশোনা। পুলিশের যে কোনো অনুষ্ঠানে তার হাজির থাকা চাইই।'

সামনে ঝুঁকে কৌতূহলী চোখে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্যাপারটা কি? ফগের ব্যাপারে এতো আগ্রহ কেন?'

'মক্কেলের নাম গোপন করে কিভাবে কথা বলবো বুঝতে পারছি না,' দ্বিধা করছে কিশোর।

'হুঁ। আরেকটা রহস্য পেয়ে গেছো তাহলে। ঠিক আছে, শুনতে চাই না। তবে বিপজ্জনক কিছুতে জড়াবে না। আর তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।' একটা মুহূর্ত চুপ করে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'হেনরি ফগকে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখি। পুলিশের অনেক কাজ করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। আসলে, টিভি সাংবাদিকতা ছাড়াও গোয়েন্দার কাজ করে সে। সাংবাদিকতায় গোয়েন্দা যাকে বলে সেরকম আরকি। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খবর বের করার, লোকের পেট থেকে কথা টেনে বের করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তার। পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছে একটাই কারণে, ওপরে, আরও ওপরে উঠতে চায় সে। অপরাধ নিয়ে কারবার করতে হলে পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখতেই হবে।'

'এই যেমন আমরা রাখছি,' হেসে বললো মুসা। 'তার মানে খুব একটা সুবিধের লোক নয়। এরকম একজন মানুষ পুলিশ আর শেরিফের কাছ থেকে এতোগুলো পুরস্কার পেলো কিভাবে?'

শ্রাগ করলেন ফ্লেচার। 'জালিয়াতি, ঠগবাজি, ধোঁকাবাজি এসব ব্যাপারে পাবলিককে নানা তথ্য জানায় সে। আইনের লোকেরা চায় পাবলিক তাদের পছন্দ করুক। বিশ্বাস করুক। ফগ পুলিশের পক্ষে কথা বলে, মানুষকে বিশ্বাস করতে বলে। আশেপাশে কোনো অন্যায় অপরাধ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশকে খবর দেয় এই পরামর্শ দিতে থাকে। এরকম একজন তেলানো ব্যক্তিকে পুরস্কার না দিয়ে

উপায় আছে?'

'তার মানে যতোটা দেখায় ততোটা ভালো রিপোর্টার নয় সে,' কিশোর বললো। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালো। 'আমারও মনে হচ্ছিলো লোকটা অভিনয় করে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক। চব্বিশ ঘন্টাই অভিনয় করছে ।'

থানা থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালালো।

'আরেকটা দেয়াল,' কিশোর বললো। 'কোন দিকে এগোবো বুঝতে পারছি না। ফগ লোকটা ভালো না, আগেই বুঝেছি। এখন শিওর হলাম। তবে আরেকটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, পাণ্ডুলিপিটা সে চুরি করেনি।'

'কি করে বুঝলে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'যা বুঝলাম, তাতে একটা কথাই বোঝা যায়, শুধু পুলিশের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতেই আগ্রহী সে। অনেক কষ্ট করে, যত্ন করে একটা ক্যারিয়ার তৈরি করেছে, একটা পাণ্ডুলিপি চুরি করে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে নয়।'

'তাহলে কোভেনের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বললো কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'সহজ। তার পজিশনের একজন মানুষ কয়েকটা ছেলের কাছে হাস্যকর একটা ব্যাপার নিয়ে কেন আলোচনা করবে? সেটা কোনো অপরাধ হলেও না হয় হতো। ডাকিনীবিদ্যা অপরাধের তালিকায় পড়ে না। তার পরেও, পাণ্ডুলিপিটা চুরি করার ইচ্ছে যদি তার হয়েও থাকে, করার কিংবা করানোর সুযোগ পায়নি।'

একটা জায়গায় এসে আলাদা হয়ে গিয়ে যার যার বাড়ির দিকে চললো তিনজনে। চাচা-চাচীর সঙ্গে খেতে বসে চুপচাপ রইলো কিশোর, চিন্তিত। খাওয়ার পর থালাবাসনগুলো ধুতে সাহায্য করলো মেরিচাচীকে। তারপর সোজা চলে এলো নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো। পুরোপুরি নিরাশ হয়েছে। পাণ্ডুলিপি চুরির সঙ্গে কোভেনের কাউকেই জড়াতে পারছে না। কিন্তু ওদের কেউ যদি না-ই করবে, তাহলে কে করলো?

সেরাতের কথা ভাবলো কিশোর, নুবার প্রেসের অফিসে যেদিন আগুন লেগেছিলো। আগুনের গর্জন এখনও কানে বাজছে যেন। পাতালঘর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাস্তা পেরিয়ে এসে দূরে দাঁড়িয়ে আগুন নেভানো দেখছিলো সে, মুসা আর রবিন। তাদের সঙ্গে ছিলেন মিস্টার রাইট। তার পর দৌড়ে আসে উলফ হেস আর তার চাচা হাইমার হেস। তখন ওখানেই ছিলেন মিস্টার ওয়ালটার আর মিসেস সাইমন। শুধু ওই ক'জন মানুষই জানতো, উলফের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে পাণ্ডুলিপিটা। অথচ ওদের কাউকেই সন্দেহ করা যাচ্ছে না।

ঘুমিয়ে পড়লো কিশোর। ঘুম যখন ভাঙলো, জানালা দিয়ে ঘরে রোদ আসছে তখন। নিরাশ হয়েই আছে সে। নড়তে ইচ্ছে করছে না। অলস হয়ে শুয়ে থাকতেই ভালো লাগছে। জোর করে উঠে বাথরুমে ঢুকলো। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ভিজলো কিছুক্ষণ। গোসল সেরে বেরিয়ে এসে কাপড় পরলো। ফোন করলো রবিন আর মুসাকে। নাস্তার পরে এসে [illegible]স্ট হাইওয়ের বাস স্টপেজে দেখা করতে বললো।

সকাল ন'টার আগে ইয়ার্ড থেকে বেরোতে পারলো না সে। হেঁটে চললো বাস

স্টপেজে। রবিন আর মুসা আগেই এসে বসে আছে।

'কিছু ভেবেছো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'কিছুই বের করতে পারিনি। আবার উলফের ওখানে যেতে হবে, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে। লোককে জিজ্ঞাসাবাদও চালিয়ে যেতে হবে।'

'আর লোক পাবো কোথায়?' রবিনের জিজ্ঞাসা। 'যে যে ছিলো সবাইকেই তো করে ফেলেছি।'

'যাদের মোটিভ থাকতে পারে শুধু তাদেরকেই জিজ্ঞেস করেছি। চুরি করার সুযোগ যাদের থাকতে পারে তাদের করিনি। আসলে ওদেরকে শুরুই করিনি এখনও।'

'কাদের? নুবার প্রেসের কর্মচারীদের?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'ওদেরকে সন্দেহ করতে পারছি না আমি। তবু, জিজ্ঞেস করতে দোষ নেই।'

বাসে করে পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে এলো তিনজনে। উলফের দরজায় এসে দেখলো গ্যাবার্ডিনের শ্ল্যাকস আর সিয়ারসাকার পরা ছিপছিপে একটা লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

তাদেরকে ঢুকতে দিলো উলফ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হলঘরে তার পেছনে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন হাইমার হেস। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ষড়যন্ত্র! সব ষড়যন্ত্র! আমাকে দেখতে পারে না ওরা! ঘৃণা করে! বোকা গাধার দল!'

'শান্ত হও, চাচা,' অনুরোধের সুরে বললো উলফ।

'শান্ত হবো? তোমাকে তো আর আগুন লাগানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হয়নি!'

'আগুন!' কিশোর অবাক। 'লাগানো হয়েছে!'

'হয়েছে, তাই তো বলছে,' উলফ বললো। 'যে লোকটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল সে আগুন বিশেষজ্ঞ। অ্যারসন স্কোয়াডের লোক। নুবার প্রেসের সমস্ত কর্মীদের লিস্ট চেয়েছে। জানতে চেয়েছে আগুন লাগার দিনে বাইরের কে কে এসেছিলো দেখা করতে।'

'সে এটাও জানতে চেয়েছে কার কাছে বীমার টাকাটা দিতে হবে,' রেগেমেগে বললেন হাইমার। 'কি বোঝাতে চেয়েছে খুব বুঝেছি! বলতে চেয়েছে আগুনটা আমিই লাগিয়েছি! কারণ বীমার টাকা আমার কাছেই আসবে। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত টাকার লেনদেন আমি করি, ফাইনানশিয়াল ব্যাপারটা আমিই দেখি। কিন্তু আমার...'

'চাচা, থামো না! আমরা এমনিতেই বিপদের মধ্যে রয়েছি!'

'নগদ টাকা কমে গেছে,' থামলেন না হাইমার। 'ব্যাংকে জমানো টাকা কম। তার ওপর লাগলো আগুন। বীমা কোম্পানির টাকা না পেলে প্রেসটা নতুন করে তোলা যাবে না আবার। আর ওই ব্যাটা হারামজাদা এসে টাকা না দেয়ার ফন্দি করছে! বলে কিনা আমি লাগিয়েছি! আরে ব্যাটা, আমি তো ওটার ধারেকাছে

ছিলাম না তখন! কি করে লাগালাম? তোর সাথে বাড়িতেই ছিলাম, তুইই তো সাক্ষি।'

'আগুন লাগানোর জন্যে আজকাল বাড়ির কাছে থাকতে হয় না,' উলফ বললো, 'লোকটা কি যুক্তি দেখিয়ে গেল শুনলে না? তোমার হয়ে অন্য কেউ লাগাতে পারে। আর কাউকেই যদি জানাতে না চাও, তাহলে নিজে নিজেও পারো। একটা বিশেষ যন্ত্র, ম্যাগনেশিয়াম আর ব্যাটারিতে চলা ঘড়ির সাহায্যে। সিঁড়ির নিচের আলমারিতে যে কোনো সময় রাখা যেতে পারে।'

'তোরও কি মনে হয় আমিই করেছি!'

'আমি সেকথা কি বলেছি? আমি শুধু বলছি, এক্ষেত্রে অ্যালিবাই কোনো কাজেই আসবে না। আমি যদি বলিও তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে ছিলে, কোম্পানি বিশ্বাস করবে না। যন্ত্র সেট করে দিয়ে এসে, আগুন লাগতে লাগতে হাজার মাইল দূরে চলে যেতে পারে যে লাগাতে চায়।'

'রাইট!' হাইমার বললেন। 'ওই ব্যাটাই লাগিয়েছে! আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে! দেখলেই এমন ভাব করে যেন আমি একটা কেঁচো! ছুঁচো কোথাকার! তার চেয়ে বড় আর বুদ্ধিমান কাউকে দেখলেই আর সহ্য করতে পারে না, ঘৃণা করা তার স্বভাব। কিংবা ওয়ালটার। সে-ও লাগাতে পারে। ওর সম্পর্কে কি আর এমন জানি আমরা? মাত্র তিন মাস হলো চাকরিতে এসেছে এখানে।'

'চাচা, তুমিই তাকে এনেছো!'

'এনেছি মানে চাকরিতে বহাল করেছি। ভালো রেফারেন্স নিয়ে এসেছে, যোগ্য লোক, বিদেয় করে দেবো নাকি? তাছাড়া তখন কি আর জানি পেটে পেটে শয়তানী বুদ্ধি? কিন্তু সে-ই বা লাগাতে যাবে কেন?'

কফি টেবিলের কাছে গিয়ে থামলেন হাইমার। টান দিয়ে চুরুটের বাক্সের ডালা তুললেন। 'দূর, একটাও নেই!'

উলফের দিকে তাকালেন। 'হয় রাইট নয়তো মিসেস সাইমন। দুটোই শয়তান, দুটোই আমাকে দেখতে পারে না! তোর বাবার জায়গায় আমার বসাটাকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখতে পারেনি ওরা। কিংবা ওয়ালটারও হতে পারে, ওই যে বললাম। তবে তার মোটিভটা এখনও বুঝতে পারছি না। এখন কি করা যায় তাই বল। ছেলে তিনটেকে তো ভাড়া করেছিস পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হচ্ছে। এক কাজ কর না। রাইট, টমাস আর সাইমনের বাড়িতে নজর রাখতে লাগিয়ে দে। বীমা কোম্পানির লোক এসে আমাকে হুমকি দিয়ে যাওয়ার পর ওরা কি আচরণ করছে দেখুক। ওদেরকে প্রশ্ন করুক। কোনো কিছু ফাঁস করেও দিতে পারে। আর যদি বোঝে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, পোটলা-পাটলি গুছিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করবে, দেখিস।'

অনেকটা অসহায় দৃষ্টিতে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালো উলফ। 'তোমরা কি বলো?'

'হতেই পারে। উনি ঠিকই বলেছেন,' কিশোর জবাব দিলো। 'সামান্য কারণেও বিশাল অপরাধ ঘটিয়ে ফেলে মানুষ। ঠিকানাগুলো দিন। আমরা

নিজেরাই গিয়ে খুঁজে বের করে নিতে পারবো। অসুবিধে হবে না।'

'বেশ।' লিভিং রুমের ছোট স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলো উলফ। মিনিটখানেক পরেই কাগজে তিনটে ঠিকানা লিখে নিয়ে ফিরে এলো। 'এই নাও।'

'আমি যাবো মিসেস সাইমনের ওখানে। রবিন যাবে মিস্টার রাইটের বাড়িতে। আর মুসা মিস্টার ওয়ালটারের ওখানে।'

দরজার দিকে এগোলো তিন গোয়েন্দা। সাথে এলো উলফ। গম্ভীর হয়ে আছে। 'চাচার মন রাখতেই একাজ করছো তোমরা, না?'

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'মিস ম্যাকাফির জাদুচক্রের সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যাকে যাকে পেয়েছি। যতোদূর বুঝলাম, পাণ্ডুলিপি চুরির সুযোগ ওদের কারোরই ছিলো না। তাছাড়া জানতোও না যে ওটা আপনার কাছে আছে। কাজেই আমরা ঠিক করেছি তাদের কাছে খোঁজখবর নেবো, যাদের জানা আছে ব্যাপারটা, আর চুরি করার পেছনে যাদের কোনো স্বার্থ আছে। যে তিনজনের কাছে যাচ্ছি, তাদের যে কারো পক্ষে আপনার ডেস্ক থেকে চাবিটা চুরি করা সহজ। তিনজনেই আগুন নেভানোর সময় কাছে ছিলো। তিনজনেই শুনেছে পাণ্ডুলিপিটা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে আছে। ঠিকই বলেছেন আপনার চাচা, কোম্পানির লোকটা এসে হুমকি দিয়ে যাওয়ার পর কিছু একটা ঘটতে পারে। তবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আগুন লাগার সঙ্গে পাণ্ডুলিপি চুরির যোগাযোগ আছেই। শিওর না হয়ে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আমরা চলে গেলে একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কী?' জানতে চাইলো উলফ।

'পাণ্ডুলিপিটা যখন চুরি হয় তখন নাকি বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে গিয়েছিলেন আপনার চাচা। খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন ব্যাপারটা সত্যি কিনা?'

অবাক হয়ে গেল উলফ। 'চাচাকে সন্দেহ কর?'

'করবো কিনা বুঝতে পারছি না। তবে তাঁর অ্যালিবাই ঠিক আছে কিনা জানা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালো উলফ।

'কাজ সেরে এসে এখানেই দেখা করবো আমরা তিনজনে,' দুই সহকারীকে বললো কিশোর। 'ঠিক আছে?' ঘাড় কাত করে সায় জানালো রবিন আর মুসা।

বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উলফ। বিড়বিড় করছে আপনমনে।

তের

ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন ডেভিড ওয়ালটার। উলফের বাসা থেকে বেশি দূরে নয়। মুসাও পৌঁছলো, সাধারণ একটা গাঢ় রঙের সিডানও এসে থামলো বাড়ির সামনে। সিয়ারসাকার ব্লেজার পরা সেই লিকলিকে লোকটা নামলো গাড়ি থেকে। অ্যারসন স্কোয়াডের গোয়েন্দা। ওয়ালটারের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো। দেখে

বাড়ির ভেতরে ঢুকলো না আর মুসা। পাশের একটা পার্কের বেঞ্চে বসে নজর রাখলো। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি।

ঢুকেছে তো ঢুকেছেই, বেরোয় না আর লোকটা। তারপর, ঘন্টাখানেক পর বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। বসেই রইলো মুসা।

গোয়েন্দা চলে যাওয়ার আধ ঘন্টা পর বেরোলেন ওয়ালটার। রাস্তার এপাশ ওপাশ দেখলেন। দ্বিধা করলেন একবার। পেছনে ফিরে তাকালেন নিজের ঘরের দিকে। তারপর রাস্তায় নেমে গটগট করে রওনা হয়ে গেলেন দক্ষিণে উইলশায়ার বুলভারের দিকে।

ওয়ালটার আধ ব্লক এগিয়ে যাওয়ার পর পিছু নিলো মুসা। উইলশায়ার বুলভার পেরিয়ে ছোট একটা এলাকায় ঢুকলেন তিনি। মুসার মনে হলো জায়গাটা যেন বিষণ্ন হয়ে আছে। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং। কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আছে। এতোই পুরনো, রং চটে গেছে। জানালার পর্দা বেশির ভাগই মলিন, ছেঁড়া।

ওরকম একটা বাড়ির সামনেই থামলেন ওয়ালটার। রাস্তার এপাশ ওপাশ তাকালেন আরেকবার। চট করে একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লো মুসা।

রাস্তা পেরোলেন ওয়ালটার। ঢুকে পড়লেন একটা খোলা গেট দিয়ে। ভেতরের আঙিনায় পুরনো গাড়ি ভাঙার কাজ হয়। গেটের পাশেই একটা ছাউনি, তার পাশে দাঁড়ালেন এক মুহূর্ত। তারপর ঢুকে পড়লেন ভেতরে। আঙিনা ঘিরে বেড়া রয়েছে। ফাঁক দিয়ে মুসা দেখলো, মরচে পড়া ভাঙাচোরা গাড়ির বডি আর স্তূপ করে রাখা যন্ত্রাংশের মাঝের পথ দিয়ে এগোচ্ছেন তিনি।

ভুরু কোঁচকালো সে। ভাবছে পিছু নেবে কিনা। কিশোর হলে কি করতো? এরকম মুহূর্তে অবশ্যই পিছু নিতো। ভেতরে অন্য কোনো লোক থাকলে বানিয়ে একটা গল্প বলে দিতো, কেন ঢুকেছে। বলে দিতো ১৯৪৭ মডেলের স্টুডিবেকার চ্যাম্পিয়ন, কিংবা ওরকমই একটা দুর্লভ গাড়ি, যেটা পাওয়া যায় না আজকাল, তার একটা পার্টস দরকার।

যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকে পড়লো মুসা। ছাউনিটা নির্জন। যাক, বাঁচা গেল। মিথ্যে গল্প বলার ঝামেলায় আর যেতে হলো না। ফেলে রাখা সারি সারি বডির মাঝের পথ দিয়ে হেঁটে চললো সে। থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেছে।

কান পেতে রয়েছে সে। টননন করে ধাতব শব্দ হলো। বাঁয়ে। স্তূপ করে রাখা বাম্পারগুলোর ওপাশ থেকেই এসেছে মনে হলো।

মাথা নিচু করে ঝুঁকে ঝুঁকে এগোলো মুসা। স্তূপের পাশ ঘুরে এসে অন্য পাশে তাকিয়েই থমকে গেল। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়ালটার। ধূসর একটা ভ্যানের পাশে। গাড়িটার পেছনের দরজা খোলা। ভেতরে ফিল্মের ক্যানে বোঝাই। ফিল্মের গায়ে লাগানো লেবেলগুলো পড়ার চেষ্টা করলো সে। একটাতে লেখা রয়েছে 'ক্লিওপেট্রা'। আরেকটাতে 'অ্যাজফোডেল স্টোরি-৩'। হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো চত্বরটা। কানের কাছে শুধু তার নিজের রক্তের শোঁ শোঁ আর

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধড়াস ধড়াস শব্দ।

দড়াম করে ভ্যানের দরজা বন্ধ করে দিলেন ওয়ালটার। হেঁটে চলে এলেন গাড়ির সামনে। ড্রাইভিং সীটে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিলেন। মুহূর্ত পরেই জঞ্জালের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলো ভ্যান। ছাউনির বাইরে বেরিয়ে খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোলো গেটের দিকে।

যেখানে ছিলো সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মুসা। থ হয়ে গেছে। ফিল্ম ক্যান! অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! চোখের সামনে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে, অথচ সত্যিই দেখেছে। নুবার প্রেসের পাশের ল্যাবরেটরি থেকে এগুলোই চুরি গেছে, কোনো সন্দেহ নেই তার। আর ডেভিড ওয়ালটারের দখলে রয়েছে ওগুলো।

জোর করে যেন পা নড়ালো সে। আর সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করেলা না। বাইরে বেরিয়েই দৌড়াতে শুরু করলো। গেটে বেরিয়ে দেখলো উত্তরে চলে যাচ্ছে ভ্যানটা। লাইসেন্স প্লেটের নম্বর পড়ার চেষ্টা করলো। পারলো না। কাকতালীয় ভাবেই হোক, আর যে ভাবেই হোক, প্লেটটা অতিরিক্ত ময়লা, কিছুই পড়া যায় না।

আবার ছাউনির দরজার কাছে দৌড়ে এলো সে। কয়েকটা নড়বড়ে চেয়ার, একটা টেবিল আর তাতে একটা টেলিফোন দেখতে পেলো। মানি ব্যাগ থেকে উলফের ফোন নম্বরটা বের করে ডায়াল করলো কাঁপা হাতে।

অন্য পাশে ফোন বাজলো। একবার, দু'বার।

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন হেঁটে আসছে লোহালক্করের জঞ্জালের ওপর দিয়ে। ফিরেও তাকালো না মুসা। যা হয় হোকগে। যদি এসে কিছু জিজ্ঞেস করে, সোজা বলে দেবে পুলিশকে ফোন করছে।

অন্যপাশে ফোন তুললো উলফ।

'উলফ? শুনুন,' দ্রুত বলতে লাগলো মুসা, 'আমি মুসা বলছি। থর্নওয়ালের একটা গাড়ির স্যালভিজ ইয়ার্ডে রয়েছি। উইলশায়ারের দুই ব্লক দক্ষিণে। কিশোর আর রবিন এসেছে? ও, এসেছে। ওদের বলুন, এই মাত্র দেখলাম...'

ডেস্কের ওপরে একটা ছায়া পড়লো। ঘুরতে শুরু করলো মুসা। কিন্তু মাথা পুরোটা ঘোরানোর আগেই ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। চোখের সামনে ঝিক করে উঠলো কয়েক শো উজ্জ্বল তারকা, হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিসিভার, টেবিলে পড়ে খটাস করে উঠলো। পড়ে যাচ্ছে ও...

কতোক্ষণ বেহুঁশ ছিলো বলতে পারবে না মুসা। জ্ঞান ফিরলে দেখলো বদ্ধ, নোংরা একটা জায়গায় পড়ে রয়েছে। পুরনো রবার আর গ্রিজের গন্ধ। ভীষণ গরম, আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। নড়ার চেষ্টা করলো সে। শরীর টানটান করতে চাইলো। ঘোরার ইচ্ছে। পারলো না। কারণ জায়গাই নেই অতো। ঘাড় ব্যথা করছে। কাঁধে কি যেন শক্ত হয়ে চেপে রয়েছে। হাত বাড়ালো। খসখসে ধাতব কিছুতে লাগলো। বহুদিন অযত্নে পড়ে থেকে মরচে ধরেছে লোহায়। বুঝতে পারলো, এখনও ইয়ার্ডেই রয়েছে। কোনো পুরনো গাড়ির ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছে তাকে। তার ওপর রোদ

লাগছে, কড়া রোদ। রুটি সেঁকার তন্দুর বানিয়ে ফেলেছে যেন ট্রাঙ্কটাকে।

চিৎকার করতে চাইলো মুসা। স্বর বেরোলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গরমে আর ভয়ে। ঢোক গেলার চেষ্টা করলো। বাইরে সব কিছু নীরব হয়ে আছে। ইয়ার্ডে কেউ নেই। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে সাহায্য করতে এলো না কেউ। আতঙ্কে এসে চেপে ধরতে লাগলো যেন মনকে। কেউ আসবে না! উদ্ধার করতে আসবে না কেউ! জানবেই না এখানে আটকে রয়েছে সে!

চোদ্দ

তীব্র গতিতে ছুটছে উলফের গাড়ি। ইয়ার্ডের কাছে এসে ব্রেক কষলো। একটানে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমেই দৌড় দিলো রবিন আর কিশোর।

পাগলের মতো তাকাতে লাগলো ছাউনির এখানে সেখানে। 'কোথায়? জায়গা তো এটাই।'

উলফও বেরিয়ে এলো। 'ওই যে একটা লোক আসছে। মনে হয় এখানেই কাজ করে।'

দরজার দিকে এগোলো ওরা। চত্বরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল। ওভারঅল পরা। হাত, কাপড়ে গ্রিজ লেগে রয়েছে। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু লাগবে?'

'একজনকে খুঁজছি, জবাব দিলো কিশোর। 'বলেছে এখানে দেখা করবে। আমাদের বয়েসী একটা ছেলেকে দেখেছেন? লম্বা। ভালো স্বাস্থ্য। নিগ্রো।'

'সরি,' জবাব দিলো লোকটা। 'এখানে আজ কাউকেই দেখিনি।'

'কিন্তু ও এসেছে! সত্যিই দেখেননি?' ভয় পেয়ে গেছে কিশোর।

'না, কাউকেই দেখিনি। দেখ, এটা স্যালভিজ ইয়ার্ড, কারো দেখা সাক্ষাতের জায়গা নয়। আর গেটের কাছে আমি সারাক্ষণ বসেও থাকি না যে কেউ এলেই দেখবো। হয়তো এসেছিলো। চলে গেছে।...আরে আরে, কোথায় যাচ্ছো?'

'মুসা ঐখানেই আছে!' বলে লোকটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। স্তূপ হয়ে রয়েছে গাড়ির এঞ্জিনের যন্ত্রাংশ, বাম্পার, দরজা, চাকার রিম, টায়ার। সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'কিছু একটা দেখেছিলো ও। জরুরী কিছু। তারপর আমাদেরকে ফোন করেছে। সব কথা বলার আগেই কেউ আটকে ফেলেছে তাকে। ও এখানেই ছিলো। আমি শিওর!'

হঠাৎ রবিন বলে উঠলো, 'এই, গাড়ির ট্রাঙ্ক! এখানে কাউকে লুকাতে চাইলে ওর মধ্যেই ভরে রাখতাম আমি হলে!'

কড়া চোখে ছেলেদের দিকে তাকালো লোকটা। 'পাগল হয়ে গেছো!' তবে জোর নেই তার গলায়, সন্দেহ ফুটেছে। 'কে রাখতে আসবে? আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে, না?'

'মুসাআআ!' চিৎকার করে ডাকলো কিশোর। 'এইই মুসাআআ, কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।
'আমাকে গাধা পেয়েছো!' পড়ে থাকা পুরনো গাড়িগুলোর দিকে তাকাতে লাগলো লোকটা। 'একশোর বেশি গাড়ি আছে এখানে। ওগুলোর ট্রাঙ্ক আছে। থাকলেও কোনটাতে আছে খুঁজে বের করতে সারাদিন লেগে যাবে।'
'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'কোনোটাতে থাকলে তাড়াতাড়িই বের করবো ওকে।'
গাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। ঘুরতে শুরু করলো ওগুলোর পাশে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। তার পেছনে রয়েছে রবিন আর উলফ। সবার পেছনে লোকটা। উদ্বেগ ফুটেছে চোখের তারায়। 'মরে যাবে!' বলছে সে. ট্রাঙ্কে থাকলে মরে যাবে! যা গরম! দম বন্ধ হয়েই শেষ হয়ে যাবে!'
জবাব দিলো না কিশোর। তার কাজ সে করে চলেছে। নীল একটা বুইকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হাত তুলে দেখালো। গাড়ির বডিতে পুরু হয়ে ধুলো জমে রয়েছে। ট্রাঙ্কের তালার কাছটায় ধুলো আছে, তবে হাত পড়েছে। রঙ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। নীল।
'এটার ট্রাঙ্ক খোলা হয়েছিলো?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
'কি জানি,' গাল চুলকালো সে। 'হতে পারে। আমি জানি না।'
'একটা শাবল পাওয়া যাবে? ট্রাঙ্কটা নিশ্চয় খোলা ছিলো। মুসাকে এর মধ্যে ভরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। লেগে গেছে তালা।'
কোনো প্রশ্ন করলো না লোকটা। প্রতিবাদ করলো না। চলে গেল দ্রুতপায়ে। শাবল নিয়ে ফিরে এলো। ট্রাঙ্কের নিচের ফাঁকে সেটার মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিতে লাগলো। তাকে সাহায্য করলো উলফ। গুঙিয়ে উঠলো ধাতু। তালা ছুটে গেল। ঝটকা দিয়ে উঠে গেল ডালাটা।
'মুসা!' সামনে ছুটে গেল রবিন।
ট্রাঙ্কের মধ্যে পড়ে রয়েছে মুসা। নড়লো না।
অস্ফুট স্বরে কিছু বলেই অফিসের দিকে দৌড় দিলো লোকটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফিরে এলো একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে।
ততোক্ষণে উঠে বসেছে মুসা। দু'দিক থেকে তাকে ধরে রেখেছে রবিন আর কিশোর।
'আমার কিছু হয়নি, আমি ভালো আছি,' প্রায় ফিসফিস করে বললো মুসা। 'এতো গরম ছিলো, বাপরে বাপ! বাতাসের নাম গন্ধও নেই!'
'চুপ করে থাকো,' বলে ভেজা তোয়ালেটা মুসার কপালে চেপে ধরলো লোকটা। 'পুলিশকে ডাকতে হবে। আরেকটু হলেই মরে যেতে। শেষে লাশ নিয়ে পড়তাম বিপাকে!'
'কি হয়েছিলো, মুসা?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।
তোয়ালেটা নিয়ে মুখে চেপে ধরলো মুসা। 'ডেভিড ওয়ালটারের পিছু নিয়ে এখানে এলাম। ছাউনির ভেতরে একটা ধূসর ভ্যান পার্ক করা ছিলো। তার মধ্যে দেখলাম অসংখ্য ফিল্ম ক্যান।'

একটা মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর রবিন বললো, 'বলো কি!'

'মিস ম্যাকাফির ছবি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো উলফ। 'ডেভিড ওয়ালটার পেয়েছে!'

'তাই তো মনে হলো! কয়েকটা লেবেলও দেখেছি। গাড়িটা নিয়ে চলে গেল ওয়ালটার। ওই সময়ই আমি আপনাকে ফোন করার চেষ্টা করেছি।'

'তার মানে ওয়ালটারই ছবিগুলো চুরি করেছে,' কিশোর বললো। 'আগুনও সে-ই লাগিয়ে থাকতে পারে, লোকের নজর আরেক দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে। যাতে ডাকাতেরা নিরাপদে ফিল্মগুলো সরিয়ে নিতে পারে।'

'নিশ্চয় তোমাকে দেখেছে ও,' রবিন বললো। 'তাই যখন ফোন করতে গেলে, পেছন থেকে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেললো।'

'না,' ভুরু কুঁচকে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলো মুসা। 'ও নয়। আমাকে যে মেরেছে সে রাস্তা থেকে আসেনি। ইয়ার্ডেরই কোনোখান থেকে বেরিয়ে এসে অফিসে ঢুকেছে।'

ওভারঅল পরা লোকটার ওপর চোখ চলে গেল রবিনের।

'না না আমি না!' চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। 'কি যে হচ্ছে তাই তো বুঝতে পারছি না! আমি ওকে মারিনি। আমার নিজেরও বাচ্চাকাচ্চা আছে। এখানে বেড়ার ভেতর কাউকে ঢুকতে দিই না এটা ঠিক, তবে মারি না।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করি,' কিশোর বললো। 'তবে মুসা যখন বলছে লোকটা ডেভিড ওয়ালটার নয়, তাহলে অন্য কেউই হবে।'

'ওর সহকারী-টহকারী হবে,' আন্দাজ করলো রবিন। 'মনে আছে, ফিল্ম চুরি করতে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিলো দু'জন ডাকাত?'

'বেশ চালাকি করেছে। বুদ্ধি করে ভ্যানটা এনে লুকিয়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে সহজে কারোর নজরে পড়বে না। তবে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে,' কিশোর বললো। 'এখানে আস্ত গাড়ি থাকে না। নিশ্চয় খুলেটুলে ফেলেন,' লোকটার দিকে তাকালো সে। 'ওটাকেও ভাঙতে যেতে পারতেন, তাইলেই দেখে ফেলতেন...'

'ধূসর ভ্যান?' ভেবে বললো লোকটা। 'না, ওটা ভাঙতাম না। একটা লোক এসে আমাকে ধরলো। টাকা দিলো গাড়িটা কয়েক দিন পার্ক করে রাখার জায়গা দেয়ার জন্যে। দিয়ে দিলাম।'

'তাই?' ভুরু তুললো কিশোর।

ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। 'চুরি করে এনেছে? চোরাই মাল ছিলো ওর মধ্যে? আমি জানতাম না। সত্যি বলছি। চুরিদারির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার। পরিষ্কার ব্যবসা করি। তোমরা পুলিশকে ফোন করবে?'

'করতে বলেন?'

'আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওরা,' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো লোকটা। 'বিপদে পড়ে যাবো! লোকটা কেমন ছিলো জানো? লম্বা, ঝোলা কালো চুল।'

'ডেভিড ওয়ালটার,' উলফ বললো।

'না, ওই নাম নয়,' লোকটা বললো। 'নামটা শুনতে একটু অদ্ভুতই। মিস্টার পাক। বললো তার বাড়িতে গাড়ি রাখার জায়গা নেই। তাই এখানে রেখে যেতে চাইলো। এখন বুঝতে পারছি, তখন সন্দেহ না করাটা বোকামি হয়ে গেছে। বেশি টাকা দিতে চাইলো। লোভটা সামলাতে পারিনি।'

'লোভ মানুষের ক্ষতি করে,' রবিন বললো।

তা করে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করলেও তার গাড়ি রাখতাম না আমি, যতো টাকাই দিক।'

'যাকগে, যা হবার হয়েছে,' কিশোর বললো, 'এখন আর বলে লাভ নেই। পুলিশকে জানাবো না আমরা। আমাদের কথাও বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বলতে হলে হাতে প্রমাণ নিয়ে গিয়ে বলতে হবে।'

'চোরাই ছবিগুলোই তো প্রমাণ,' বললো মুসা। 'খুব শক্ত প্রমাণ।'

'তা ঠিক। তবে সেগুলো সব ধরতে পারলে। ওয়ালটার নিশ্চয় বসে নেই। এতোক্ষণে হয়তো আবার কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যেতে পারে, আর কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

উঠে দাঁড়ালো মুসা। এক পা দু'পা করে হেঁটে দেখলো। যেন তার ভয়, শরীরের ভর রাখতে পারবে না পা।

'পারছো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে।'

'তা তো পারবোই।'

'তাহলে চলো। আরও সাবধান হতে হবে আমাদের,' কিশোর বললো। 'ওয়ালটারকে নিশ্চয় হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তৈরি হয়ে আমাদের জন্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে।'

'আর যে করেছে,' রবিন যোগ করলো, 'তার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। মুসাকে তো শেষই করে দিয়েছিলো। বোঝা যাচ্ছে, খুন করতেও দ্বিধা করে না সে।'

পনের

'আমিও যাবো তোমাদের সাথে,' ওয়ালটারের বাড়ির সামনের মোড়ে গাড়ি রেখে বললো উলফ।

'আসুন, ভালোই হয়,' উলফের চওড়া কাঁধের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো কিশোর। হাসলো। 'আপনার মতো শক্তিশালী মানুষ আমাদের দরকার। ভয়ানক একটা খুনীর সাথে মোকাবেলা করতে হতে পারে আমাদের।'

সরু পথ পেরিয়ে এসে বাড়িটার আঙিনায় ঢুকলো ওরা। চারটে দরজা দেখা যাচ্ছে ঢোকার। কলিংবেলের সুইচের পাশে একটা দরজায় দেখা গেল ডেভিড ওয়ালটারের নাম লেখা রয়েছে। বেল বাজালো উলফ। সাড়া না পেয়ে ডাকলো,

'ওয়ালটার! বাসায় আছেন?'

জবাব নেই।

দরজার নব ধরে মোচড় দিলো কিশোর।

'সাবধান,' নিচু গলায় বললো রবিন। 'ভেতরে লোকগুলো থাকতে পারে।'

ঠেলে পাল্লা খুলে ফেললো কিশোর। লিভিং রুমে উঁকি দিলো। নীরব। প্রায় শূন্য। জিনিসপত্র নেই।

ওয়ালটারের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। রান্নাঘরে উঁকি দিলো। তার পেছনে এসে দাঁড়ালো অন্যেরা। লিভিং রুম, রান্নাঘর, ছোট হলঘর, সব জায়গায় খুঁজেটুজে কিছু না পেয়ে শেষে শোবার ঘরে এসে ঢুকলো।

হাঁ হয়ে খুলে রয়েছে একটা আলমারির দরজা। কয়েকটা হ্যাঙার ঝোলানো রয়েছে শুধু, আর কিছু নেই।

'দেরি করে ফেলেছি,' কিশোর বললো। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে একের পর এক ড্রয়ার টেনে খুলতে লাগলো। সব খালি।

'চলে গেছে!' রবিন বললো।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো কিশোর। 'মুসা ওকে চলে যেতে দেখেছে প্রায় দুই ঘন্টা আগে। তাকে হুঁশিয়ার করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে অন্য লোকটা। দু'জনে মিলে ফিল্মগুলো কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। তারপর এখানে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে ওয়ালটার।'

গোয়েন্দারা সূত্র খুঁজছে, আর উলফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই পাওয়া গেল না।

'বোঝা যাচ্ছে,' অবশেষে বললো কিশোর, 'ওয়ালটারের সাথে আরও লোক আছে। একা ওর পক্ষে এতোটা নিখুঁতভাবে কিছু করার উপায় ছিলো না। নুবার প্রেসে নিজের অফিসে বসে ল্যাবরেটরির ওপর নজর রেখেছে সে। দেখেছে কখন কোন কর্মচারী আসে, কখন বেরোয়, কি কি কাজ হয়, এসব। কখন ডাকাতিটা করতে হবে, তা-ও আন্দাজ করেছে। তবে একটা কথা জানার কথা নয় তার, যে হ্যারভে ভিডিও ফিল্মগুলো কিনবে। কি করে জানলো? আর এটাই বা জানলো কিভাবে, গ্রীন পিকচার ল্যাবরেটরিতে ওগুলো দেয়া হবে মেরামত করার জন্যে?'

উলফের দিকে তাকালো সে। 'লেমিলের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিলো, বলতে পারবেন?'

'না।'

'হুম!' একটা সোফার ওপাশে মেঝের ওপর কিশোরের নজর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো কিছু। 'এই একটা জিনিসই প্রমাণ করে যে ওয়ালটার বাস করতো এখানে।' সবার দেখার জন্যে তুলে ধরলো সে। চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সোফার পাশের টেবিলটা ধরে ঝাঁকি দিলো সে। নড়ে। একটা পা ঠিকমতো বসে না মেঝেতে। বললো, 'এই বাক্সটা পায়ার তলায় দিয়েছিলো, যাতে না নড়ে।'

'আর এটাই তোমার প্রয়োজন ছিলো,' হেসে বললো রবিন। 'শার্লক হোমসের

মতো। একটা রঙিন বোতাম পেয়ে গেল। ব্যস। তা থেকেই সে দিব্যি বলে দিলো অপরাধী কে। এমনকি কোন দেশে বাড়ি, কি কাজ করে, সব। আর তুমি তো বোতামের চেয়ে অনেক বড় একটা জিনিস পেয়ে গেলে। এখন বল ওয়ালটারের সম্পর্কে কি কি জানলে?'

বাক্সটা হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কিশোর। অদ্ভুত হাসি ফুটেছে মুখে। 'এটা এসেছে জাভা আইলস রেস্টুরেন্ট থেকে। ঠিকানা দেখেই বোঝা যায় ওটা নুবার প্রেসের কাছে। আগুন লাগার রাতে ওই রেস্টুরেন্টে বসে ডিনার খেয়েছিলো ওয়ালটার। তবে তার আগে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিলো ফিল্মগুলো চুরি করার জন্যে।'

'থামলে কেন?' মুসা বললো।

'জাভা আইলস ইন্দোনেশিয়ান রেস্টুরেন্ট। এবং তাতেই অনেক কিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ইয়ার্ডের লোকটার কাছে ওয়ালটার তার নাম বলেছে পাক। শেক্সপিয়ারে একটা চরিত্র আছে ওই নামে। ও শুধু গোলমাল পাকাতো। আরেকটা নাম ছিলো তার, রবিন গুডফেলো।'

'গুডফেলো!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'চার্লস গুডফেলো! মিস ম্যাকাফির জাদুচক্রের একজন!'

'হ্যাঁ। কোভেনের সেই হারানো সদস্য, যাকে আমরা খুঁজছি। আমরা জানি হল্যাণ্ডে বড় হয়েছে চার্লস গুডফেলো। আর অনেক ওলন্দাজই ইন্দোনেশিয়ান খাবার পছন্দ করে, কারণ ইন্দোনেশিয়ায় একসময় ওলন্দাজরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। ডেভিড ওয়ালটারেরও পছন্দ ওই খাবার। সেজন্যেই জাভা আইলস রেস্টুরেন্টে নিয়মিত খেতে যেতো।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'তাহলে ডেভিড ওয়ালটার আর চার্লস গুডফেলো একই লোক! কোভেনের একজন সদস্য!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এখন অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব জানতে হবে আমাদের। ফিল্মগুলো বিক্রির খবর কি করে জানলো সে? কোভেনের কোন লোকটা বলেছে? হারডে ভিডিওর কারো সাথে পরিচয় আছে? ফগের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করেছে, না অন্য কারো কাছ থেকে? এখন ভেবে লাভ হবে না, বুঝতে পারবো না। সময়ই সব বলে দেবে। এখন শুধু একটা কথা জানি আমরা, কে ফিল্ম চুরি করেছে।'

'পাণ্ডুলিপিটাও হয়তো সে-ই চুরি করেছে,' রবিন বললো। 'তার জানা ছিলো কোথায় আছে ওটা, কোথায় চাবি পাওয়া যাবে। এমনকি উলফের ড্রয়ার থেকে চাবি চুরি করে নিয়ে গিয়ে ডুপ্লিকেট আরেকটা বানিয়ে নেয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিলো।'

'আগুনটাও তার পক্ষে লাগানো সহজ,' বললো মুসা।

'কিন্তু কেন পাণ্ডুলিপি চুরি করবে?' উলফের প্রশ্ন। 'ওটা ছাপা হলে কি ক্ষতি হতো তার?'

ঠোঁট ওল্টালো কিশোর। 'কি জানি! হয়তো এমন কিছু লেখা রয়েছে, যেটা

তার মুখোস খুলে দেবে। এতো বছর পরেও হয়তো ক্ষতি হবে তার।'

'পুলিশকে জানানোর সময় হয়েছে। আমরা কি করে জেনেছি বোঝানো মুশকিল হবে তাদের, তবু বলতে হবে। আমার বাসা থেকেই ফোন করা যাবে। এখান থেকে করা উচিত হবে না। চুরি করে অন্যের বাড়িতে ঢুকেছি, এটা বেআইনী। পুলিশকে খবর দিলে আগে সেটার কৈফিয়ত দিতে দিতেই জান বেরোবে আমাদের।'

উলফের অ্যাপার্টমেন্ট ওখান থেকে বেশি দূরে না। পথে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লো সে। বললো, 'চাচার মন থেকে ভার অনেক নেমে যাবে! ফিল্ম তো চুরি করেছেই ওয়ালটার, আমরাই দেখেছি তার ভ্যানে। বাকি থাকলো আগুন কে লাগিয়েছে সেটা বের করা। পুলিশের হাতে পড়লে চাপ দিয়ে ঠিকই কথা বের করে ফেলবে। সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবে চাচা।'

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে চাচাকে ডাকলো উলফ। জবাব নেই।

'এখনও ফিরলো না,' বিড়বিড় করলো উলফ। 'তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর বললো গলফ খেলতে যাবে। এতোক্ষণে চলে আসার কথা।'

হঠাৎ যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো উলফ। ভয়ে ভয়ে ঢুকলো গিয়ে চাচার শোবার ঘরে। লিভিং রুম থেকে তিন গোয়েন্দা শুনলো একটা আলমারি খোলার শব্দ। তারপর নানারকম জিনিস বের করে ছুঁড়ে ফেলার আওয়াজ। খোঁজাখুঁজি করছে সে।

বেরিয়ে এলো কয়েক মিনিট পরে। 'চলে গেছে। তুমি আর রবিন ফেরার পর মুসার ফোন পেয়ে তো বেরিয়ে গেলাম আমরা। তারপর আবার ফিরে এসেছিলো চাচা। একটা ছোট সুটকেসে জিনিসপত্র ভরে নিয়ে চলে গেছে। একটা সুটকেস নেই। নিশ্চয় নিশ্চয় ভয় পেয়েছে কোনো কারণে। পালিয়েছে। পুলিশকে এখন আর ফোন করতে পারছি না আমরা। তাহলে চাচাকে বিপদে ফেলে দেবে। ওরা ধরেই নেবে, আগুন চাচাই লাগিয়েছে!'

'তা নেবে। সন্দেহভাজন লোকটা পালালে পুলিশ কেন, যে কেউই এটা ভাবতে পারে,' কিশোর বললো। 'তবে সন্দেহ করলে কি সেটা অন্যায় হবে? আমরা কি সত্যিই জানি, তিনি আগুন লাগাননি?'

ষোল

'সেরাতে সত্যিই তাস খেলতে গিয়েছিলো কিনা জানতে বলেছিলাম আপনাকে।' উলফকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'জেনেছেন?'

'জেনেছি।' মুখ কালো হয়ে গেছে তরুণ প্রকাশকের। চাচাকে অপরাধী ভাবতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'সাড়ে দশটায় ওখানে গিয়ে পৌঁছেছিলো। দেরি হলো কেন জিজ্ঞেস করেছি। বললো, বেভারলি ড্রাইভে নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো। রাস্তা কিছুক্ষণের জন্যে ব্লক করে দিয়েছিলো পুলিশ।'

'তারমানে, নুবার প্রেসে আগুন তিনি লাগিয়ে থাকতে পারেন। পাণ্ডুলিপিটাও

চুরি করে থাকতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকালো উলফ। 'আমি ভাবতেই পারছি না চাচা একাজ করবে। কিন্তু মোটিভ রয়েছে তার, একথাও অস্বীকার করতে পারছি না। টাকার টানাটানি চলছিল। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না; পাণ্ডুলিপিটা চুরি করবে কেন? কি লাভ?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। এর মানে ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মাথায়। 'তার বিরুদ্ধে হয়তো কিছু লেখা ছিলো ওই পাণ্ডুলিপিতে, যেটা তার সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে। কী? আর তরুণ বয়েসে কি মিস ম্যাকাফির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো? হয়তো সে-কারণেই মিস ম্যাকাফির কথা উঠলেই তিনি চটে যান!'

আরও কয়েকবার ঠোঁটে চিমটি কাটলো সে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। 'আশ্চর্য! যেখান থেকেই শুরু করছি, ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় ফেরত আসছি, মিস থালিয়া ম্যাকাফি! একমাত্র তিনিই জানেন এখন, পাণ্ডুলিপিতে কি লেখা রয়েছে, আর তিনিই সেটা বলতে পারবেন আমাদের। তাঁর সঙ্গে যে করেই হোক কথা বলতে হবে আমাদের, আর বলতে হবে যখন লেমিল ডিফ থাকবে না। ওই লোকটাকে পছন্দ আগেই হয়নি, এখন সন্দেহ থেকেও বাদ রাখতে পারছি না আর।'

'কিন্তু কিভাবে দেখা করবো তাঁর সাথে?' উলফ বললো, 'ফোন ধরেন না তিনি। কারো কথার জবাব দেন না। বাইরে বেরোন না। ডাকবাক্সও হয়তো নিজে খোলেন না। তাহলে চিঠি লিখেও যোগাযোগ করা যাবে না।'

'লেমিলকে ফোন করে বলুন, তার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। কোনো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে। মোট কথা, কিছুক্ষণের জন্যে আটকে ফেলুন। দুই ঘন্টাই যথেষ্ট। ওই সুযোগে আমরা গিয়ে মিস ম্যাকাফির সঙ্গে কথা বলে আসবো।'

'কিন্তু কি কথা বলবো ডিফের সঙ্গে?'

'পাণ্ডুলিপি হারানোর কথা,' বলে দিলো রবিন।

'হারিয়েছে, আবার ফেরত পাওয়া যাবে। তোমরা বলেছো বের করে দেবে।'

'বলেছি। চেষ্টারও কসুর করছি না। কিন্তু একটা পাণ্ডুলিপি নষ্ট করা অতি সহজ কাজ। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেললেই হলো। হয়তো কোনোদিনই বের করতে পারবো না আমরা। আজ হোক কাল হোক লেমিলকে বলতেই হবে আপনার। কতোদিন আর চেপে রাখবেন? তিন দিন তো হয়েই গেল। টাকার জন্যে চাপ দিতে আরম্ভ করবে সে। নিন, ফোন করুন। বলুন, তার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

গুঙিয়ে উঠলো উলফ। 'আচ্ছাহ!'

ফোন করতে গেল সে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বললো, 'করেছি। কাল সাড়ে বারোটায় সান্তা মনিকার কোরাল কোভে আসতে বলেছি।'

'গুড,' বললো কিশোর।

নাকমুখ কুঁচকে রেখেছে মুসা। 'তাহলে সত্যিই মিস ম্যাকাফির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা? লেমিল না থাকলে হয়তো দরজাই খুলবেন না। কিংবা হয়তো এলিনা ফিউজ আটকাবে আমাদের। কুত্তা একটা আছে, মনে রেখো। বিশাল এক ডোবারম্যান পিনশার!'

'কিছুই ভুলিনি আমি। মনের জোর থাকলে দুনিয়ার কোনো কাজই অসম্ভব নয়। আর মিস ম্যাকাফি তো একজন মানুষ। দেখা তাঁর সঙ্গে করাই যাবে।'

তবে পরদিন দুপুরে যখন রওনা হলো ওরা, তখন কিশোরের মনের জোরও অনেকখানি কমে গেল। সাইকেল নিয়ে কোস্ট হাইওয়ে ধরে রবিন আর মুসার সঙ্গে চলেছে সে।

র‍্যাঞ্চের গেটের কাছে পৌঁছে মাঠের কিনারের ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়লো সাইকেল সহ।

'আগে লেমিল বেরিয়ে যাক,' কিশোর বললো। 'তারপর যাবো। কুত্তাটাকে ছেড়ে না রেখে গেলেই বাঁচি। আর রাখলেও ক্ষতি নেই। আমাদের আটক করবে ওটা। ঘেউ ঘেউ করে মনিবদের জানাবে। আমরাও মিস ম্যাকাফির নাম ধরে ডাকতে শুরু করবো। তিনিই এসে উদ্ধার করবেন আমাদের।'

এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল খোয়া বিছানো পথ ধরে।

'ওই. আসছে,' রবিন বললো।

ধুলোর ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল কালচে ধূসর রঙের একটা মারসিডিজ। ওটা হাইওয়েতে উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো তিন গোয়েন্দা। তারপর বেরিয়ে এলো সাইকেল নিয়ে। উঠে পড়লো লেবুবনের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া খোয়া বিছানো পথে। সাইকেল চালিয়ে চলেছে। কুকুরটা উদয় হচ্ছে না। কিন্তু যেই বাড়ির সামনে পৌঁছলো, ভেতরে কোনোখান থেকে শুরু হলো গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ চিৎকার।

'মারছে!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

সাইকেল রেখে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়লো কিশোর। বেল বাজালো।

কেউ এলো না দরজা খুলতে। আবার বাজালো সে। তারপর চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো, 'মিস ম্যাকাফি! মিস ম্যাকাফি! দরজা খুলুন, প্লীজ!'

দরজার ওপাশে লাফালাফি শুরু করলো কুকুরটা। পাল্লার গায়ে লাফিয়ে পড়ছে, নখের আঁচড় কাটছে, এপাশ থেকেই বোঝা গেল।

'চলো, ভাগি!' মুসা বললো।

'মিস ম্যাকাফি!' আবার ডাকলো কিশোর।

'কে?' দরজার ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো কেউ। 'এই ডিগু, থাম! চুপ কর!'

'কে, মিস ফিউজ? দরজাটা খুলুন দয়া করে। আমার নাম কিশোর পাশা। জরুরী কথা আছে।'

তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হলো পাল্লাটা। ঘুম ঘুম

চোখে তাকিয়ে রয়েছে ফ্যাকাসে নীল এক জোড়া চোখ। বিস্মিত। 'চলে যাও,' এলিনা বললো। 'জানো না, এখানে কলিং বেল বাজানো নিষেধ? কেউ বাজায় না।'

'তাহলে রেখেছেন কেন?' জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো কিশোরের। করলো না। বললো, 'মিস ম্যাকাফির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে এসেছি।'

'প্রকাশক?' প্রতিধ্বনি করলো যেন এলিনা। 'থালিয়ার কোনো প্রকাশক আছে বলে তো জানি না।'

সরে গেল এলিনা। পুরো খুলে দিলো পাল্লা। লম্বা চুল এসে পড়েছে মুখের ওপর। তাকিয়ে রয়েছে বটে কিশোরের দিকে, তবে তাকে দেখছে বলে মনে হয় না। কেমন শূন্য দৃষ্টি।

'মিস ফিউজ,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'আপনার শরীর ঠিক আছে?'

চোখ মিটমিট করলো মহিলা। যেন চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে পারছে না। গরগর করে উঠলো কুকুরটা।

'ওটাকে আটকে রাখুন কোথাও,' কুকুরটাকে দেখালো কিশোর। 'ভয় লাগছে।'

কুকুরটার কলার ধরে হাঁটতে শুরু করলো এলিনা। টলমল করছে পা। রান্নাঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো। তারপর ঢুকলো হলঘরে। ডাকলো, 'থালিয়া! দেখে যাও। কয়েকটা ছেলে এসেছে কথা বলতে।'

চারপাশে তাকালো কিশোর। লিভিং রুম দেখলো, তাতে রয়েছে সেই কাঠের চেয়ারগুলো। ডাইনিংরুমে বেঞ্চ। কান পেতে রয়েছে পদশব্দের আশায়। শোনা গেল না। শুধু টিকটিক করে বেজে চলেছে লিভিং রুমের ঘড়িটা। 'ভূতুড়ে দুর্গের মতো লাগছে জায়গাটাকে,' বললো সে। 'কিছু নড়ে না এখানে। কেউ আসে না, কেউ যায় না।'

'যাওয়া আসা?' ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বললো এলিনা। কিশোরের মনে হলো, যেন গলার ভেতরে মরচে পড়ে গেছে, সেজন্যেই স্বরটা ওরকম। 'কেন আসবে? কারো সাথে আর দেখা করি না আমরা। একসময় করতাম, জমজমাট ছিলো সব কিছু। এখন সব শেষ। আর লেমিল যখন থাকে না...' চুপ হয়ে গেল সে। যেন কোনো কিছু অবাক করেছে তাকে। 'লেমিল না থাকলে কি ঘটে? মনে করা শক্ত। সব সময়ই থাকে। এখন গেল কোথায়?'

'ড্রাগ দেয়া হয়েছে মহিলাকে!' কানের কাছে ফিসফিস করে বললো মুসা।

'মনে হয়,' একমত হলো কিশোর। এলিনার দিকে ফিরলো। 'মিস ম্যাকাফি কোথায়?'

হাত নেড়ে কি বোঝাতে চাইলো এলিনা। তারপর চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করলো।

'কাণ্ড! হচ্ছেটা কি বল তো!' অবাক হয়ে বললো রবিন।

খুঁজতে শুরু করলো তিন গোয়েন্দা। প্রথমে খুঁজলো নিচতলায়। তারপর

ওপরে উঠলো। এখানে আসার আগে মুসাই বেশি ভয় পেয়েছিলো, এখন যা করার আগে আগে সে-ই করতে লাগলো। সিঁড়ি বেয়ে সে-ই প্রথমে দৌড়ে উঠলো। কোণের দিকের একটা বড় বেডরুমে পাওয়া গেল মিস ম্যাকাফিকে। জানালা দিয়ে সাগর চোখে পড়ে। বড় একটা খাটের ওপর হাতে বোনা চাদর বিছানো। তাতে শুয়ে আছেন অভিনেত্রী। পরনে বাদামী গাউন। এতো চুপচাপ, প্রথমে তো মনে হলো নিঃশ্বাসই ফেলছেন না।

তাঁর কাঁধে হাত ছোঁয়ালো মুসা। নরম গলায় ডাকলো, 'মিস ম্যাকাফি?'

নড়লেন না মহিলা। তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে আরেকটু জোরে ডাকলো সে, মনের মধ্যে ঘুরছে কিশোরের কথাঃ ভূতুড়ে দুর্গের মতো লাগছে জায়গাটাকে! কিছু নড়ে না এখানে! তার সঙ্গে আরেকটা বাক্য যোগ করলো মুসাঃ আর দুর্গের ভেতরে শুয়ে রয়েছেন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী! সব কিছু যেন খাপে খাপে মিলে গেল পুরনো অদ্ভুত দুর্গের সাথে। কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গের কথা মনে পড়ে শিউরে উঠলো সে। জোর করে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করলো মন থেকে।

কিন্তু জাগছেন না কেন মহিলা? জাদু করে রেখে গেছে কেউ? জবাব দিচ্ছেন না কেন?

'কিশোর!' চিৎকার করে ডাকলো মুসা। 'রবিন! জলদি এসো! মিস ম্যাকাফিকে পেয়েছি, কিন্তু...মনে হয় বেঁচে নেই!'

সতের

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার,' পরামর্শ দিলো রবিন।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুললো মুসা, 'ঠিক হয়ে যাচ্ছেন!'

আস্তে একটা শব্দ করলেন মিস ম্যাকাফি। যেন প্রতিবাদ করছেন। তারপর চোখ মেললেন। ঘুমে জড়ানো ঘোলাটে দৃষ্টি।

'মিস ম্যাকাফি, কফি বানিয়ে এনেছি,' রবিন বললো। 'নিন, খাওয়ার চেষ্টা করুন।'

'থালিয়া!' বিছানায় বসলো এলিনা, তার হাতেও একটা কাপ। 'ওঠো। ছেলেগুলো খুব ভালো। কফি বানিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তবে ওরা বলছে, আমাদেরকে নাকি ওষুধ খাইয়েছে লেমিল, ঘুম পাড়ানোর জন্যে।'

জোর করে উঠে বসলেন মিস ম্যাকাফি, শরীরে বল পাচ্ছেন না যেন। রবিনের বাড়িয়ে দেয়া কাপটা নিলেন কাঁপা হাতে। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি এখনও। কয়েকবার চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমরা? কি জন্যে এসেছো?' ঘড়ঘড় শব্দ বেরোলো গলা দিয়ে।

'আগে কফিটা শেষ করুন,' মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। 'আমাদের কথা শুনতে হলে আগে মাথা পরিষ্কার হওয়া দরকার আপনার।'

কফি খেয়ে অনেকটা সুস্থ হলেন মিস ম্যাকাফি। বলতে শুরু করলো কিশোর, 'আমরা এলিনর হেসের কাজ করছি। তার ডাক নাম উলফ। আপনার পাণ্ডুলিপিটা

খুঁজে বের করতে তাকে সাহায্য করছি আমরা।'

'আমার পাণ্ডুলিপি?' বুঝতে পারছেন না যেন মিস ম্যাকাফি। 'কিসের পাণ্ডুলিপি?'

'আপনার মেমোয়ারস, স্মৃতিকথা, মিস ম্যাকাফি।'

'আমার স্মৃতিকথা? কই, শেষই তো করিনি। ও, তোমাদেরকে কিন্তু চিনতে পেরেছি! সেরাতে তোমরাই এসেছিলে, পাহাড়ে পথ ভুল করে। যেদিন যেদিন আমরা...'

'স্যাবাট অনুষ্ঠান করেছিলেন,' কিশোর বললো। 'লুকানোর কিছু নেই, মিস ম্যাকাফি। সব জানি আমরা।' একটা শিশি দেখালো। 'পেছনের বেডরুমের বাথরুমে পেয়েছি এটা। ঘুমের ওষুধ। বেরিয়ে যাওয়ার আগে খাইয়ে দিয়ে গেছে লেমিল, যাতে দরজা খুলতে না পারেন আপনারা। কারো সাথে কথা বলতে না পারেন।'

শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস ম্যাকাফি। 'যাওয়ার আগে চা বানিয়ে খাইয়েছিলো।'

'তাহলে তাতেই মিশিয়েছে,' রবিন বললো। 'আগেও কি বেরোনোর আগে এরকম করেছে সে?'

'দিন কয়েক আগে হঠাৎ বিকেল বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সাধারণত ওরকম সময়ে ঘুমাই না আমি। ভারি অদ্ভুত লেগেছিলো। আরও অবাক হয়েছিলাম, যখন এলিনা বললো, একই সময়ে ও-ও ঘুমিয়েছে।'

'সেই বিকেলেই হয়তো পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে উলফের অফিসে গিয়েছিলো লেমিল,' কিশোর অনুমান করলো।

'পাণ্ডুলিপি। এলিনর হেস।' কণ্ঠের জোর বেড়েছে মিস ম্যাকাফির। 'ব্যাপার কি, খুলে বল তো?'

বলতে লাগলো কিশোর। মাঝে মাঝে কথা জুগিয়ে দিলো রবিন আর মুসা। নুবার প্রেসে লেমিল ডিফের পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসা থেকে শুরু করলো। আগুন লাগার কথা বললো, পাণ্ডুলিপি চুরি যাওয়ার কথা বললো।

'মেমোয়ারস ছাপার কন্ট্রাক্টে আপনার সই রয়েছে,' কিশোর বললো। 'তার মানে ওটা জাল।'

'নিশ্চয়ই,' জোর দিয়ে বললেন মিস ম্যাকাফি। 'আমি কোনো কন্ট্রাক্ট সই করিনি। আর আমার লেখা স্মৃতিকথা এখনও এ বাড়িতেই আছে, আমার ড্রয়ারে। কাল রাতেও লিখেছি। ওই যে,' বিছানার পায়ের দিকে রাখা বড় একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার দেখালেন তিনি, 'ওটাতে আছে।'

ড্রয়ার খুললো মুসা। তিনজনেই দেখলো, হাতে লেখা একগাদা কাগজ পড়ে রয়েছে।

'এটা থেকেই নিশ্চয় নকল করেছে লেমিল,' রবিন বললো। 'তারপর নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছে উলফ হেসকে। তারপর? সে-ই কি চুরি করানোর ব্যবস্থা করেছে? চার্লস গুডফেলোকে দিয়ে?'

'গুডফেলো?' ভুরু কোঁচকালেন মিস ম্যাকাফি। 'চোরটা আবার এশহরে এসেছে নাকি?'

'ও, গুডফেলো তাহলে জাতে চোর!' কিশোর বললো।

'হ্যাঁ, চোর। হাতে নাতে ধরেছিলাম একবার। ক্যাথারিন দা গ্রেট ছবির শুটিঙের সময় ড্রেসিং রুমে ড্রয়ারে একটা হীরার হার খুলে রেখেছিলাম। সেটা চুরি করেছিলো সে। পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। হাতে পায়ে ধরে অনেক মাপ চাইলো। বললো, আর চুরি করবে না। ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন পর আবার চুরি করলো। কয়েকজন মহিলার ব্যাগ থেকে টাকা। দি অ্যাজফোডেল স্টোরির শুটিং চলছে তখন।'

'একেবারেই তো চোর,' রবিন বললো। 'তার কথা আপনার স্মৃতিকথায় লিখেছেন নাকি?'

'মনে হয় উল্লেখ করেছি।'

'এটা একটা মোটিভ। তার ভয়, বই পড়ে তাকে চিনে ফেলবে লোকে। যদিও আসল নাম সে কমই ব্যবহার করে। আর ল্যাবরেটরিতে ফিল্ম চুরি...'

'কিসের ফিল্ম?' জানতে চাইলেন মিস ম্যাকাফি।

'যেসব ছবি আপনি হারভে ভিডিওর কাছে বিক্রি করেছেন,' জবাব দিলো কিশোর। 'আপনি কি জানেন, আপনার সমস্ত ছবির নেগেটিভ টেলিভিশন কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে? নাকি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আপনার অজান্তেই এই কাজটাও করেছে লেমিল নিজেই?'

'না, এটা আমি জানি। কথাবার্তা সব সে-ই বলেছে, তবে চুক্তি সই করেছি আমি। কিন্তু চুরি গেছে বললে?'

'গেছে। নুবার প্রেসের পাশের একটা ল্যাবরেটরি থেকে। প্রেসে আগুন লাগার আগে। তারপর ওগুলো ফেরত দেয়া হবে বলে টাকা দাবি করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, নিরাপদেই আছে ওগুলো। টাকা পেলে ফিরিয়েও দেবে। আপনি জানেন, যে রাতে ওগুলো চুরি গেছে, সেরাতে এখানে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলো হেনরি ফগ? টেলিভিশনে দেখানোর জন্যে।'

'না তো!' অবাক হলেন মিস ম্যাকাফি। 'তাহলে সে-ই এসেছিলো? লেমিল আমাকে বলেছে, ব্যবসার কাজে একজন লোক আসবে। আমি দূরে রইলাম, সব সময়ই যেমন থাকি। কাজকর্মের দায়িত্ব সব তার ওপর, আমি কোনোটাতে নাক গলাই না।'

'পরের বিকেলেও দূরে দূরেই ছিলেন আপনি, যখন আমি আর উলফ এসেছিলাম,' কিশোর বললো।

'মিস ম্যাকাফি, নিজের জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছেন আপনি, বিপজ্জনক ফাঁদ, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অভিনেত্রী। 'আসলে লেমিলটাকে বিশ্বাস করেই ভুল করেছি। যতো নষ্টের মূল ওই শয়তানটা!'

'নুবার প্রেসের কাছে অগ্রীম টাকাও চেয়েছে। সবটাই মেরে দিতো, বোঝা

যাচ্ছে। আপনার নাম ভাঙিয়ে খেয়ে আপনাকেই ঠকাতো।'

'বেঈমান! ও এরকম করবে বিশ্বাসই করতে পারছি না!' থেমে কি যেন ভাবলেন। 'হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে! সব সময়ই সে লোভী। তবে সেটা যে এই পর্যায়ে নেমেছে, ছিহ! আমাকে মিথ্যে কথা বলে! ড্রাগ খাওয়ায়! মানুষ না লোকটা, পিশাচ!'

'কতোটা ক্ষতি করেছে, আরও কতোটা করার প্ল্যান করেছে, সেটা জানতে চান না?' পরামর্শ দিলো কিশোর, 'এক অভিনয় করুন না তার সাথে? ও আজকে যখন বাড়ি ফিরবে, ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকবেন। লক্ষ্য রাখবেন কি করে। একটা ফোন নম্বর দিয়ে যাবো, দরকার হলেই যাতে আমাদের পেতে পারেন। দুটোও দিতে পারি।'

'খালিয়া, তাই করো!' এলিনা বললো। 'লেমিলের সঙ্গে একটু রসিকতা করার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। সব সময় যেরকম গম্ভীর হয়ে থাকে, আর সিরিয়াস ভাব দেখায়, পিত্তি জ্বলে যায় আমার।'

'মজাটা ভালোই হবে,' একমত হলেন মিস ম্যাকাফি। 'কিন্তু ছেলেগুলোর কথা কেন বিশ্বাস করবো? লেমিল যে এসব করছে তার প্রমাণ দরকার।'

'প্রমাণ, না?' কমলা রঙের একটা ম্যাচের বাক্স বের করলো রবিন। 'একটা জারের মধ্যে পেয়েছি এটা। কফি বানাতে আগুন জ্বালার দরকার ছিলো। এতে জাভা আইলস রেস্টুরেন্টের নাম রয়েছে, যেটাতে নিয়মিত খেতে যায় ডেভিড ওয়ালটার।'

'তার মানে ওয়ালটারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলো লেমিল,' কিশোর বললো। 'ফিল্ম চুরির সঙ্গে সে-ও জড়িত। পাণ্ডুলিপি চুরিতে জড়িত। নুবার প্রেসে আগুন লাগানোতেও তার হাত আছে।'

'বেশ মজা, তাই না?' হাততালি দিয়ে বললো এলিনা। 'পুরনো আমলের সেই ছবিগুলোর মতো। যেখানে নায়িকা গোয়েন্দাকে সাহায্য করে। চোরগুলোকে আমরা ধরবোই!'

আঠারো

উলফের অ্যাপার্টমেন্টে পৌছতে পৌছতে চারটে বেজে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করছে তখন তরুণ প্রকাশক।

'আপনার লাঞ্চ কেমন হলো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'খারাপ না। সব চেয়ে দামী খাবার কিনে খাইয়েছি ওকে। দামী মার্টিনি। খেতেও পারে প্রচুর। গলা পর্যন্ত গিলে মুখের ভার কিছুটা কমলে তারপর কথা পাড়লাম। খারাপ খবরটা বললাম।

'খুব একটা চমকালো বলে মনে হলো না। শুনলোই না যেন। হেনরি ফগের কথা চালিয়ে গেল। টেলিভিশন থেকে লোকটাকে পাঠানো হয়েছে মিস ম্যাকাফির সাক্ষাৎকার নিতে, ফিল্মগুলো চুরি যাওয়ার পর। অথচ ম্যাডামের সঙ্গে দেখাই

করতে পারলো না। এতে নাকি বেশ মজা পেয়েছে লেমিল। হেনরিকে পছন্দ করে না সে। আমার মনে হয় পুরনো দিনে খুব একটা সদ্ভাব ছিলো না দু'জনের। আর থাকবেই বা কি? লেমিল তখন ছিলো সাধারণ এক শোফার।'

'ইনটারেসটিং,' কিশোর বললো।

'আরও বেশি ইনটারেসটিং মনে হলো,' উলফ বলতে থাকলো 'যখন পাণ্ডুলিপি খোয়া যাওয়ার কথাটা মাথায় ঢুকলো লেমিলের। পেঁচার মতো মুখ করে চোখ মিটমিট করতে লাগলো। ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, কয়েকবার আমাকে বললো কথাটা। তারপর বেশি ভেবে মন খারাপ করতে মানা করে দিলো। বললো, মিস ম্যাকাফি আবার নতুন করে লিখে দেবেন। তবে অ্যাডভান্সের টাকাটা ডবল করে দিতে হবে। নতুন করে আরেকটা চুক্তি করতে হবে।'

দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো উলফ। 'কি একটা বিপদে পড়লাম বল তো! নতুন করে আবার নুবার প্রেসের বাড়ি তুলতে হবে। যতোদিন সেটা না হয় একটা অফিস ভাড়া করে কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এজন্যে টাকা দরকার, প্রচুর টাকা। আর চাচাকে ছাড়া সেটা জোগাড় করতে পারবো না। তবে চাচা এলেও হয়তো পারবো না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে ধরবে, আগুন লাগিয়েছে সন্দেহে। নিজের বাড়ি নিজেই জ্বালিয়েছে বলে বীমা কোম্পানিও হয়তো টাকা দেবে না। আর ওদিকে লেমিল ডবল টাকা দাবি করে বসে আছে।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালো সে। 'লাঞ্চ খাইয়ে তো অনেক টাকা খরচ করলাম। কাজ হয়েছে কিছু?'

'হয়েছে। রিপোর্ট লিখেই এনেছে রবিন।'

হেসে পকেট থেকে নোটবুক বের করলো রবিন। তারপর পড়তে লাগলো। মন দিয়ে শুনলো উলফ। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখ। রবিনের শেষ হতে হতে পুরোপুরি হাসি ফুটলো তার মুখে। 'বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো সে। 'আর অ্যাডভান্সের টাকা দিতে হবে না!'

'না, লাগবে না,' কিশোর বললো। 'জাভা হোটেলে ওয়ালটারের সঙ্গে বসে খেয়েছে লেমিল। নিশ্চয় কথা হয়েছে অনেক। ফিল্মের জন্যেও নিশ্চয় তাকে টাকা দিতে চেয়েছে ওয়ালটার। তার মানে লেমিলও ওই চুরিতে জড়িত।'

'নুবার প্রেসে আগুন লাগানোর যন্ত্রটাও সে বসিয়ে থাকতে পারে,' কথার পিঠে যোগ করলো উলফ। 'তারও সুযোগ ছিলো সেটা করার। বাঁচলাম! সেটা অবশ্য প্রমাণ করতে হবে আমাদের। বললেই তো আর কেউ বিশ্বাস করবে না। আগুন লাগানোর সঙ্গে লেমিলকে জড়ানোর কোনো উপায় আছে? তাহলে চাচাকে বাঁচানো যায়। যেমন ধরো, যন্ত্রটার জন্যে নিশ্চয় ম্যাগনেশিয়াম কিনতে হয়েছে। কোন্ দোকান থেকে কে কিনলো, এটা বের করা যায় না?'

'কোনোখান থেকে তো নিশ্চয় জোগাড় করেছে,' খুশি হয়ে উঠলো কিশোর। 'অনেকগুলো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনার অ্যাপার্টমেন্টটা একটু খুঁজে দেখবেন?'

'খুঁজবো?' সোজা হয়ে গেল উলফ। 'কেন? কি পাওয়া যাবে?'

'ম্যাগনেশিয়াম।'

'কি বলছো তুমি! এখনও ভাবছো, চাচাই একাজ করেছে! দেখ, আমি জানি, আমার চাচার মতো ভালো মানুষ হয় না, লোকে যা-ই বলুক। এরকম একটা অন্যায় সে করতেই পারে না।'

'আমিও জানি পারেন না,' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। এমন ভঙ্গিতে মাথা কাত করে রেখেছে, যেন পাশের ঘরের কথা শুনছে। 'একটা ব্যাপার সারাক্ষণই আমাকে খুঁচিয়েছে এ-কেসের, যেটা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছিলাম না। এখন জানি সেটা কি। দেখেও দেখিনি আগে। আসলে, দুটো ব্যাপার মিস করেছি। প্রয়োজনের সময় খতিয়ে দেখে নেবো। প্রমাণ ওখানেই রয়েছে। আমি জানি, আছেই।'

'নিজের মনেই ভাবছে এখন কিশোর পাশা,' কৈফিয়ত দেয়ার মতো করে বললো মুসা। কিশোরের খাপছাড়া কথা বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে উলফ।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' উলফকে আশার কথা শোনালো রবিন। 'কিশোরের স্মৃতিটাকে আমরা ফটোগ্রাফিক মেমোরি বলি। কিছু দেখলে কিংবা শুনলে আর কখনও ভোলে না। সময় হলে কম্পিউটারের মতো স্মৃতির ভাঁড়ার ঘেঁটে ঠিক বের করে আনে দরকারী জিনিসটা।'

'অ্যাপার্টমেন্টটা খোঁজা দরকার,' কিশোর বললো। 'আপনার চাচার ঘর থেকেই শুরু করা যাক।'

'করো,' উলফ বললো। 'যদি লাভ হয়।'

বড় বেডরুমটায় ওদেরকে নিয়ে গেল সে। দক্ষিণমুখো জানালা। সোজা আলমারির কাছে চলে এলো কিশোর। স্লাইডিং ডোর এটার। ঘরের একপাশের প্রায় পুরো দেয়ালটাই জুড়ে রয়েছে। টেনে দরজা সরালো সে। ডজন ডজন চমৎকার ছাঁটের জ্যাকেট দেখা গেল। আর অসংখ্য চকচকে জুতো।

জ্যাকেটগুলোর পকেট হাতড়াতে শুরু করলো কিশোর। মিনিট কয়েক পরেই বললো, 'পেয়েছি!' চামড়ার রঙের একটা ফ্ল্যানেলের জ্যাকেটের পকেট থেকে টেনে বের করলো ধাতুর পাতলা একটা টুকরো।

'ম্যাগনেশিয়াম!' উলফ বললো।

'ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করতে নিলে তাই বলবে, আমি শিওর,' জবাব দিলো কিশোর। 'এখন আমি আরেকটা ব্যাপারে শিওর, যে আপনার চাচা আগুন লাগাননি। অযথাই আতঙ্কিত হয়ে পালিয়েছেন। তিনি অপরাধী হলে এটা এখানে রেখে যেতেন না।'

বিছানার পাশে রাখা ফোনটা বাজতে শুরু করলো।

'জবাব দিতে চান?' উলফকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। হাসছে। 'মিস ম্যাকাফিকে এই নম্বর দিয়ে বলে এসেছি অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে যেন যোগাযোগ করেন। আরেকটা নম্বর অবশ্য দিয়েছি। আমাদের হেডকোয়ার্টারের। মনে হয় কিছু একটা করে বসেছে লেমিল।'

রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালো উলফ। 'হ্যালো।' ওপাশের কথা শুনে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে। 'মিস ম্যাকাফিই। তোমাকে চাইছেন।'

উনিশ

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে হাসি ছড়িয়ে পড়লো কিশোরের মুখে! 'ভালো হয়েছে, মিস ম্যাকাফি,' অবশেষে বললো সে। 'এরকম কিছুই আশা করেছিলাম আমি। লেমিল যদি কিছু খেতে দেয়, নিয়ে খাওয়ার ভান করবেন মিস ফিউজকেও হুঁশিয়ার করে দিন। লেমিল যখন লোক ঢোকাবে, দু'জনেই সতর্ক থাকবেন। আর অবশ্যই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবেন।

'আপনারা সাহায্য করলে সব রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবো। পুলিশের কাছে প্রমাণ হাজির করতে পারবো। ওখানে আরেকজন লোক থাকলে খুব ভালো হতো, হেনরি ফগ।'

টেলিফোনে কিশোরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছে, শুধু তার কথা শুনে কিছু বুঝতে পারলো না ঘরের অন্যেরা। মাথা ঝাঁকালো সে। 'হ্যাঁ, কোনো অসুবিধেই হবে না তাতে। হারভে ডিভিওতে খোঁজ নিলেই ওরা আপনাকে ফগের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। তাকে বলবেন, মেমোয়ারসে তার ব্যাপারে কিছু লিখেছেন আপনি। সব কথা মনে নেই। কোনো কোনো ব্যাপারে সন্দেহ আছে তার সঙ্গে আলোচনা করতে চান ওসব ব্যাপার নিয়ে। কারণ কিছু ভুলভাল হয়ে গেলে লোকের কাছে বেকায়দা অবস্থা হয়ে যেতে পারে তার। ছুটতে ছুটতে আসবে তখন সে। বলবেন, রাত ন'টায় যেন আসে।'

ওপাশের কথা শুনতে লাগলো কিশোর। মাথা ঝাঁকালো। হাসলো। 'ফাইন। আমরা চলে আসবো। খেয়াল রাখবেন কুত্তাটা যেন ছাড়া না থাকে।'

রিসিভার রেখে দিলো সে। 'চার্লি নামে একজনকে ফোন করেছিলো লেমিল, মিস ম্যাকাফি শুনে ফেলেছেন। আজ রাতে লোকটাকে আসতে বলেছে সে। টাকা নাকি রেডি রাখবে।'

'চার্লস গুডফেলো!' বলে উঠলো মুসা।

'মনে হচ্ছে। আর মিস ম্যাকাফি যদি হেনরি ফগকে আনতে পারেন, একসাথে সব কিছুর সুরাহা করে ফেলতে পারবো আমরা। ডিফ, ফগ আর গুডফেলোকে একসাথে দেখতে ভালোই লাগবে আশা করি। কে কে আসতে চাও?'

'জিজ্ঞেস করছো কেন আবার? যাবোই তো,' মুসা বললো।

উলফ বললো, 'আমাকে নেবে?'

'নিশ্চয়। আপনার চাচাকে নিয়ে আসা দরকার। খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ভদ্রলোকের। পুরো ব্যাপারটা তাঁরও দেখা দরকার।'

'চমৎকার হবে। তা চাচাকে পাবে কোথায়?'

'চুরুট কেনেন কোত্থেকে?'

'তাঁ?'

'কাল সকালে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা চুরুটও ছিলো না তাঁর বাক্সে। দামী এমন একটা ব্র্যাণ্ড খান, যেটা সচরাচর পাওয়া যায় না। ঠিক বলেছি?'

মাথা ঝাঁকালো উলফ। 'স্পেশাল ডাচ সিগার খান। সব দোকানে পাওয়া যায় না ওই জিনিস।'

'নিজের গাড়িটা নিয়ে গেছেন, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকালো উলফ।

'যদি পথে পথে থাকেন, তাহলে আর কিছু করার নেই আমাদের। তবে আমার মনে হয় না ওরকম ড্রাইভিং ভালো লাগবে তাঁর এই সময়ে। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। ভাববেন সব সময় পুলিশ তাঁর ওপর নজর রাখছে। তবে যেখানেই থাকুন, ধূমপান তাঁকে করতেই হবে, বরং আগের চেয়ে বেশি। কারণ নার্ভাস হয়ে পড়লে বেশি সিগারেট টানে ধূমপায়ীরা। কোত্থেকে চুরুট কেনেন তিনি?'

'বারটন ওয়ের একটা ছোট দোকান থেকে। চাচার জন্যে বিশেষ অর্ডার দিয়ে চুরুট আনায় ওরা।'

'তাহলে গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিশ্চয় ওদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই উলফের গাড়িতে করে বারটন ওয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা।

'দোকানদারের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন,' উলফকে বললো কিশোর। 'গিয়েই আমরা প্রশ্ন শুরু করলে কিছু ভেবে বসতে পারে দোকানি। বলবেন, চাচা-ভাতিজায় ঝগড়া করেছেন। রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন উনি। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে গেছেন। তাঁকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করবেন।'

'বিশ্বাস করবে?'

'করবে। পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে একথা তো আর বলতে পারবেন না। পারবেন?'

'না, তাই কি আর বলা যায়,' হাসলো উলফ। মোড় নিয়ে আরেকটা রাস্তায় উঠে কিছুদূর এগিয়ে গাড়ি থামালো একটা ছোট দোকানের সামনে। দোকানটার নাম - দি হিউমিডর। 'আমার সাথে আসবে তোমরা?'

'কিশোর, তুমি যাও,' রবিন বললো। 'সবাই দল বেঁধে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না।'

গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকলো কিশোর আর উলফ। ওয়েস্টকোট পরা শাদাচুল একজন লোক ঝাড়ন দিয়ে কাউন্টার ঝাড়ছে।

'আরে, মিস্টার হেস, গুড আফটারনুন,' ঝাড়া থামিয়ে বলে উঠলো লোকটা। 'নিশ্চয় চাচার চুরুটের জন্যে এসেছেন! এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল?'

'না। মানে সেজন্যে আসিনি,' লাল হয়ে যাচ্ছে উলফের গাল। 'কাল চুরুট কিনেছিলো না?'

'হ্যাঁ, কিনেছে তো। তাই তো জিজ্ঞেস করছি এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে

গেল নাকি।'

'না, চুরুটের জন্যে আসিনি। আসলে, কাল ঝগড়া করেছিলাম। রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। ওরকমই তো স্বভাব। কিছু হলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাপটাপ চেয়ে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। কোথায় আছে জানেন? বলেছে?'

'না, কিছু বলেনি তো।'

উলফের কানে কানে কি বলে দিলো কিশোর।

'গাড়ি নিয়ে এসেছিলো?' জিজ্ঞেস করলো উলফ।

'মনে হয় না। হেঁটেই তো এলেন দেখলাম। বেরিয়ে ডান দিকে চলে গেলেন।'

'ও। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।'

প্রায় ছুটে দোকান থেকে বেরোলো উলফ। তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেলো দরজায়।

'কি করে এসব কাজ করো তোমরা!' বেরিয়েই বলে উঠলো সে। 'অসম্ভব! ইমপসিবল! আমি তো কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম!'

গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলো সে।

হাসলো কিশোর। 'দোকানদার কি বললো খেয়াল করেছেন? হেঁটে এসেছিলেন আপনার চাচা। তার মানে কাছাকাছিই কোথাও রয়েছেন। রাস্তা ধরে চালান, খুব ধীরে।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিলো উলফ। গড়িয়ে গড়িয়ে চললো গাড়ি। দু'পাশের বাড়িগুলোর সামনেটা দেখছে কিশোর, যেসব জায়গায় গাড়ি রাখা হয়। রবিন আর মুসাও দেখছে। আচমকা কাত হয়ে গিয়ে আঙুল তুললো রবিন। পথের বাঁয়ের ছোট একটা মোটেল দেখালো।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'এরকম জায়গাই মিস্টার হেসের থাকার উপযুক্ত। ভদ্রলোকের জায়গা। সাইনবোর্ড বলছে গাড়ি রাখার গ্যারেজও আছে। নিশ্চয় গাড়িটাও লুকিয়ে রাখতে চাইবেন তিনি।'

'তেইশ নম্বর রুমের পাশের গ্যারেজটাই একমাত্র বন্ধ দেখছি এখন,' মুসা বললো।

রুমটার পাশে পার্কিং স্পেসে গাড়ি ঢোকালো উলফ। নেমে পড়লো চারজনেই। তেইশ নম্বরের দরজায় টোকা দিলো উলফ। 'চাচা, ও চাচা, দরজা খোলো! জলদি!'

সাড়া নেই।

'মিস্টার হেস,' এবার কিশোর ডাকলো, 'খুলুন। আমরা জানি নুবার প্রেসে আগুন আপনি লাগাননি। আসল অপরাধীকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে যাবো আমরা। আমাদের সাথে আসতে চাইলে আসতে পারেন।'

পুরো একটা মিনিট নীরবতার পর দরজা খুলে গেল। 'বেশ,' বললেন হাইমার হেস, 'খুললাম দরজা। এসো, ভেতরে এসো। সব শুনি আগে, তারপর বুঝবো কি করা যায়।'

বিশ

গোধূলিবেলায় কোস্ট হাইওয়ে ধরে ম্যাকাফি র‍্যাঞ্চের দিকে চললো উলফ। তার সাথে রয়েছে তিন গোয়েন্দা আর হাইমার হেস। এখন আর আগের মতো বিষণ্ণ লাগছে না তাঁকে, উদ্বিগ্নও নয়, বরং উত্তেজিত। বার বার পকেটে হাত বোলাচ্ছেন, পিস্তলের ওপর।

র‍্যাঞ্চে ঢুকলো গাড়ি। বাড়ির সামনে একটা মারসিডিজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটার পেছনে হালকা রঙের আরেকটা ফোর্ড।

'নিশ্চয় ডেভিড ওয়ালটারের গাড়ি,' অনুমানে বললো কিশোর। 'মারসিডিজটা তো চিনিই, লেমিলের। ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে পালাতে না পারে।'

হাসলো মুসা। দরজায় টান দিয়ে দেখলো দুটো গাড়িরই। তালা নেই। 'ভালো,' বললো সে। পকেট থেকে প্লায়ার্স বের করে কাজে লেগে গেল। ইগনিশনের তার কেটে দিলো। চাবি দিয়ে আর কাজ হবে না, স্টার্ট নেবে না এঞ্জিন।

'আমি এখানেই থাকি,' বললো সে। 'হেনরি না আসাতক। লুকিয়ে থাকবো। গুড লাক।'

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো অন্য চারজন। ভেতরে উত্তেজিত ঘেউ ঘেউ শুরু হয়ে গেল। তবে অনেক দূর থেকে আসছে মনে হচ্ছে, আর কেমন যেন চাপা স্বর।

'সেলারে আটকেছে কুত্তাটাকে,' রবিন বললো।

'ভালোই হয়েছে,' বললো কিশোর। 'ওই জানোয়ারটার মুখোমুখি হতে চাই না আমি। দেখলেই ভয় লাগে। লেমিলের কথা মানে ও। কামড়ে দিতে বললে দেবে কামড়ে।'

বারান্দায় উঠে বেল বাজালো কিশোর।

হলে পায়ের আওয়াজ হলো। ভেতর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো লেমিল, 'কে?'

চেঁচিয়ে জবাব দিলো কিশোর, 'মিস্টার ডিফের সঙ্গে কথা আছে।'

দরজা খুলে গেল। তাকিয়ে রয়েছে লেমিল।

'মিস্টার হাইমার হেস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান,' কিশোর বললো। 'আর মিস্টার এলিনর হেসও। সে-জন্যেই এসেছেন দু'জনে।'

সরে জায়গা করে দিলো কিশোর। তার পাশে এসে দাঁড়ালো উলফ। লেমিলকে বললো, 'খবর না দিয়ে হুট করে চলে এলাম। সরি। কিন্তু আসাটা জরুরী ছিলো।'

দরজায় বাধা হয়ে দাঁড়ালো লেমিল। 'কি হয়েছে? আপনাদের ঢুকতে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিলো না, কিন্তু ম্যাডাম শুয়ে পড়েছেন। বিরক্ত করলে রেগে যাবেন।'

তার কথার পরোয়া করলো না উলফ। ঠেলে পাল্লা পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার পেছনেই ঢুকলো দুই গোয়েন্দা আর হাইমার হেস।

'কিশোর পাশার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে আপনার,' তাকে দেখিয়ে বললো উলফ। 'কৌতূহল তার খুব বেশি। অনেকের ধারণা, অন্যের ব্যাপারে বেশি নাক গলায়। তার কৌতূহল মেটাতেই আজ রাতে আসা। অবশ্য আমারও যে কিছুটা নেই, তা নয়।'

উলফ আর কিশোরকে এগোতে দেখে পিছিয়ে গেল লেমিল। পিছাতে পিছাতে একেবারে লিভিং রুমের মধ্যেই ঢুকে পড়লো। সেখানে পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ডেভিড ওয়ালটার। হাতের প্যাকেটটা লুকানোর জায়গা খুঁজছে।

'পাণ্ডুলিপিটা, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'নুবার প্রেসে যেদিন আগুন লেগেছিলো, সেদিন এলিনর হেসের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চুরি করেছিলেন।'

প্যাকেটটা ওয়ালটারের হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়ে ছিঁড়ে গেল আবরণ। ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়লো অনেকগুলো কাগজ। ঘুরে জানালার দিকে দৌড় মারলো সে।

'খবরদার, ওয়ালটার!' ধমক দিয়ে বললেন হাইমার হেস।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল ওয়ালটার। হাইমারের হাতে পিস্তল দেখে আর এক পা-ও নড়লো না।

মেঝে থেকে পাণ্ডুলিপিটা কুড়িয়ে নিলো উলফ। পাতা উল্টে দেখলো। শুরুর কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়লো। হাসলো তারপর। 'এটাই।'

হলে ফিরে এলো কিশোর। ডাকলো, 'মিস ম্যাকাফি?'

'উনি ঘুমিয়েছেন,' লেমিল বললো। 'ডাকাডাকি করবে না। ঘুম ভাঙালে বিরক্ত হবেন। ওসব কাগজের ব্যাপার কিছু জানি না আমি। লোকটা নিয়ে এসেছে...'

মুখের কথা মুখেই আটকে গেল তার। মিস ম্যাকাফিকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে। তাঁর শাদা-সোনালি চুল আলগা খোঁপা করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ঘাড়ের ওপর। সুন্দর মুখে হাসি। দুঃখ এবং খুশি মেশানো।

'লেমিল,' কণ্ঠস্বরে সামান্য ধার প্রকাশ পেলো তাঁর, 'আমাকে জাগতে দেখে নিশ্চয় চমকে গেছ। তুমি নিশ্চয় আশা করোনি এভাবে নেমে আসতে পারি আমি?'

ওয়ালটারের ওপর চোখ পড়লো তাঁর। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। 'আরে, চার্লসও আছো দেখছি। তোমার সাথে আবার দেখা হবে ভাবিনি। খুশি হলাম।'

লিভিং রুমে এসে চেয়ারে বসলেন তিনি। এলিনাও নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। ফ্যাকাসে নীল চোখে মিটিমিটি হাসি। মিস ম্যাকাফির পেছনে জানালার চৌকাঠে উঠে বসলো সে।

'ওগুলো কি?' উলফের হাতের কাগজগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অভিনেত্রী।

হেসে কাগজগুলো মিস ম্যাকাফির হাতে দিলো উলফ। 'আমার নাম এলিনর হেস, মিস ম্যাকাফি। ডাক নাম উলফ। আমার অফিসে দিয়ে এসেছিলো লেমিল ডিফ। যেদিন আপনার ফিল্মগুলো চুরি গেছে সেদিন বিকেলে।'

দ্রুত প্রথম পৃষ্ঠাটায় চোখ বোলালেন মিস ম্যাকাফি। 'আমার কপিটার হুবহু নকল। ইস্, লেমিল, তুমি কী? আমার লেখা নকল করে আমারই পাণ্ডুলিপি বলে দিয়ে এসেছো। এরকম একটা কাজ করে পার পাবে ভেবেছিলে কি করে? একদিন না একদিন আমি জেনে যেতামই, ছাপা হলে।'

বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। বেল বাজলো।

'হেনরি ফগ এসেছে,' মিস ম্যাকাফি বললেন। 'এলিনা, নিয়ে এসো ওকে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল এলিনা। ফিরে এলো হেনরি ফগকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরের মধ্যে নজর পড়তেই কঠিন হয়ে গেল লোকটার চেহারা। মিস ম্যাকাফির কাছে এসে সামান্য মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো।

'আজ পার্টি দিচ্ছেন একথা কিন্তু বলেননি,' ফগ বললো।

'বহু বছর পর দিলাম,' মিস ম্যাকাফি বললেন। 'বসো। হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই। ও কিশোর পাশা। আগেও বোধহয় দেখা হয়েছে তোমার সাথে। ও-ই এসে আমাকে বললো আমার পাণ্ডুলিপি নকল করে মিস্টার হেসের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে লেমিল। আমার ধারণা, তারপর সেটা চুরি করানোর ব্যবস্থাও সে-ই করিয়েছে। ঠিক বললাম না কিশোর?'

'হ্যাঁ, তাই ঘটেছে,' জবাব দিলো কিশোর। 'গল্পটা খুলেই বলি। এর অনেকটাই আমার আন্দাজ। তবে আশা করি সেটা যাচাই করে দেখে নিতে পারবো।

'কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই চার্লস গুডফেলো ওরফে ডেভিড ওয়ালটারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় লেমিল ডিফের, জাভা আইলস রেস্টুরেন্টে। ওখানেই জানতে পারে, ওয়ালটার একটা প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করছে। লেমিলের মগজ শয়তানী বুদ্ধিতে ঠাসা, সারাক্ষণই অন্যায় ভাবে টাকা রোজগারের চিন্তায় থাকে। তার মাথায় এলো মিস ম্যাকাফির পাণ্ডুলিপি নকল করে বিক্রি করে দেয়ার বুদ্ধিটা। একই সাথে বইটা প্রকাশ করা ঠেকানোরও প্ল্যান করলো। কারণ তার জানা আছে এভাবে অন্যের জিনিস চুরি করে এনে ছাপা যায় না। কথাটা জানাজানি হবেই।

'লেমিল ঠিক করলো, পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে অ্যাডভান্সের টাকাটা মেরে দেবে সে। তারপর ওটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। উলফের কাছ থেকে চুরি গেলে সে-ও কিছু বলতে পারবে না। বরং নরম হয়ে থাকবে লেমিলের কাছে। তারপর সুযোগ মতো মিস ম্যাকাফিকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উলফের কাছেই আসল পাণ্ডুলিপিটা আবার বিক্রি করবে লেমিল। প্রথম কপিটা চুরি যাওয়ায় এমনিতেই অপরাধী হয়ে থাকবে উলফ, নিজের কাছেই, দ্বিতীয়টা তখন ডবল অ্যাডভান্স দিয়ে নিতেও আপত্তি করবে না।

'গুডফেলোর সঙ্গে আলাপ করলো লেমিল। রাজি হলো গুডফেলো। হলো, মানে, বাধ্য হলো। তাকে ব্ল্যাকমেইল করলো লেমিল। ভয় দেখালো, রাজি না হলে

তার আসল পরিচয় হেসের কাছে ফাঁস করে দেবে। সে যে একবার মিস ম্যাকাফির হার চুরি করে ধরা পড়েছিলো, বলে দেবে। চোরকে তখন আর চাকরিতে রাখবেন না হেস। তারপর এলো কিভাবে পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করবে সেই প্রশ্ন। নুবার প্রেসে আগুন লাগিয়ে দিলো গুডফেলো। তারপর যখন জানলো আগুনে পোড়েনি পাণ্ডুলিপিটা, উলফের কাছে রয়ে গেছে, তখন গেল তার বাড়িতে চুরি করার জন্যে। উলফের ডেস্ক থেকে চাবি চুরি করে নিয়ে গিয়ে ডুপ্লিকেট বানিয়ে রেখেছিলো আগেই, আমি শিওর। জাত চোর লোকটা। স্বভাবই ওরকম। কোথাও মূল্যবান কিছু আছে ভাবলে, আর সিন্দুক-আলমারির চাবি পেলে ডুপ্লিকেট বানিয়ে রাখবেই, পরে কাজে লাগানোর জন্যে। এই ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিলো, আমার বিশ্বাস। ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করতো সে।

নিশ্চয় সেখানকার চাবিও ছিলো তার কাছে। কাজেই গিয়ে স্টোররুম খুলে ম্যাগনেশিয়াম চুরি করে আনতে অসুবিধে হয়নি। বোকামিটা করেছে মিস্টার হেসের ওপর দোষটা চাপাতে গিয়ে, তার জ্যাকেটের পকেটে ম্যাগনেশিয়ামের টুকরো রেখে। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলো।'

মুখ তুললেন মিস ম্যাকাফি। 'আমার ফিল্ম চুরির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? ওই ডাকাতির তুলনায় পাণ্ডুলিপি জাল করাটা কোনো অপরাধই না। ওগুলো থেকে পঁচিশ লাখ ডলার পেয়ে যেতো ওরা।'

'আজ বিকেলেই টাকাটা নিয়ে নিয়েছে, মিস ম্যাকাফি,' জানালো কিশোর। 'আপনি জানেন না। ছ'টার খবরে বলেছে। পঁচিশ লাখ ডলারের নোটের একটা প্যাকেট হলিউড বাউলের কাছে একটা পার্কিং লটে রেখে দিয়ে এসেছিলো হারভে ভিডিওর প্রতিনিধি। তাকে বলে দেয়া হয়েছে, ফোনে, যেন ব্রনসন ক্যানিয়ন থেকে ফিল্ম ভর্তি ভ্যানটা নিয়ে আসে। ওখানে রেখে দেয়া হবে।'

অবাক হয়ে গেছেন মিস ম্যাকাফি। 'সাংঘাতিক কাণ্ড! কিন্তু…কিন্তু আজ বিকেলে তো লেমিল বাড়িতে ছিলো!'

'ফিল্ম চুরিতে লেমিল জড়িত নয়,' কিশোর বললো। 'তাতেও সাহায্য করেছে ডেভিড ওয়ালটার। আসল হোতা হেনরি ফগ।'

'পাগল হয়ে গেছে!' চিৎকার করে বললো ফগ।

জবাব দিলো না কিশোর। হলে গিয়ে ঢুকে দরজা খুলে দিলো। 'এসো।'

আবার লিভিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়ালো সে। পাশে মুসা।

'অবাক হয়েছেন?' ফগের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালো কিশোর। 'হওয়ারই কথা। কারণ, তাকে গাড়ির ট্রাঙ্কে আটকে ফেলে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন মরে গেছে, না? কিংবা কোন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।'

একুশ

'পাগল! বদ্ধ উন্মাদ তুমি!' ফগ বললো। 'এখানে আর থাকছি না আমি। শুধু শুধু অপমান হতে হবে।'

'আপনি থাকলেই আমরা খুশি হবো,' পিস্তল দেখালেন হাইমার হেস।

চেয়ারে বসে পড়লো ফগ। কোলের ওপর হাত। 'বেশ। বাধ্য করলে আর কি করবো!'

হাসলো উলফ। 'হয়েছে, কিশোর। বলে যাও।'

ঘরের ভেতরে ফিরে এলো কিশোর। 'সেদিন তার অফিসে গিয়েছিলাম,' হেনরিকে দেখালো সে। 'বললো ড্রাগ অ্যাবিউজের ওপর গবেষণা করছে, টিভি সিরিয়াল করার জন্যে। বলেছে, খোঁজ পেয়েছে কিছু ওষুধ কোম্পানি নাকি ড্রাগ স্মাগলিঙে জড়িত। আমার মনে হয় ওসবের খোঁজখবর করতে গিয়েই ওয়ালটারের সঙ্গে তার পরিচয়। তখন ওষুধ কোম্পানিতেই চাকরি করতো ওয়ালটার। লেমিল ডিফের মতোই হেনরি ফগও চিনতে পারলো তাকে। জানে, মিস ম্যাকাফির হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সে। চোর, একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে কোথাও চাকরি করতে পারবে না ওয়ালটার। সেই সুযোগটাই নিলো ফগ। তাকে ব্ল্যাকমেইল করলো। চাপ দিতে লাগলো তার হয়ে কাজ করে দেয়ার জন্যে।'

'হেনরি,' উলফ জিজ্ঞেস করলো, 'এই কাজই করেছেন, তাই না?'

'আমি কিছু বলতে চাই না,' মুখ ঘুরিয়ে নিলো ফগ।

'ওয়ালটার, কতো দিন ধরে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করছে ফগ?'

'আমি শুধু উকিলের সঙ্গে কথা বলবো,' রুক্ষ স্বরে জবাব দিলো ওয়ালটার। 'আর কারো সঙ্গে নয়।'

'বেশ,' মোটেও নিরাশ হলো না কিশোর। আগের কথার খেই ধরলো, 'ওই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে বেশ নাড়া খেলো হেনরি ফগ। শুনলো, হারভে ভিডিও মিস ম্যাকাফির সমস্ত ফিল্মের নেগেটিভ কিনতে রাজি হয়েছে। ফগকে বলে দিলো কোম্পানি, আপাতত ড্রাগ অ্যাবিউজের ওপর টাকা খরচ করতে পারবে না, কারণ বাজেট অন্য কিছুতে খরচ করে ফেলা হয়েছে।

'হেনরি বেশ বিরক্ত হয়েছিলো, কোনো সন্দেহ নেই। মিস ম্যাকাফিকে দেখতে পারে না সে। আরেকটা কথা ভাবলো সে, সারা জীবনের পরিশ্রমের ফসল নষ্ট হতে দেখলে নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে যাবেন তিনি। সে যা বলবে তাতেই রাজি হয়ে যাবেন। ফিল্মগুলো চুরি করে শেষে চাপ দিয়ে মিস ম্যাকাফির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করতে পারবে।

'হেনরি ফগ জানে, কোন্‌দিন ল্যাবরেটরিতে ফিল্মগুলো পাঠানো হবে সেই খবর বের করতে পারবে সে। হারভে ভিডিওর যে কোনো কর্মচারীর পক্ষেই সেটা জানা কঠিন কিছু না। তাছাড়া ওটা গোপন কোনো ব্যাপারও নয়। তৈরি হতে লাগলো সে। ওয়ালটারকে বাধ্য করলো ওষুধ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে ল্যাবরেটরির পাশের কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে। প্রথমে রাজি না হলেও শেষে যখন ওয়ালটার দেখলো নুবার প্রেসে বেশ বড় পোস্টে চাকরি পাচ্ছে, লুফেই নিলো সে।

'ল্যাবরেটরিতে এলো ফিল্মগুলো। আগে থেকেই নজর রেখেছে ওয়ালটার। ততোদিনে তার জানা হয়ে গেছে ল্যাবরেটরির কর্মচারীদের কাজের শিডিউল।

দেখেছে বেশির ভাগ কর্মচারীই বিকেল পাঁচটার পরে বেরিয়ে যায়। যেদিন ডাকাতি করলো, সেদিন অফিস ছুটির পর বেরিয়ে গিয়ে হেনরি ফগের সঙ্গে মিলিত হলো সে। দু'জনে মিলে ঢুকে পড়লো ল্যাবরেটরিতে। টেকনিশিয়ানকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফিল্মগুলো গাড়িতে তুলে নিয়ে পালালো।

'সেদিন বিকেলটা খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ওয়ালটারকে। কারণ সেই দিনই নুবার প্রেসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছে লেমিল। ডাকাতি করার সুবিধের জন্যে আগুন লাগানোর যন্ত্রটা পাততে হয়েছে। তারপর ফিল্ম চুরি করে রেখে এসে খোঁজ নিতে হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা পুড়েছে কিনা। পোড়েনি শুনে ছুটে যেতে হয়েছে উলফের বাড়িতে, চুরি করার জন্যে।'

'অযথা বকবক করছো,' কঠোর স্বরে বললো হেনরি ফগ। 'এর কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তা পারবো,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'প্রথমে বেশ অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কিছু। তারপর সব খাপে খাপে মিলে গেল।

'ফিল্ম চুরি করেছেন যে-রাতে সে-রাতে এখানে এসেছিলেন লেমিল ডিফের সাক্ষাৎকার নিতে। বলেছেন, ডাকাতিটা করেছে দু'জন লোকে। কথাটা ঠিক। কিন্তু কি করে জানলেন দু'জনেই করেছে? আপনার জানার তো কোনো উপায়ই ছিলো না, নিজে এতে জড়িত না থাকলে। পুলিশ পর্যন্ত জানতো না তখনও। কারণ টেকনিশিয়ানকে বেহুঁশ করে ফেলেছিলেন। সে ছাড়া ডাকাতির আর কোনো সাক্ষী ছিলো না। পুলিশ সে খবর জানার অনেক আগেই লেমিল আর আপনার সাক্ষাৎকার রেকর্ড হয়ে গেছে।'

শ্রাগ করলো হেনরি। 'আমি আন্দাজ করে বলেছিলাম দু'জন লোকে করতে পারে।'

'তা নাহয় বললেন। কিন্তু আঙুলের ছাপের ব্যাপারে কি যুক্তি দেখাবেন?'

'আঙুলের ছাপ? কিসের আঙুলের ছাপ?'

'আপনার। আপনি দেখেছেন, ওয়ালটারকে অনুসরণ করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে গেছে মুসা। ফিল্ম ভর্তি গাড়িটা সরানোর প্রয়োজন ছিলো ওয়ালটারের। কারণ তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে অ্যারসন স্কোয়াড, আগুন লাগানোর ব্যাপারে। মুসাকে দেখে আপনিও গেলেন ঘাবড়ে। পিছু নিলেন তার। শেষ করে দিতে চাইলেন ওকে। সে কে, কি করছে, কিছুই জানতেন না আপনি, তবু কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। খুনের চিহ্ন না রেখে খুন করতে চাইলেন তাকে। ট্রাঙ্কে আটকে মারা গেলে সবাই ভাববে শয়তানী করে বা অন্য কোনো কারণে ট্রাঙ্কে ঢুকেছিলো ছেলেটা। ডালাটা আটকে যায় অ্যাকসিডেন্টালি। আর বেরোতে পারেনি। দম বন্ধ হয়ে আর গরমে মারা পড়েছে। চমৎকার বুদ্ধি! যাই হোক, সে যখন সাহায্যের জন্যে ফোন করার চেষ্টা করলো, পেছন থেকে ঘাড়ে বাড়ি মেরে তাকে বেহুঁশ করে ফেললেন। তারপর নিয়ে গিয়ে ভরলেন ট্রাঙ্কের মধ্যে। ডালায় আঙুলের ছাপ রেখে এসেছেন আপনি।'

প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেললো হেনরি।

'কিভাবে পারলে!' রাগ আর চেপে রাখতে পারছেন না মিস ম্যাকাফি। 'একটা ছেলেকে ওভাবে খুনের চেষ্টা! তুমি মানুষ না!'

'তারপর রয়েছে টাকা,' কিশোর বললো। 'হারভে ভিডিওর দেয়া টাকা। ওয়ালটারের গাড়িতে ওই টাকার কিছু এখনও রয়ে গেলে অবাক হবো না। আজ বিকেলে মাত্র দেয়া হয়েছে। আপনার গাড়িতে খুঁজলেও হয়তো পাওয়া যাবে কিছু। সরানোর সময় পাননি এতো তাড়াতাড়ি। গিয়ে দেখবো নাকি গাড়িগুলোতে?'

'খবরদার! আমার গাড়িতে হাত দেবে না! ভলো হবে না!' বলেই দরজার দিকে দৌড় দিলো ওয়ালটার। পিস্তলের ভয় আর করলো না।

ঝট্ করে পা বাড়িয়ে দিলো উলফ। পা বেধে উড়ে গিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়লো ওয়ালটার। সুটের পকেট লাগলো কিসের সঙ্গে যেন, গেল ছিঁড়ে। মানিব্যাগটা বেরিয়ে পড়লো মেঝেতে। আর তিনটে চাবির রিঙ, চাবিতে ঠাসা।

'বাহ্!' উলফ বললো।

'আইনের সাহায্য নেবো আমি!' হুমকি দিলো ওয়ালটার। 'সার্চ ওয়ারেন্ট নেই, তারপরেও আমার গায়ে হাত দিয়েছো কি আছে দেখার জন্যে!'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেমিল। তার কথা ভুলেই গেছে সবাই। উলফ চাবির রিঙ তুলতেই নড়ে উঠলো সে। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'লেমিল!' চিৎকার করে ডাকলেন মিস ম্যাকাফি।

'থাক, যেতে দিন,' হাত তুললো মুসা। 'পালাতে পারবে না। গাড়ির এঞ্জিনই স্টার্ট দিতে পারবে না। বেকার করে দিয়ে এসেছি। এদের কেউই পারবে না,' হেনরি আর ওয়ালটারকে দেখালো সে। 'গাড়ি চালাতে না পেরে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে ডিফ। সহজেই ধরে ফেলতে পারবে পুলিশ।'

কিন্তু ওই সময় বাইরে এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

'মরেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো উলফ। 'আমার গাড়ি! আমারটা নিয়ে যাচ্ছে! চাবি ফেলে এসেছিলাম!'

রান্নাঘরে ছুটলো মুসা। ফোনটা রয়েছে ওখানে।

জানালার কাছে দৌড়ে গেলেন মিস ম্যাকাফি। 'কপালে দুঃখ আছে ওর!' একঘেয়ে কণ্ঠে কেমন এক স্বরে বললেন তিনি, ঠিক বোঝানো যায় না। 'ওর কপালে ভীষণ দুঃখ!'

লেবুবনে হেডলাইটের আলো ঝিলিক দিতে দেখলো রবিন আর কিশোর। রাস্তায় পৌছে মোড় নিলো গাড়ি। গতি সামান্যতম কমলো না।

'মরবে তো!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

রাস্তায় ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো টায়ার। চেঁচিয়ে উঠলেন মিস ম্যাকাফি।

মুহূর্ত পরেই কানে এলো কাঁচ ভাঙার আর ধাতুর পাত ছেঁড়ার বিচ্ছিরি আওয়াজ, গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে গাড়ি। তারপর নীরবতা। যেন মারাত্মক

নীরবতা! মুখে হাত চাপা দিয়ে ফেলেছেন তিনি। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে নীল চোখ।

'থালিয়া!' এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাহুতে হাত রাখলো এলিনা। 'তুমি এরকম করছো কেন? তোমার কোনো দোষ নেই!'

'সেই আগের বারের মতোই! আবার একই ঘটনা! জিটার যেভাবে মারা গিয়েছে!' ফোঁপাতে শুরু করলেন মিস ম্যাকাফি।

'কোইনসিডেন্স!' বিড়বিড় করলো কিশোর।

ফিরে এলো মুসা। 'শেরিফ আসছেন। অ্যামবুলেন্স আনতেও বলেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর। পিছু নিলো রবিন, মুসা আর উলফ। লেমিলের অবস্থা দেখার জন্যে।

বাইশ

এক হপ্তা পরে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এসেছে তিন গোয়েন্দা, কেসের রিপোর্ট দেয়ার জন্যে। তিন গোয়েন্দাকে বসতে ইশারা করে তিনি বললেন, 'আশা করি সব লিখে এনেছো। দেখি?' হাত বাড়ালেন তিনি।

হেসে একটা ফাইল ফোল্ডার টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো রবিন।

'একসেলেন্ট,' পরিচালক বললেন। 'টাকা, ফিল্ম, পাণ্ডুলিপি সবই উদ্ধার করেছো। বেশ ইনটারেসটিং কেস। জানি ওসব। পেপারে পড়েছি। তবে আরও কিছু জানার আছে তোমাদের কাছে।'

পড়তে আরম্ভ করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। শেষ পাতাটা পড়ার আগে কোনো কথা বলেন না। 'চমৎকার!' অবশেষে মুখ তুললেন তিনি। 'নিজের দোষেই অপরাধের শিকার হয়েছেন মহিলা। নিজের অপরাধ বোধ, আর মানুষের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার কারণে। অতিরিক্ত বিশ্বাসও আরেকটা কারণ।'

'ভুল লোককে বিশ্বাস করেছেন বলেই এই অবস্থা,' মুসা বললো। 'তাঁকে ঠকিয়েই যেতো লোকটা, যদি আমরা এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়তাম। তাঁর সম্পত্তি আর টাকাপয়সার হিসেব মেলাচ্ছে এখন অ্যাকাউনটেন্ট। কতোটা চুরি করেছে লেমিল, জানার চেষ্টা করছে। কাউন্টি হাসপাতালের প্রিজন ওয়ার্ডে রয়েছে এখন সে। সমস্ত তথ্য জানা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।'

'ভাগ্য ভালো, বেঁচে গেছে,' পরিচালক বললেন। 'ব্রেক ফেল করে জিটার কার্লোস তো বাঁচেনি। মিস ম্যাকাফির অভিশাপেই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে একথা আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীতে নানারকম উদ্ভট ঘটনা ঘটে, রহস্যময় ব্যাপার ঘটে, এটা ঠিক, তবে সবগুলোর পেছনেই কোনো না কোনো কারণ থাকেই। ভালো মতো খোঁজা গেলে জবাব বেরোতে পারে। ডাইনীর অভিশাপে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট··· না, এ-হতে পারে না।'

কিশোর হাসলো। 'সেটা কোনোদিনই জানতে পারবো না আমরা। এলিনর

হেসের ধারণা, তার গাড়িটা নিয়েছে বলেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লেমিল। তার কথায় যুক্তি আছে। নতুন গাড়ি, যেটা চালানোয় অভ্যস্ত নয় লেমিল। তাছাড়া ভীষণ উত্তেজিত ছিলো। মোড়টাও খারাপ। এতো জোরে গাড়ি চালালে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। যাই হোক, উলফের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তার নতুন গাড়ির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে লেমিল।'

'উলফের যুক্তির কথা মিস ম্যাকাফিকে শুনিয়েছো? ভালো করেছো। কিছুটা স্বস্তি এতে পাবেন তিনি। ভাবতে পারবেন তাঁর অভিশাপে অ্যাক্সিডেন্ট করেনি জিটার আর লেমিল।'

'সেটা ভেবেই এখন মনকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি,' রবিন বললো। 'তাঁর জাদু ক্ষমতা প্রয়োগ করে উলফকে ভালো করার চেষ্টা করছেন। ওই যে খালি হোঁচট খায়, আছাড় পড়ে, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে, এসব। মিস ম্যাকাফির ধারণা এটা একধরনের রোগ। ইদানীং আর সে ততো হোঁচট খাচ্ছে না। তাই মনে হয় ওষুধ কাজ করছে।'

'আরও একটা কারণ হতে পারে, যে কারণে ভালো হয়ে যাচ্ছে,' মুসা বললো। 'তার চাচা হাইমার হেসও আর আগের মতো দুর্ব্যবহার করছেন না, ধমক ধামক মারছেন না। ফলে ঘাবড়ে যাচ্ছে না উলফ। সবার সঙ্গেই তিনি ভালো ব্যবহার অভ্যাস করছেন।'

'আচ্ছা, প্রমাণ কি কিছু পাওয়া গেল?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'ট্রাঙ্কের ডালায় হেনরি ফগের আঙুলের ছাপ পেয়েছে পুলিশ?'

হাসলো তিনজনেই।

'কিশোরের ধোঁকাবাজি,' হাসতে হাসতে বললো রবিন। 'ফাঁকি দিয়েছে লোকটাকে। ও আশা করেছে বোকার মতো কিছু বলে বসে নিজেকে ফাঁসিয়ে দেবে হেনরি। আসলে গোলমালটা করে বসেছে ওয়ালটার। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছে। তাতেও অবশ্য লাভ হয়েছে। পকেট থেকে চাবিগুলো বেরিয়েছে। তার মধ্যে উলফের অ্যাপার্টমেন্ট আর ওষুধ কোম্পানির স্টোরের চাবির ডুপ্লিকেটও ছিলো। তারমানে ম্যাগনেশিয়াম কোত্থেকে এসেছে ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর।'

'এটা ছাড়াও আরও প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছে পুলিশ,' কিশোর বললো। 'হেনরির গাড়ির ট্রাঙ্কেই ছিলো হারভে কোম্পানির দেয়া টাকাগুলো। এতোই আত্মবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো লোকটার, টাকাগুলো অন্য কোথাও সরানোরও দরকার মনে করেনি। প্রথমে অ্যারেস্ট করা হয়েছিলো। তারপর জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এতো যে বন্ধুত্ব ছিলো পুলিশের সঙ্গে, সব শেষ। কেউ তাকে সাহায্য করতে আসছে না। ওরা বুঝে ফেলেছে ওদেরকে ব্যবহার করছিলো সে, কৌশলে, এতে সাংঘাতিক রেগে গেছে সবাই।

'ওয়ালটার, যার আসল নাম চার্লস গুডফেলো, তার বিরুদ্ধে আগুন লাগানো, চুরিসহ আরও নানা অভিযোগ আনা হয়েছে। ওষুধ কোম্পানি একটা অডিট চালিয়েছে সে ধরা পড়ার পর। এতোদিন কিছু সন্দেহ করেনি ওরা। হিসেবে বেশ

কিছু কারচুপি বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সব গুডফেলো করেছে।'

'চুরি করা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে,' পরিচালক মন্তব্য করলেন, 'আর ছাড়তে পারে না মানুষ। আচ্ছা, মিস ম্যাকাফির কি খবর বলো।'

'তিনি ঠিক করেছেন ওভাবে নিঃসঙ্গ জীবন আর যাপন করবেন না,' রবিন বললো। 'বুঝে গেছেন, ওই জীবনে কোনো লাভ নেই, ক্ষতি ছাড়া। আবার বেরিয়ে এসেছেন তিনি বাইরের দুনিয়ায়। পরের শুক্রবারে একটা পার্টি দেবেন। তাঁর পুরনো বন্ধুদেরকে খবর পাঠিয়েছেন আবার জাদুচক্রে যোগ দেয়ার জন্যে, যাদেরকে কাছাকাছি পেয়েছেন।'

'আসবে নাকি? তোমার রিপোর্ট পড়ে তো মনে হয়, জাদুচক্রের মহিলা সদস্যরা তাঁকে পছন্দ করে না।'

'তা করে না। তবে কৌতূহলও দমাতে পারেনি,' বললো কিশোর। 'এতো বছর পর মিস ম্যাকাফি দেখতে কেমন হয়েছেন, আচার-আচরণ কতোটা বদলেছে, দেখার খুব ইচ্ছে ওদের। তাই বলে দিয়েছে আসবে। এসে যা দেখবে, চমকে যাবে, বলে দিতে পারি। কারণ প্রায় কিছুই বদলায়নি মিস ম্যাকাফির। এসব দেখলে তাঁকে সত্যি সত্যিই ডাইনী ভাববে ওরা। তবে ভালো ডাইনী।'

'আসলে,' মাথা দোলালেন পরিচালক, 'যে সাধারণ জীবন যাপন করেছেন তিনি, তাতেই এরকম সুস্থ থেকেছেন, ইয়াং থেকেছেন। বেশি জাঁকজমকের জীবন ভালো না। স্বাস্থ্য, মন, কোনটাই টেকে না তাতে।'

'ঠিক। তিনি বলেছেন, খাবারই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। হিসেব করে মেপে মেপে খেয়েছেন, আজেবাজে জিনিস খাননি। তাতেই ভালো থেকেছেন।'

'আমার বিশ্বাস, মারাত্মক বিষকাঁটালিকে খাবার হিসেবে বেছে নেননি তিনি,' শুকনো কণ্ঠে বললেন পরিচালক।

হেসে উঠলো কিশোর। 'না। তিনি বলেছেন, স্যাবাট অনুষ্ঠানে নাকি লাগে ওই জিনিস। খুব সামান্য পরিমাণে। যাই হোক, পার্টিতে তিনি আপনাকেও দাওয়াত করবেন। আমরা আসবো শুনেছেন। বলে দিয়েছেন, আপনার মত জেনে যেতে। আপনার কাজের খুব প্রশংসা করেন তিনি। রহস্য কাহিনী নিয়ে ছবি করার মতো এতোবড় পরিচালক নাকি আর নেই। তো, যাবেন নাকি হেলথ ফুড খেতে? না ডাইনীদের সঙ্গে বসে খেতে ভয় পান?'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখলেন পরিচালক। তারপর মাথা নাড়লেন। 'না, ডাইনীর ব্যাপারে আমার কোনো ভয়ডর নেই। বিশেষ করে মিস ম্যাকাফির মতো সুন্দরী ডাইনীর। কিন্তু যাবো না। মাপা, সাধারণ খাবার খেতে আমার ভালো লাগে না। যখন যা ভালো লাগবে তাই খাবো। হিসেব করে খেলেও কি আর চিরকাল বেঁচে থাকবো? যেতে পারলাম না বলে, দুঃখিত। আমার হয়ে মাপ চেয়ে নিও তাঁর কাছে।'

-ঃ শেষ ঃ-

গাড়ির জাদুকর

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ১৯৯২

বসন্তের ছুটি। সোমবারের এক সকাল। পুরনো নীল একটা করভেয়ার গাড়ির এঞ্জিনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আমান।

'গাধা! একটা বোকা গাড়ি!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে কিশোরকে বললো সে। 'সব কিছু চেক করেছি। ঠিকঠাক আছে। তার পরেও স্টার্ট নেয় না কেন?'

ইদানীং মোটর গাড়ির নেশায় পেয়েছে মুসাকে। একটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে এঞ্জিনের কাজ শিখছে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে কাজ করে গিয়ে ওখানে। বোঝা যাচ্ছে, এঞ্জিনের ব্যাপারে তার অসাধারণ মেধা, খুব দ্রুত শিখছে সব।

স্যালভিজ ইয়ার্ডের অফিস থেকে বেরিয়ে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলো কিশোর। মুসার কাছে এসে থেমেছে। তার তেলকালি মাখা কাপড়ের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরালো পুরনো গাড়িটার দিকে। 'চালু হয়ে গেলে আমার কাছে বিক্রি করে দিও,' বললো সে।

ওঅর্ক শার্টের ঝুলে হাতের গ্রীজ মুছলো মুসা। 'এটা সংগ্রহ করে রাখার মতো জিনিস, কিশোর, ব্যবহারের জন্যে নয়। আমেরিকার তৈরি প্রথম সফল গাড়ি করভেয়ার, যেটার এঞ্জিন পেছনে। মোটর রেসিং ক্লাবগুলোর কাছে এর দারুণ চাহিদা। নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রেখে দেয়। মোটা টাকা পাবো ওদেরকে দিলে। তা তোমার কতো আছে?'

'পাঁচশো পাউণ্ড,' জানালো কিশোর। 'তাতে ভালো গাড়ি পাওয়া যায় না, জানি আমি, তবে চালানোর মতো একটা কিছু জোগাড় করতে পারলেই খুশি। শুধু সাইকেল দিয়ে, কিংবা ভাড়া করে গাড়ি এনে আর পারা যায় না। গোয়েন্দার জন্যে গাড়ি একটা ভীষণ প্রয়োজনীয় জিনিস। আর লাইসেন্সটা যখন পেয়েই গেছি, কেন কিনবো না?'

রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে অনুরোধ করে তিনটে ড্রাইভিং লাইসেন্স জোগাড় করেছে তিন গোয়েন্দা। বয়েসে কুলায় না। 'পুলিশকে সাহায্য করে' এই সুপারিশ করে স্পেশাল লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওদেরকে চীফ।

'তা তো কেনাই উচিত,' একমত হলো মুসা। 'তবে টাকাটা আমার এখন ভীষণ দরকার, বুঝলে। কয়েকটা পুরনো গাড়ি কিনবো। লট বিক্রি হচ্ছে। ওগুলো কিনে মেরামত করে আবার বিক্রি করে দেবো।'

'হুঁ, গাড়ির ব্যবসা তো ভালোই শুরু করেছো তুমি আর রবিন। আমাদের

গোয়েন্দা সংস্থাটার দিকেও একটু নজর-টজর দাও। যতো সুনাম তো এরই জন্যে। আর লাইসেন্সটাও পেয়েছো গোয়েন্দার সুবাদেই।'

'দেবো। দাঁড়াও, আগে করভেয়ারটার একটা ব্যবস্থা করে ফেলি। তারপর পাঁচশো পাউণ্ড দিয়ে ভালো একটা গাড়ি জোগাড় করে দেবো। বড় জোর এক হপ্তা। কসম।'

'আর দিয়েছো। ছয় মাস ধরেই তো এক হপ্তা এক হপ্তা করছো। গাড়ি জোগাড় করা আর হলো না তোমার। আর সময় দিতে পারবো না। আমি ওসব কিছু বুঝিটুঝি না। করভেয়ারটাই চাই।'

মুসা প্রতিবাদ করার আগেই গেটের বাইরে জোরে হর্ন বেজে উঠলো। অবাকই হলো ওরা। ন'টা বাজতে দশ। এখনও খোলেনি ইয়ার্ড। এরই মাঝে কে এসে হাজির হলো? তালে তালে বাজছে হর্ন, অনেকটা রক মিউজিকের বীটের মতো।

'না খুলে পারা যাবে না। নাছোড়বান্দা,' বলতে বলতে কোমরের বেল্টের কাছে হাত নিয়ে গেল কিশোর। বেল্টে লাগানো ছোট একটা বাক্সমতো যন্ত্রের বোতাম টিপে দিলো।

গেট খোলার রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা। কিশোরের উদ্ভাবন। ইলেকট্রনিকের জাদুকর হয়ে উঠেছে সে। ইয়ার্ডের মেইন গেটে ইলেকট্রনিক তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কাছে যাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না এখন। দূর থেকেই খোলা আর বন্ধ করা যায়। তার কাছে আছে একটা রিমোট কন্ট্রোল। রাশেদ পাশার কাছে একটা, আর মেরিচাচীর কাছে একটা। মোট তিনটেই বানিয়েছে সে। তবে আরেকটা কন্ট্রোলার রয়েছে, মেইন কন্ট্রোলার, ওটা থাকে অফিসে।

খুলে গেল পাল্লা। তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা। তীরবেগে ভেতরে ঢুকলো একটা লাল মারসিডিজ ৪৫০ এস এল কনভারটিবল। অফিসের সামনে গিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। ওপর দিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো কালো চুলওয়ালা এক তরুণ, দরজা খোলার প্রয়োজনই মনে করলো না।

পরনে মলিন জিনস, দোমড়ানো কাউবয় বুট, চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা স্টেটসন হ্যাট, আর রঙচটা বেজবল জ্যাকেট। পুরনো একটা ব্যাকপ্যাক বাঁধা রয়েছে পিঠে। অসংখ্য বোতাম লাগানো তাতে, আর নানারকম ব্যাজ। ব্যাগ থেকে একটা শাদা খাম আর রঙিন কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করলো সে। কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে প্যাকেটটা নেড়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গি করলো। তার পর শিস দিতে দিতে ঢুকে পড়লো অফিসে।

চমৎকার একটা মোটর কার। দুই সীটের। চোখ সরাতে পারছে না মুসা। 'দারুণ, না কিশোর?'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' তবে গাড়ির দিকে চোখ নেই তার। তাকিয়ে রয়েছে চকচকে গাড়ির সীটের পেছনে রাখা ময়লা বেডরোলটার দিকে। 'গাড়ির চেয়ে গাড়ির মালিকের ব্যাপারেই আমার আগ্রহ বেশি।'

'আগে কখনও দেখিনি। তুমি?'

'আমিও না। তবে ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে দিতে পারি। এই যেমন, পুবের অঞ্চল থেকে এসেছে। ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব। টাকা নেই। কাজ নেই। আর লোকটা আমার আত্মীয়।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'খাইছে! এতো কথা জানলে কি করে?'

হাসলো কিশোর। 'সহজ। তার নিউ ইয়র্ক মেটস থেকে কেনা বেজবল জ্যাকেট, ব্লুমিংডেলস ডিপার্টমেন্টস স্টোর থেকে কেনা উপহারের প্যাকেট, চামড়ার রঙই বলে দিচ্ছে সে পুব থেকে এসেছে। সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক।'

'তা তো নিশ্চয়ই,' স্বীকার না করে পারলো না মুসা। 'বোঝা যায়। তারপর?'

'তার বুটগুলো দোমড়ানো, মলিন। ব্যাগে লাগানো বোতাম আর ব্যাজগুলো জোগাড় করেছে হাইওয়ে ওয়ান-টু-এইটির পাশের যতোগুলো প্রদেশ পেয়েছে, সবখান থেকে। আর মারসিডিজটার নাম্বার প্লেট হলো ক্যালিফোর্নিয়ার। এসব সূত্র বলে দিচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় গাড়িটাতে করে আসেনি সে। আর পুব অঞ্চল থেকে এতোদূরে হেঁটে আসার কথা কল্পনাই করবে না কেউ। তারমানে পথে পথে লোকের গাড়ি থামিয়ে লিফট নিতে নিতে এসেছে সে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো,' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'বুঝলাম। আর?'

চোখ বন্ধ করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'তার কাপড়চোপড় নোংরা, ছেঁড়া। অনেক দিন ধোয়া হয়নি। ঘরে ঘুমায় না রাতে, শোয় স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে। এখানে এসেছে সকাল ন'টায়, যখন বেশির ভাগ লোকই তাদের কাজ আরম্ভ করে। এতে বোঝা যায় তার টাকাও নেই, চাকরিও নেই।'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। 'আর আত্মীয়ের ব্যাপারটা?'

'একটা উপহারের প্যাকেট এনেছে, আর একটা শাদা খাম। পুব থেকে। এতোদূর থেকে ওগুলো বয়ে আনার তার কি দরকার ছিলো, আত্মীয় না হলে?'

'হ্যাঁ, সত্যিই সহজ হয়ে গেল,' মুসা বললো। 'তবে একটা ব্যাপারে তোমার ভুল হয়েছে। টাকা। টাকা নেই, একথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। ওরকম একটা গাড়ির মালিক যতো ছেঁড়া কাপড়ই পরুক, তার টাকা থাকতে বাধ্য।'

'গাড়িটা সে কোথায় পেলো বুঝলাম না,' জবাব দিলো কিশোর। 'ভবঘুরে একটা রাস্তার লোক ছাড়া সে আর কিছু না।'

'পাগল!'

করডেয়োরটা নিয়ে তর্ক চললো দু'জনের। তারপর একসময় কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো মুসা। ফিরে তাকিয়ে কিশোরও দেখলো অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা, সাথে মেরিচাচী। বারান্দা থেকে চত্বরে নেমে এগিয়ে আসতে লাগলেন দু'জনে। ধীরে, সহজ ভঙ্গিতে হাঁটে লোকটা, যেন তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তার এই ধীরগতির জন্যে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে বলে অধৈর্য হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

দূর থেকে বয়েস যতোটা কম লেগেছে, আসলে তার চেয়ে বেশি। সাতাশ-আটাশ হবে। হাসে ঠোঁটের এককোণ দিয়ে। নাকটা দেখে মনে হয় কয়েকবার ভেঙেছে। কালো চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। লম্বা চুল, আর বাঁকা নাকের জন্যে তাকে

দেখতে লাগে অনেকটা বাজপাখির মতো।

মেরিচাচীর হাতে একটা চিঠি। সেটা তুলে ধরে ডাকলেন তিনি, 'কিশোর, দেখ,' তাঁর কণ্ঠে সূক্ষ্ম সন্দেহ, সেটা শুধু কিশোর বুঝতে পারলো। 'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে ও। আমার বোনপো নিকি পাঞ্চ।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলার পালা এবার মুসার। ঠিকই বলেছে কিশোর। একটিবারের জন্যেও কি ভুল করতে পারে না সে!

'বেবিলন, লং আইল্যাণ্ড,' নিকি জানালো, 'খোলামেলা ভাবভঙ্গি। গ্রেট সাউথ-বে শহর থেকে ঘন্টাখানেকের পথ। আমার মা মেরিখালার খালাতো বোন। মাকে যখন বললাম, ক্যালিফোর্নিয়া দেখতে যাচ্ছি, রোদটোদ পোয়াবো, মা বললো রকি বীচে এসে খালাকে দেখে যেতে। একটা চিঠিও দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে জাংক ইয়ার্ডে চোখ বোলাচ্ছে নিকি। জিনিসপত্রের স্তূপ দেখে চোখ চকচক করছে তার। নানারকম জিনিস, কি নেই! ঘর [illegible]রির আর সাজানোর জিনিসপত্র ফেলে রাখা হয়েছে একপাশে। বাগানে বসার চেয়ার টেবিল আর বাগান সাজানোর মূর্তিগুলোর পাশে রাখা হয়েছে কয়েকটা পুরনো স্টোভ আর রেফ্রিজারেটর। আরও রয়েছে তামার তৈরি পুরনো আমলের খাট, টিভি রাখার ট্রলি, বাক্স। অনেক পুরনো আমলের রেডিও থেকে শুরু করে, সেলাই মেশিন আর নিয়ন সাইন পর্যন্ত রয়েছে।

এতো জিনিস জমে যাওয়ায় হিসেব রাখতে হিমসিম খেতে লাগলেন রাশেদ পাশা। কি কি জিনিস আছে ভুলে যেতে লাগলেন। খাতায় আর কতো লিখে রাখা যায়। শেষে উপায় বের করলো কিশোর। একটা বাতিল কম্পিউটার কিনে এনে মেরামত করে সারিয়ে তাতে ঢুকে রাখলো সমস্ত জিনিসপত্রের নাম। এখন আর অসুবিধে হয় না। চাবি টিপলেই বেরিয়ে চলে আসে কোথায় আছে কোন জিনিসটা, কি কি আছে, সব। তবে এগুলো হিসেব করে নাম লিখে রাখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে কিশোরকে। অনেক সময় ব্যয় হয়েছে।

'ন্যানিকে দেখি না কতো বছর হয়েছে,' বোনের কথা বললেন মেরিচাচী। 'সেই ছোটবেলায় দেখেছি। তারপর আর দেখা নেই। শুনেছি বিয়ে করেছে। তবে তার ছেলেমেয়ে হয়েছে এখবর আর পাইনি। কয় ভাইবোন তোমরা?'

'চার,' নিকি জানালো। 'সবাই বড় হয়ে গেছে। বেবিলনেই আছে ওরা। আমার মনে হলো, দেশটা ঘুরে দেখার সময় হয়েছে। আর কি, বেরিয়ে পড়লাম।' ফেলে রাখা পুরনো মালের স্তূপের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হলো তার চোখ। 'অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে এখানে।' তারপর যেন এই প্রথম চোখ পড়লো করভেয়ারটার দিকে। 'আরি! এই সুন্দরীকে কোত্থেকে জোগাড় করলে? এ-তো ক্লাসিক জিনিস!'

মুহূর্ত পরেই দেখা গেল একসাথে এঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মুসা আর নিকির মাথা। এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলো, যেন কতো পুরনো বন্ধু। অনেক দিনের চেনা।

সোজা হলো মুসা। খাটো করে ছাঁটা তারের মতো চুলে আঙুল চালালো সে।

বললো, 'সব চেক করেছি। কিছু বাকি নেই। বাতিল পার্টসগুলো বদলে নুতন লাগিয়েছি। কিছুতেই স্টার্ট করাতে পারছি না।'

হেসে উঠলো নিকি। 'পারবেও না, মুসা। দেখ, কি করেছো। ইলেকট্রিক সিসটেমের মধ্যে অলটারনেটর লাগিয়ে দিয়েছো।'

'তা তো লাগাবোই। অলটারনেটর ছাড়া ব্যাটারি চার্জ হবে কি করে? এঞ্জিনও তো চলবে না।'

মুসা আর নিকি, নিকি আর মুসার দিকে তাকাচ্ছেন মেরিচাচী। কিশোরও তাকাচ্ছে। সে যা-ও বা কিছু বুঝতে পারছে, তিনি ওদের কথা একেবারেই কিছু বুঝতে পারছেন না।

'এই গাড়িতে ওসব দিয়ে কাজ হবে না,' হাত নেড়ে বললো নিকি। 'করভেয়ার পুরনো জিনিস। ওতে জেনারেটর রয়েছে, অলটারনেটর নয়। গোল, কালো, লম্বা একটা সিলিণ্ডারের মতো জিনিস খুলেই নিশ্চয় তার জায়গায় অলটারনেটরটা লাগিয়েছো?'

ওয়ার্কবেঞ্চের নিচ থেকে জিনিসটা বের করে এনে দেখালো মুসা, 'এটা?'

সিলিনডারটা মুসার হাত থেকে নিয়ে তার যন্ত্রপাতিগুলো চেয়ে নিলো নিকি। তারপর ঝুঁকে পড়লো এঞ্জিনের ওপর। দ্রুত কানেকশন করে দিয়ে কিছু নাট-বল্টু টাইট দিলো। এঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললো, 'আর সব তো ঠিকই আছে দেখছি। যাও, স্টার্ট দাও।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো মুসা। চাবি মোচড় দিলো। একবার কেশে উঠেই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। কাশলো, হাঁসফাঁস করলো, পুটপুট করলো, বন্ধ হয়ে যাওয়ার হুমকি দিলো কয়েকবার, তবে হলো না।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'এঞ্জিনের ব্যাপারে এতো কিছু আপনি জানলেন কি করে?'

হাসলো নিকি। 'সারাটা জীবন এই কাজই করেছি তো। এখানে আসাতক তাই করবো ভাবছি। কোনো গ্যারেজে একটা পার্ট-টাইম কাজ নিয়ে নেবো। বাকি সময় সাঁতার কাটবো, রোদ পোয়াবো, আর বিশ্রাম নেবো। কতো জায়গা ঘুরলাম, কিন্তু এখানকার মতো এতো গাড়ি কোথাও দেখিনি। সহজেই জুটিয়ে নিতে পারবো কাজ।'

মেরিচাচীর দিকে তাকালো সে। 'বাসাটাসাও একটা ভাড়া করে নিতে পারবো কাজ পেয়ে গেলে। তবে ততোক্ষণ একটা থাকার জায়গা দরকার। যেখানে খুশি ঘুমোতে পারি আমি, যা পাই তাই খেয়ে থাকতে পারি, অসুবিধে হয় না। এখানে তো থাকার জায়গাার অভাবই দেখছি না। যে কোনো একটা ট্রেলারে শুয়ে থাকতে পারবো। বিছানাটা খুলতে পারলেই হলো। কোনো গণ্ডগোল করবো না।'

'না,' মেরিচাচী বললেন। 'মানে ট্রেলারে থাকতে হবে না। রাস্তার দিকের ঘরটা আমাদের খালিই পড়ে থাকে। ওখানেই থাকতে পারবে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। অনেক ধন্যবাদ।'

'আমার জন্যেও ভালো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মসা, খশিতে। 'ওস্তাদ করে

নিলাম আপনাকে। কাজ শিখবো আপনার কাছে। গাড়ির জাদুকর আপনি, বুঝে ফেলেছি।'

'নিশ্চয়ই,' পেছন থেকে বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকালো সবাই। স্যুট আর টাই পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। থমথমে গম্ভীর মুখ।

'বিশেষ করে,' দু'জনের মাঝে লম্বা লোকটা বললো, 'সেই গাড়ির জাদুকর, যেটা তার নয়। এবং সে-কারণেই তাকে অ্যারেস্ট করতে হচ্ছে আমাদের।'

দুই

লম্বা, তীক্ষ্ণ চেহারার মানুষটাকে চেনে না কিশোর আর মুসা। কড়া চোখে তাকিয়ে রয়েছে নিকির দিকে। তবে কালচে চুল, খাটো লোকটাকে চেনে। রকি বীচ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। ডিটেকটিভ জ্যাক কারলি।

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে, মিস্টার কারলি?'

'ও কিশোরের খালাতো ভাই, নিকি পাঞ্চ,' পরিচয় দিলো মুসা। 'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে।'

'বিপদ বাধিয়ে বসেছে তোমার ভাই, কিশোর,' কারলি বললেন। ছোটখাটো মানুষ, শান্ত চেহারা, নীল চোখ, মুখে আন্তরিক হাসি সব সময় লেগে থাকে। তবে ওই হাসিতে কোনো আশ্বাস দেখতে পেলো না কিশোর। লম্বা, শীতল চোখ লোকটার দিকে মাথা নুইয়ে ইশারা করে বললেন, 'ও ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ডেনিস ডেনভার। গ্র্যাণ্ড থেফট অটো ডিপার্টমেন্টের লোক। কিছু প্রশ্ন করতে চায়।'

ডিটেকটিভ কারলির দিকে তাকালো ডেনভার, তারপর ফিরলো দুই গোয়েন্দার দিকে। 'কারলি, এদেরকে চেন নাকি?'

'চিনি। চীফও চেনেন।'

'কারা?' একটুও কোমল হলো না ডেনভারের কণ্ঠ।

'শখের গোয়েন্দা। বহুবার আমাদের সাহায্য করেছে। অনেক জটিল রহস্যের মীমাংসা করেছে।'

বিস্মিত সার্জেন্টের দিকে একটা কার্ড বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'তিন গোয়েন্দার কার্ড, সার্জেন্ট। লোকের জিনিস খুঁজে দেয়া, উদ্ভট রহস্যের সমাধান, এসব করতেই আমাদের ভালো লাগে। তবে পুলিশ যে রহস্যের কিনারা করতে পারে না, সেটার সমাধান করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমাদের। কয়েকবার করেছিও।'

কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সার্জেন্ট ডেনভার। 'তারমানে, তুমি বলতে চাইছো, ইয়ান ফ্লেচারের মতো পুলিশ অফিসার এই সব টিনএজারদের কাছ থেকে সাহায্য নেন?'

'বহুবার নিয়েছেন,' জবাবটা দিলেন কারলি। 'এমন সব ব্যাপার খুঁচিয়ে বের করেছে ওরা, পুলিশ জানতোই না ওসব অপরাধ ঘটেছে।'

'ভালো। তবে আমার কেস থেকে ওদেরকে দূরে থাকারই অনুরোধ করবো আমি। ওদের সাহায্য আমার দরকার নেই। আর সেটা এই কেস থেকে শুরু।' কারলির দিকে ফিরে বললো ডেনভার, 'একে সব বুঝিয়ে দাও।' নিকির কথা বললো সে।

বুঝিয়ে দিলেন কারলি। চুপ থাকতে হবে নিকিকে। একজন উকিল ঠিক করতে হবে, যে তার পক্ষে কথা বলবে। আরেকটা ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হবে, বেফাঁস কিছু যেন না বলে। এখন থেকে যা-ই বলুক, আদালতে সেটা রিপোর্ট হয়ে যাবে।

'ওকে,' কারলি থামলে ডেনভার বললো, 'চোরাই গাড়িটা কোথায় পেলে, কিভাবে এখানে আনলে বলতে চাও আমাদের?'

নিকি মুখ খোলার আগেই তাড়াতাড়ি বললো কিশোর, 'চুপ করে থাকাই ভালো, নিকি। যা বলার উকিলই বলবে।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেরিচাচী। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। এতোক্ষণে মুখ খুললেন, 'উকিল? কিশোর তোর কি মনে হয়...'

'উকিল লাগবে না আমার,' বাধা দিয়ে বললো নিকি। 'ভুল করেছে পুলিশ' হেসে উঠলো সে। 'নিশ্চয় লোকটার ভাই রিপোর্ট করেছে পুলিশকে। কেন করেছে তা-ও বুঝতে পারছি। সময়মতো পৌঁছাইনি, দেরি করে ফেলেছি। ও ভেবেছে গাড়িটা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছি। হয়তো ভাবছে কোথাও গিয়ে গাড়ি চালিয়ে হাওয়া খাচ্ছি এখন।'

'কোন লোকটা?' জিজ্ঞেস করলেন কারলি।

'গোড়া থেকে সব খুলে বলতে চাও?' ডেনভারের প্রশ্ন।

'কোনো অসুবিধে নেই,' নিকি বললো। 'কোনো অন্যায় তো করিনি, কাজেই কিছু গোপন করারও নেই। লোকের গাড়িতে লিফট নিতে নিতে এসেছি আমি। পরশু দিন এসে পৌঁছেছি অক্সনার্ডে। নেমে একটা ক্লাবে ঢুকলাম কিছু খেয়ে নেয়ার জন্যে। গরম গরম বাজনা বাজছে। খাবারটাও ভালো। অনেক পথ গাড়িতে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, ভালোই লাগছিলো খাবার আর বাজনা। আস্তে আস্তে খাচ্ছি। আমার টেবিলেই বসেছিলো আরেকটা লোক। টিবুরন নাকি ব্রেকসান, কি যেন নাম, নামটাম আমার অতো মনে থাকে না। আলাপ হলো তার সাথে। বললাম রকি বীচে যাচ্ছি খালার সাথে দেখা করার জন্যে। কথায় কথায় আমার অনেক কথা জেনে নিলো সে। ক্লাবটা বন্ধ হওয়াতক দু'জনে বসে রইলাম ওখানে। বন্ধ হওয়ার একটু আগে অনুরোধ করলো সে, তার একটা উপকার করে দেবো কিনা। তাতে আমারও লাভ হবে বললো।'

হাসলো নিকি। 'আমার লাভটা আমি সব সময়ই দেখি। কি চায় জিজ্ঞেস করলাম। জানালো, তার ভাইয়ের মার্সিডিজটা চালিয়ে এনেছে সে। পরের দিন জায়গামতো পৌঁছে দেয়ার কথা। দিতো, কিন্তু হঠাৎ করেই একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা। সান্তা বারবারায় পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছে মেয়েটা। তার নিজের গাড়ি

আছে। মারসিডিজ চালানোর শখ নেই আর লোকটার। সে তখন মেয়েটার সঙ্গে যেতেই বেশি ইনটারেসটেড। তার ভাই থাকে রকি বীচে। আমি কাজটা করে দিলে পেট্রোলের খরচ বাদে আমাকে একশো ডলার দেবে সে। কি করে না বলি বলুন?'

ডেনভার জিজ্ঞেস করলো, 'এর আগে কখনও দেখনি লোকটাকে?'

'এর আগে অক্সনার্ডেই আসিনি কখনও। জায়গাটার নামও শুনিনি।'

'দুই দিন আগের কথা,' কারলি বললেন। 'এখনও গাড়িটা তোমার কাছে কেন?'

আবার হাসলো নিকি। 'সেদিন তো রাতই হয়ে গিয়েছিলো। আর কালকের দিনটা এতো সুন্দর ছিলো, সাগর দেখে আর সাঁতার কাটার লোভ সামলাতে পারলাম না। সাঁতার কাটলাম, গিরিপথগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। দারুণ একটা দিন কেটেছে!'

'শুধুই ঘুরে বেড়িয়েছো? প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছো?' ডেনভারের জিজ্ঞাসা।

'আর আজকে?' কারলি জানতে চাইলেন।

'কাল রাতে গাড়িতেই ঘুমিয়েছি,' জবাব দিলো নিকি। 'আজ সকালে তো মেরিখালার সঙ্গেই দেখা করতে চলে এলাম। এখানে কথা শেষ। টিবুরন না ব্রেকসান কি যেন, তাকে এখন ফিরিয়ে দিতে যাবো গাড়িটা।'

দুই ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

হাসির জবাব পেলো না। ভারি থমথমে হয়ে উঠলো নীরবতা। যেন বোঝা হয়ে উঠছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের জন্যে। পরস্পরের দিকে তাকালো কিশোর আর মুসা। মেরিচাচী কারো দিকে তাকাতে পারছেন না যেন। নিকির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সার্জেন্ট ডেনভার।

'জাহাজ ঘাটার সবচে বড় গাঁজাটা তৈরি করে এনেছো,' অবশেষে বললো সে। 'তোমার এসব গালগল্প বিশ্বাস করবো মনে করেছো…'

কারলি বললেন, 'লোকটার ভাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারি আমরা, সার্জেন্ট?'

'বেশ,' গম্ভীর হয়ে বললো ডেনভার, 'চলো।'

'চোরাই গাড়ি এটা, সার্জেন্ট,' যুক্তি দেখালো কিশোর, 'আর নিকিও সত্যি কথা বলছে। ব্রেকসানই হোক আর হোলসানই হোক, লোকটাকে গিয়ে এখন জিজ্ঞেস করলে কিছুতেই সত্যি কথা বলবে না পুলিশের কাছে।'

'কিন্তু ওকে একা যেতেও দিতে পারি না,' ডেনভার বললো।

'নিকি, তুমি আগে যাও,' কারলি উপায় বাতলে দিলেন। 'তোমাকে যা করতে বলেছে ব্রেকসান, তাই করো। কিশোর আর মুসা যাক তোমার সাথে। আমরা পেছনেই থাকবো। বলবে, ওরা তোমার বন্ধু। ফেরত যেতে হবে তো তোমাকে, তাই ওদেরকে সাথে করে নিয়ে গেছো। আমরা চোখ রাখবো।'

মাথা ঝাঁকালো নিকি। ছোট ৪৫০ এস এল কনভারটিবল গাড়িটায় গিয়ে উঠে পড়লো। কালো একটা ফিয়ারো গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে জঞ্জালের স্তূপের

পাশে। নানারকম বাতিল পার্টস জোগাড় করে এনে জোড়া দিয়ে গাড়িটা তৈরি করেছে মুসা। বডির রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে রঙ করার সময় পায়নি সে, রঙ আর অন্যান্য জিনিস কিনে আনার মতো টাকাও নেই। তবে এঞ্জিনের অবস্থা চমৎকার।

বেরিয়ে গেল নিকি। তাকে অনুসরণ করলো মুসা। পাশে বসে আছে কিশোর। সবার পেছনে বেরোলো পুলিশ। ডিটেকটিভের কাজ করে। পুলিশের মার্কা মারা গাড়ি নিয়ে তাই ঘুরে বেড়ায় না। সাধারণ একটা ডজ অ্যারিস নিয়ে এসেছে।

শহরের ভেত্তর দিয়ে পশ্চিমমুখো চললো তিনটে গাড়ি। আরেকটু এগিয়ে বন্দরের ধার দিয়ে এগোলো। নিকিকে যে ঠিকানা দেয়া হয়েছে, সেখানে পৌঁছে দেখা গেল ওটা একটা বডিগা-মুদী দোকান-ছোট একটা ব্যারিওর ভেতরে। ব্যারিও বলে একটা বিশেষ অঞ্চলকে। যেখানে ছোট ছোট রঙিন বাড়িতে আর খোলা বাগানে কাফে, মোটেল আর ক্যানটিনা চালানো হয়।

বডিগার দরজায় মলিন হয়ে আসা কালো রঙে লেখা রয়েছে মালিকের নাম, আনতিনো পেজ। দোকানের সামনে গাড়ি রাখলো নিকি। তার পেছনে থাকলো মুসা। পুলিশ রইলো অনেক পেছনে, তবে দুটো গাড়িকেই দেখা যায় এমন জায়গায়। চকচকে মারসিডিজটা থামতে না থামতে লোক জমে গেল, ভিড় হয়ে গেল দেখার জন্যে।

গাড়ি থেকে নামলো নিকি।

মুসা বললো, 'আমি থাকি। গাড়িগুলোকে পাহারা দিই।'

রাজি হলো কিশোর। সে নেমে চললো নিকির সঙ্গে।

দোকানের ভেতরে কয়েকজন খদ্দের রয়েছে। ফল আর শাকসজি পছন্দ করছে কেনার জন্যে। আম, পেঁপে, ফ্রিজোলস, জিকামা, টমেটো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বেশি চোখে পড়ে মরিচ। নানা রকমের নানা জাতের মরিচ সুন্দর করে সাজানো। কাঁচা, পাকা, সবুজ, লাল, হলুদ, বেশি ঝাল, কম ঝাল, সব রকমের রয়েছে। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো হালকা-পাতলা, বাদামী চামড়ার লোকটা শীতল চোখে তাকালো ওদের দিকে। ওরা তার নিত্যদিনের পরিচিত খরিদ্দার নয়। তার সব চেয়ে সুন্দর হাসিটা লোকটাকে উপহার দিলো নিকি, মাথা ঝাঁকালো। এগিয়ে গিয়ে বললো, 'মিস্টার পেজ? টিবুরন ব্রেকসান নামের একজন লোকের ভাইকে খুঁজছি আমরা।' এভাবেই নামটা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে কিশোর।

'তো?' লোকটা ভুরু নাচালো। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মতো লম্বা, হাড্ডিসার শরীর, কণ্ঠার তিনকোণা জায়গাটা বিশাল, এতো লম্বা গলা, যেন শকুনের। কালো চোখজোড়া তার চুলের মতোই কুচকুচে কালো। কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফিরলো নিকির দিকে।

'অক্সনার্ড থেকে ব্রেকসানের ভাইয়ের গাড়িটা আমাকে চালিয়ে আনতে বলেছে সে,' নিকি বললো। 'এর জন্যে একশো ডলার পারিশ্রমিকও দিয়েছে। ঠিকানা

দিয়েছে এখানকার।'

শ্রাগ করলো পেজ। ফিরে তাকিয়ে পেছনের ঘরের দিকে চেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই, ব্রেকসান নামে কাউকে চেনো নাকি? কিংবা তার ভাইকে?'

দু'জন শক্তসমর্থ গুণ্ডা চেহারার ল্যাটিন লোক বেরিয়ে এলো। ভাবভঙ্গি মোটেও সুবিধের নয়। একজন বললো, 'না, চিনি না।'

নিকির দিকে ফিরলো পেজ। 'চিনি না। ওই নামের কেউ নেই এখানে। আসেও না।'

হাসি মুছে গেছে নিকির। 'কিন্তু থাকার তো কথা! ব্রেকসান এই ঠিকানাই দিয়েছে। বাইরে তার ভাইয়ের গাড়িটা রেখে এসেছি।'

মাথা নেড়ে হেসে উঠলো পেজ। 'তুমি নিশ্চয় বিদেশী। এখানকার লোক হলে ঠিকই জানতে, এতো দামী গাড়ি কেনার ক্ষমতা এই ব্যারিওর কোনো লোকের নেই। ফিরিঙ্গি তো, সেজন্যেই জানো না।'

হঠাৎ সামনে লাফিয়ে পড়লো গিয়ে নিকি। লোকটার কলার চেপে ধরলো। 'মিথ্যুক! মিছে কথা বলছেন আপনি! ব্রেকসান এই ঠিকানাই দিয়েছে।'

'এই এই!' বলে নিকিকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করলো পেজ। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নিকির শরীরে, দেখে এতোটা মনে হয় না। কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে না পেরে চিৎকার করে বললো, 'পিকো! রিয়ানো!'

দুই ল্যাটিন গুণ্ডা নড়ার আগেই ঘরে ঢুকে পড়লো সার্জেন্ট ডেনভার আর ডিটেকটিভ জ্যাক কারলি। টেনেটুনে ছাড়িয়ে নিলো নিকিকে। কিশোর অনুমান করলো, ওরা নিশ্চয় সুপারসেনসিটিভ সাউণ্ড ডিটেকটর জাতীয় কোন যন্ত্র দিয়ে শুনছিলো এতোক্ষণ দু'জনের কথাবার্তা।

ছাড়া পেয়েই একলাফে পিছিয়ে গেল পেজ। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নিকির দিকে। 'পাগল! আস্ত পাগল এই ফিরিঙ্গিটা!'

'পাগল,' সুর মেলালো ডেনভার,-'এবং চোর! জ্যাক, হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে দাও। হাজতেই ভরতে হবে।'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নিকি, যখন তার হাতে হাতকড়া পরাচ্ছেন কারলি। তারপর কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বার বার বললো যে সে গাড়িটা চুরি করেনি। ডিটেকটিভরা যখন তাকে টেনে নিয়ে চললো তখনও একই কথা বলতে থাকলো।

ওদের গাড়ির পেছনে নিকিকে বসিয়ে দিলো ডিটেকটিভরা। সামনের সীট আর পেছনের সীটের মাঝে শক্ত শিকের ঝাঁঝরি বেড়া রয়েছে। অনেকটা খাঁচার মতো। খাঁচায় আটকানো জানোয়ারের মতোই সেখানে ভরে দেয়া হয়েছে বেচারাকে।

গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে গেল ডেনভার। মারসিডিজে করে তাকে অনুসরণ করলেন কারলি। দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে আনতিনো পেজ। গাড়িদুটোর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'ব্যাটা পাগল. ফিরিঙ্গি!'

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দুই গুণ্ডা, পিকো আর রিয়ানো। তাকিয়ে রয়েছে

কিশোরের দিকে। গাড়িতে বসা মুসা ডাক দিলো তাকে, 'কিশোর, চলে এসো। যাই।'

গেল না কিশোর। পেজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। 'মিস্টার পেজ,' বললো সে, 'একটা কথা ভেবে দেখেছেন, কেউ যদি ঠিকানাটা তাকে না-ই দিয়ে থাকে, তাহলে কি করে জানলো এখানকার ঠিকানা?'

কড়া চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠে বললো লোকটা, 'যাও, ভাগো!'

শুনলোই না যেন কিশোর। 'জানার কথা নয় তার। নতুন এসেছে এই শহরে, আজকেই, অনেক দূর থেকে।'

রাগে কালো হয়ে গেল পেজের মুখ। 'বেশি কথা বল তো হে! এই, পিকো, রিয়ানো, ভাগাও তো এটাকে! রাখো, আগে কিছু ধোলাই দিয়ে নিই। কোনোদিন যেন আর বেয়াদবি না করে।'

কিশোরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো তিনজনে।

তিন

'বল, আরও বল!' কিশোরের বুকে হাত রেখে জোরে এক ঠেলা মারলো পেজ। 'বেশি কথা বল!'

একপা পিছিয়ে গেল কিশোর। 'দেখুন...'

আবার ধাক্কা মারলো তাকে পেজ। 'দেখাদেখির কিছু নেই, শুধু করার আছে। এতো বেশি কথা বললে বিপদে তো পড়বেই। সেটা যাতে না পড় তোমার ভালোর জন্যেই শিক্ষাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

তার পেছনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কুৎসিত হাসি হাসলো পিকো আর রিয়ানো।

আরেকবার ধাক্কা মারার জন্যে হাত বাড়ালো পেজ। বছর দুই আগে হলে হয়তো পিছিয়ে যেতো কিশোর, কিংবা গাঁইগুঁই করে সরে আসতো, কিংবা বোঝানোর চেষ্টা করতো সে। কিন্তু এখন আর সেই ক্ষীণদেহী কিশোর পাশা নেই সে। নিয়মিত ব্যায়াম করে স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। পুলিশের ইনস্ট্রাকটর দিয়ে ওদেরকে খালিহাতে আত্মরক্ষার ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর মনের সুপ্ত আশা, বড় হয়ে একদিন পুলিশ বাহিনীর মান ইজ্জত বাড়াবে তিন গোয়েন্দা, অবশ্যই পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়ে তাছাড়া ছেলে তিনটেকে সাংঘাতিক পছন্দ করেন তিনি ছেলে তো নয়, তিনটে হীরের টুকরো।

নড়ে উঠলো কিশোর। পলকে ফুটখানেক ফাঁক হয়ে গেল দুই পা, ডান পা-টা সামনের দিকে বাড়ানো মিজিশিজেনটাই জুডোর একটা কৌশল। পেজের শার্ট খামছে ধরে টান দিতেই ভারসাম্য হারালো লোকটা। আধপাক ঘুরলো কিশোর। সেই সাথে হ্যাঁচকা টান মারলো পেজের শার্ট ধরে রেখে। ময়দার বস্তার মতো রাস্তায় আছড়ে পড়লো দোকানদার।

শক্ত কংক্রিটের ওপর পড়ে ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো পেজ। নড়ার ক্ষমতা নেই। পথের ওপরই পড়ে রয়েছে। কাণ্ড দেখে পিকো আর রিয়ানোও যেন পাথর হয়ে গেছে। ওদের বিহ্বল ভাব কাটার সময় দিলো না কিশোর। অযথা মারামারিও আর করতে গেল না। সোজা দৌড় দিলো ফিয়ারোর দিকে। এঞ্জিন চালু করে ফেলেছে মুসা। এক ঝটকায় খুলে দিলো দরজা। কিশোর ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই চলতে আরম্ভ করলো গাড়ি।

'দারুণ দেখিয়েছো!' ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে হাসলো মুসা। 'চীফকে গিয়ে বলতে হবে।'

'কেমন?' মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচালো কিশোর। 'তুমি ভেবেছো তুমি শুধু একাই পারো। জুডোর ক্লাসে আর খেপাবে? ও গোশির বিদ্যা ঝেড়ে দিয়ে এলাম।'

'তা ঝেড়েছো। তবে আমি হলে কারাতে চালাতাম। শকুনটা কারাতেরই যোগ্য।'

'দরকার নেই। আধমরা হয়ে গেছে এমনিতেই। তাছাড়া কারাতে এখনও ঠিকমতো প্র্যাকটিস হয়নি আমার।'

'জানি। তবু যেটুকু জানো, ওরকম দশটা শকুনকে কাত করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

নীরবে চললো কিছুক্ষণ।

তারপর মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার, পেজ ব্যাটা মিথ্যে বলেছে?'

'নিশ্চয়ই। আর এর মানে, নিকি হয়তো সত্যি কথাই বলেছে। জেল থেকে বের করে আনতে হবে ওকে। যাতে আমাদেরকে তদন্তে সাহায্য করতে পারে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যবস্থা করতে পারে।'

'রবিনকে একটা খবর দেয়া দরকার।'

ইয়ার্ডে ফিরে দ্রুত এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো দু'জনে। সেই ট্রেলারটাই আছে এখনও, তবে তাতে নতুন যন্ত্রপাতি যোগ হয়েছে, অবশ্যই পুরনো মাল থেকে তৈরি। ইলেকট্রনিক লক, বার্গলার অ্যালার্ম, একটা কাউনটার সারভেইল্যান্স্ ইউনিট-একধরনের ইলেকট্রনিক প্রহরী, দুটো কমপিউটার আর একটা এয়ার কনডিশনার।

লাইব্রেরিতে পার্টটাইম চাকরিটা ছেড়ে আরেকটা কাজ নিয়েছে রবিন, রক-প্লাস ট্যালেন্ট এজেন্সিতে। রবিনের মা জানালেন সে এখনও আসেনি। কাজেই ওখানেই টেলিফোন করা হলো। জবাব দিলো এজেন্সির অ্যানসারিং মেশিন। কয়েকটা সেকেণ্ড শুধু জোরালো রক মিউজিক শোনা গেল। তারপর বাজনা ছাপিয়ে রবিনের কণ্ঠ বললো, একটা মেসেজ রেখে যেতে।

'মনে হয় ব্যাণ্ড ড্রামারের খোঁজে বেরিয়েছে,' মুসা আন্দাজ করলো। 'রবিন বলে ড্রামাররা নাকি সব পাগল।'

'পরে আবার চেষ্টা করবো,' কিশোর বললো। 'এখন চলো. মেরিচাচীর সঙ্গে

কথা বলি। নিকির সম্পর্কে।'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে চললো দু'জনে।

ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন মেরিচাচী। 'নিকি কোথায়?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হাজতে নিয়ে গেছে,' জবাব দিলো কিশোর।

বডিগায় কি কি ঘটেছে সব খুলে বললো, শুধু আনতিনো পেজের সঙ্গে মারপিটের কথাটা বাদে।

'তার মানে সত্যিই চুরি করেছে!' রেগে গেলেন মেরিচাচী।

'আমার তা মনে হয় না। পেজই মিথ্যে কথা বলেছে। নিকিকে হাজত থেকে বের করে আনতে হবে, যাতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। একমাত্র সে-ই ব্রেকসানকে চিনিয়ে দিতে পারবে। চাচী, তোমার উকিলের সঙ্গে কথা বলেছো?'

মাথা নাড়লেন মেরিচাচী। 'না, এখনও বলিনি। কি বলবো, বল? নিকিকে চিনিই না। ও যে আমার বোনের ছেলে তাই বা শিওর হবো কিভাবে? কিছু করার আগে ন্যানিকে ফোন করবো। জিজ্ঞেস করে দেখি নিকি সত্যি কথা বলছে কিনা।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি করো। সব কিছু গরম থাকতে থাকতে। আমি ওয়ার্কশপে আছি।'

ইলেকট্রনিকের যুগ, পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে আর চলে না, তাই ওয়ার্কশপেরও পরিবর্তন করেছে কিশোর। করেছে মানে ঘর আর টিনশেডের পরিবর্তন করেনি, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। ট্রেলার থেকে তিন গোয়েন্দার টেলিফোনের একটা একসটেনশন নিয়ে এসেছে। ছাতে লাগিয়েছে একটা স্যাটেলাইট ডিশ অ্যানটেনা। আর গোয়েন্দাগিরিতে কাজে লাগে এরকম যতো রকম যন্ত্র বানাতে পেরেছে, বানিয়েছে, আর কিছু কিছু কিনে নিয়ে এসেছে।

'দেখি, আরেকবার,' ফোনের দিকে এগোলো কিশোর, 'রবিনকে পাওয়া যায় কিনা।'

'দাঁড়াও! ওই দেখ।'

প্রাচীন মডেলের লাল একটা ফোক্সওয়াগন ঢুকছে ইয়ার্ডে। ওয়ার্কশপের সামান্য দূরে থামালো গাড়ি। নেমে এলো রবিন মিলফোর্ড। নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে যেন ওরা। গাড়ি ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ওয়ার্কশপের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওদের তিনটে সাইকেল, এতোদিনের সঙ্গী, তবে ধুলো জমতে দেয়নি কিশোর। নিয়মিত সাফ করে রাখে। তার বক্তব্য, গোয়েন্দাগিরিতে সব ধরনের যানবাহন কাজে লাগে। ঠেলা গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক বিমান, সব। কাজেই কোনোটাকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কখন যে কোনটা কাজে লেগে যাবে কে জানে। গাড়ির চেয়ে সাইকেল অনেক সময় অনেক সুবিধে করে দেয়, তখন ওগুলো ব্যবহার করবে। মুসার ইচ্ছে, গাড়ির ব্যবসা করে টাকা জমাতে পারলে ভালো দেখে মোটর সাইকেলও কিনে নেবে। আর কিশোরের ইচ্ছে, এমন একটা ভ্যান কিনবে,

যেটাতে থাকবে নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি, গোয়েন্দাগিরি করার সুবিধার্থে। হেসে বলেছে রবিন, 'একেবারে জেমস বণ্ডের গাড়ি।' হাসেনি কিশোর। গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছে, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।'

ভেতরে এসে ঢুকলো রবিন। জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার? জরুরী তলব? কোন কেসটেস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, অনেক দিন পর,' জবাব দিলো মুসা। 'কিশোরের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির খেলা দেখানোর একটা সুযোগ মিললো এতোদিনে। কি বলো, কিশোর?'

'দেখা যাক। এখন আসল কথায় আসি…'

'হ্যাঁ, বলো।'

'সত্যিই একটা কেস পেয়েছি, রবিন। পুলিশ ভাবছে মেরিচাচীর বোনের ছেলে নিকি পাঞ্চ গাড়ি চোর। আমরা আসল চোরটাকে ধরে জেলে পাঠাতে চাই।'

'কেস?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'গাড়ি চোর?'

'চাচীর উকিল নিকিকে হাজত থেকে বের করে আনতে পারবে,' বলে গেল কিশোর, 'জামিনে। তারপর শুরু করবো আমরা তদন্ত। পুরো কাহিনীটা খুঁড়ে বের করে আনবো।'

'কাহিনী?'

'কিশোর,' মুসা বললো, 'নিকি তোমার আত্মীয় না-ও হতে পারে। হয়তো ভুয়া লোক।'

'কাহিনী! ভুয়া!' হাত নেড়ে বললো রবিন, 'কি বলছো তোমরা কিছুই তো বুঝতে পারছি না! দয়া করে খুলে বলবে সব?'

তার পরনে খাকি প্যান্ট, গায়ে হলদে রঙের পোলো শার্ট। রক-প্লাস থেকে সোজা চলে এসেছে এখানে। মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'আর নিশ্চয় যাবে না?'

'যাবো,' জবাব দিলো রবিন। 'পরে। লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা দল যাচ্ছে, ওদেরকে সাহায্য করতে হবে। তবে রুমারকে বলে এসেছি, আপাতত আমার কিছু কাজ করে দেবে সে।'

ইদানীং অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রবিন। ইস্কুল, গাড়ির ব্যবসা-এটা অবশ্য বেশির ভাগ মুসাই দেখাশোনা করে, তার ওপর ওই মিউজিক কোম্পানিতে কাজ। গোয়েন্দাগিরি করার মতো সময়ই পায় না এখন আগের মতো। তার পরেও ছাড়বে না কোনোদিনই, বলে দিয়েছে। দরকার হলে আর সব ছেড়ে দিতেও রাজি, তবু গোয়েন্দাগিরি নয়। তবে কিশোরের সন্দেহ আছে এ-ব্যাপারে।

যা-ই হোক, নিকি পাঞ্চের ব্যাপারে সব খুলে বলা হলো রবিনকে।

শেষে কিশোর বললো, 'পুরো গল্পটাই কেমন হাস্যকর। পুলিশ বিশ্বাস করবে কি, আমারই করতে ইচ্ছে করছে না। আরেকটা ব্যাপার, মুসা, লোকটার নামটা বড় অদ্ভুত। টিবুরন ব্রেকসান…'

'হয় টিবুরন, নয় তো ব্রেকসান,' মুসা বললো, 'তাই তো বললো। হয় এটা, নয় ওটা। দুটো মিলিয়ে এক নাম নয়।'

'আমার মনে হচ্ছে দুটো মিলিয়েই একটা। নিকি বললো না, নামটা মনে রাখতে পারে না। মনে রেখেছে ঠিকই, গোলমাল করে ফেলেছে, একটাকে দুটো বানিয়ে ফেলেছে। টিবুরন মানে কি জানো? এটা একটা স্প্যানিশ শব্দ, মানে হলো শার্ক বা হাঙর। প্রশ্ন হলো ওরকম একটা অদ্ভুত নাম কার হতে পারে?'

'হতে পারে লোকটারই,' মুসা বললো। 'জানে, গাড়িটা চোরাই। সে-জন্যেই নাম ভাঁড়িয়ে বলেছে...'

'না-ও বলতে পারে,' বাধা দিয়ে বললো রবিন। 'ওরকম নামের লোক আছে পৃথিবীতে। এই তো রকি বীচেই আছে, এল টিবুরন অ্যাণ্ড দা পিরানহাস!'

চার

হাঁ করে রবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর কিশোর।

'কি বললে?' কিশোর বললো, 'লোকটার নাম এল টিবুরন অ্যাণ্ড দা পিরানহাস!'

'লোকটা নয়,' শুধরে দিলো রবিন, 'লোকগুলো। পাঁচজন। একটা ল্যাটিনো লা বামবা ব্যাণ্ড দল। বেশির ভাগই সালসা গায়, তবে কিছু কিছু রকও গায়। এল টিবুরন হলো ওদের নেতা। গায় এবং গিটার বাজায়। গিটার বাদক আরও একজন আছে। অন্য তিনজনের একজন বেজ, একজন ড্রামার, আরেকজন কীবোর্ড।'

'তোমার বসের কোনো দল?' জানতে চাইলো মুসা।

মাথা নাড়লো রবিন। 'না। লিও গোয়েরার। শহরে লজের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। বার্টলেট লজের (রবিনের বস) ধারণা ওরা মিউজিকের ম-ও বোঝে না। গাইতে যায় ছোট ছোট ক্লাবে, কিংবা প্রাইভেট পার্টিতে। ল্যাটিনো ক্লাবগুলোতেই বেশির ভাগ দেখা যায় ওদের।'

'বেশি বয়েসী কেউ আছে ওদের মধ্যে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। বডিগার মালিক আনতিনো পেজের কথা বললো সে।

'না, সবাই অল্পবয়েসী। তরুণ। সবার মধ্যে বয়েস বেশি এল টিবুরনের, তবে বাইশ-তেইশের বেশি না।'

'রকি বীচে এখন গেয়ে বেড়াচ্ছে?' কিশোর জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। উপকূলের উজান-ভাটিতে সবখানে। এমনকি লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত চলে যায়। সম্ভবত এখন গোয়েরার সব চেয়ে জনপ্রিয় দল। সমস্ত ভালো ভালো দলগুলো লজের দখলে। তাতে ভীষণ খেপে গেছে গোয়েরা। পাগলের মতো ভালো দল জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। আমার বস্ শুধু হাসেন। বলেন, করুক না কতো পারে। তাঁর বক্তব্য, সৎ থাকতে হবে। নোংরামি করে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না।'

'ওরা কি...' থেমে গেল কিশোর।

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে এলেন মেরিচাচী গলায় জড়িয়েছেন নতুন একটা উজ্জ্বল রঙের সুন্দর স্কার্ফ। ওটা আগে আর দেখেনি কিশোর। আন্দাজ

করলো, বোধহয় নিকিই নিয়ে এসেছে। উপহারের প্যাকেটে ছিলো।

'কিশোর,' মেরিচাচী জানালেন, 'নিকি ঠিকই বলেছে রে। মিথ্যে বলেনি, তার মা বললো। তবে একটা কথা ভুলে বসেছিলাম, ন্যানির স্বভাব! একটুও বদলায়নি। আগের মতোই আছে। বদ! নিকি বাড়ি থেকে পালিয়েছে, অন্যায় কিছু করেনি। এতোদিন বড়িতে টিকলো কিভাবে সেটাই অবাক লাগছে!'

'তার মা কি বললো?'

'কি বলেনি! তা-ও নিজের ছেলের সম্পর্কে! আহারে, বেচারা নিকি!' বোনের ওপর ভীষণ রেগে গেছেন মেরিচাচী।

'পুলিশের সঙ্গে গোলমাল? গাড়ি চুরির ব্যাপারে কিছু?'

'তাকে শুয়োর বলে গাল দিলো ন্যানি। আলসের ধাড়ি বললো। বিশ্বাস করা যায় না। আরও নানারকম আজেবাজে কথা!'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'বললো?'

রাগে ফোঁস ফোঁস করছেন মেরিচাচী। বললেন, 'গাড়িটাড়ি চুরির ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে পুলিশের সাথে গোলমালে জড়িয়েছে। এই ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি। কিছুদিন নাকি ড্রাগও নিয়েছে। সেসব-অবশ্য বছর দশেক আগে। তারপর থেকে আর ওরকম কিছু করেনি। একবার পুলিশে ধরতেই শিক্ষা হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তো, কি বললো? হাজত থেকে বের করাবে?'

'কে, ন্যানি! আর লোক পাসনি! ও কিচ্ছু করবে না। একটা বখে যাওয়া ছেলের জন্যে একটা আধলাও খরচ করবে না, সাফ বলে দিলো। বললো,' শুয়োরটা যা পারে করুকগে। জেলে যাক, না জাহান্নামে যাক, যেখানে খুশি যাক, তার কিছু নয়। আমি উকিলকে ফোন করে দিয়েছি। সব শুনে বললো ছাড়িয়ে আনতে কষ্ট হবে।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'আর কিছু করেছে?' জানতে চাইলো রবিন।

মেরিচাচী বললেন, 'পুলিশ নাকি চায় না যে সে জামিনে মুক্তি পাক।'

'কিসের ভিত্তিতে আটকাবে?' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'মগের মুল্লুক নাকি?'

'দুটো কারণে। প্রথমত তার পুরনো ক্রিমিনাল রেকর্ড। তাছাড়া স্টেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। বড় কারণটা হলো, সে-ই একমাত্র লোক, যে সরাসরি একজন গাড়ি চোরকে দেখেছে। চোরের সঙ্গে কথা হয়েছে। ইদানীং নাকি রকি বীচে গাড়ি চোরের উৎপাত খুব বেড়েছে। সে-জন্যেই সতর্ক হয়ে গেছে পুলিশ।'

'তাকে বের করা যাবে কিনা কখন জানা যাবে?'

'একটা শুনানী হবে খুব তাড়াতাড়িই। তবে উকিল বললো, তার আগেই জজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে।'

'চেষ্টা চালিয়ে যাও। চাপে রাখ উকিল সাহেবকে,' কিশোর বললো তার চাচীকে। 'যেভাবেই হোক বের করে আনতেই হবে নিকিকে। এটাই এখন সব চেয়ে জরুরী, গাড়ি চোরদের ধরতে হলে।'

একমত হলেন মেরিচাচী। অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। এখনি আবার

ফোন করবেন উকিলকে।

ওয়ার্কশপে পরস্পরের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা।

'নিকিকে ছাড়া হবে না, কিশোর?' মুসার জিজ্ঞাসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কিশোর, 'ছাড়া যদি না-ই পাই বসে তো আর থাকতে পারবো না। কিছু একটা করতে হবে' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। 'হুঁ, তাহলে পুলিশ ভাবছে, রকি বীচে একদল গাড়ি চোর অপারেশন চালাচ্ছে। এই জন্যেই, বুঝলে এই জন্যেই…এতোক্ষণে বোঝা গেল। গত কিছুদিন ধরে গাড়ি চুরি বেড়ে গেছে এখানে' রবিনের দিকে ফিরলো সে। 'রবিন, একটা খোঁজ বের করতে পারবে? যেদিন ব্রেকসান নিকির সঙ্গে কথা বলেছে সেরাতে অক্সনার্ডে গিয়েছিলো কিনা এল টিবুরনের দল? লোকটা নিকিকে গাড়ি নিয়ে রকি বীচে আসতে অনুরোধ করেছে কিনা সেটাও জানতে পারলে ভালো হয়।'

'পারবো। গোয়েরাকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

'না, ওভাবে নয়। আমি চাই না আমাদের তদন্তের কথা বাইরের কেউ জেনে যাক।'

হাসলো রবিন। 'বেশ। দেখি, অন্যভাবে চেষ্টা করবো।'

'এখন থেকেই শুরু করো না কেন?'

'ঠিক আছে। যাই।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা, 'ইস্, ক্লাসের আর সময় পেলো না! একেবারে আজকেই! বিকেলে কারাতের ক্লাস।'

'এমন কি জরুরী হলো সেটা? একদিন ক্লাস না করলে কি এসে যায়?' হাত ওল্টালো কিশোর

'অন্য কিছু হলে ভাবতাম না। আজকে যে ক্যাটা শেখাবে!'

'তাতেই বা কি হলো?'

'ক্যাটাকে ছোট করে দেখো না।'

'ক্যাটা সত্যিই জরুরী' ব্যাখ্যা করে বোঝালো রবিন। 'একে বলা হয় কারাতের জীবন। পঞ্চাশটার মতো নিয়ম আছে। ঠিক কতোটা সময়ে কতখানি নড়তে হবে, তা-ই শেখানো হয়।'

'হুঁ। কারাতের প্র্যাকটিসও ভালো করে করতে হবে। যা জানি তাতে চলবে না বুঝতে পারছি' কিশোর বললো। 'আগে জুডোটা শেষ করে নিই, তারপর।'

'তারপর অবশ্য বেশি সময় লাগবে না তোমার। একসারসাইজটা হয়েই থাকছে, জুডো শেখা থেকেই।'

দাঁত বের করে হাসলো মুসা। 'আমিই শিখিয়ে দিতে পারবো। ওস্তাদ হয়ে যাবো তোমার। মুসা মুসা আর করতে পারবে না, ওস্তাদ ডাকতে হবে।'

হাসলো তিনজনেই।

'বেশ,' কিশোর বললো। 'যাও তোমার ক্যাটা শিখতে। আজকে আমি আর রবিনই সামলাতে পারবো। দেখি দু'জনে যতোটা পারি করি। রবিন, তোমার অসুবিধে হবে না তো? কাজে যাবে না?'

'গেলেই তো সুবিধে। খোঁজখবর করতে পারবো চাকরিতে থেকেই। বসকে বলে চলে যাবো গোয়েরার ওপর জরিপ চালাতে। কি মজাটাই যে হবে…'

'মরুকগে ক্যাটার ক্লাস,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো মুসা। 'একদিন তো আর হবে না, আরও হবে। পরেও শিখে নেয়া যাবে। আজকে গোয়েন্দাগিরিটা পণ্ড করতে রাজি নই। অনেক দিন পর একটা কেস পেলাম…'

হাসলো কিশোর। 'জানতাম, না গিয়ে পারবে না।'

বেরিয়ে এলো তিনজনে। রবিন এগোলো তার ফোক্স ওয়াগনের দিকে, পুরনো ফিয়ারোর দিকে মুসা। কার গাড়িতে উঠবে, ভাবছে কিশোর, এই সময় গেটের ভেতর ঢুকলো একটা চকচকে রূপালী জাগুয়ার এক্স জে সিক্স সেডান গাড়ি। ঝটকা দিয়ে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। বনবেরালির মতো লাফিয়ে নেমে এলো অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে। তামাটে চোখ, তামাটে চুল। হাসলো তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে। বললো, 'শার্লক হোমসেরা সবাই আছে দেখছি। এদিক দিয়েই যাচ্ছিললাম। ভাবলাম দেখাটা করেই যাই।'

কিশোর হাসলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'মুসা যাবে কিনা জানতে এলে নিশ্চয়?'

'কি করে বুঝলে?' অবাক হয়েছে জরজিনা পারকার ওরফে জিনা।

'কারণ আজ তোমাদের কারাতের ক্যাটা ক্লাস।'

'ও, মুসা তাহলে বলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। আর মুসা থাকলে যে তোমার সুবিধে হয়, সেটাও জানি। খালি তো ঝগড়া বাধাও এরওর সঙ্গে। ও না থাকলে তোমার পক্ষ নেবে কে?'

'দেখ,' ফুঁসে উঠলো জিনা, 'রাগাবে না বলে দিলাম…' চট করে সামলে নিলো নিজেকে। 'সরি।' মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন যাবে?'

'আজ আর যাবো না।'

'কেন!'

'একটা কেস পেয়ে গেছি। কিশোরের খালাতো ভাইকে গাড়ি চুরির দায়ে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে।'

'ও!' নিরাশ হলো জিনা। 'ঠিক আছে, কি আর করা। কেস পেলে তো সেটা বাদ দিয়ে দুনিয়ার আর কোনো কাজ করবে না, জানি। চাপাচাপি করেও লাভ হবে না। ও-কে, চলি।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল জিনা।

মুসার সঙ্গেই যাবে, ঠিক করলো কিশোর। মুসা উঠলো গাড়িতে। কিশোর উঠতে যাবে, এই সময় বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ডেকে বললেন, 'মুসা, তোমার ফোন।'

'দুত্তোর!' বলে বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলো মুসা। 'খালি বাধা! কে?'

'তোমার মা।'

মিনিটখানেক পরে মুখ চুন করে ফিরে এলো মুসা। মাথা নেড়ে বললো, 'আমার আর যাওয়া হলো না! সর্বনাশ করলো ওই জিনাটা! নইলে এতোক্ষণে

বেরিয়ে যেতে পারতাম, মা-ও আর আমার নাগাল পেতো না!'

'কি, হয়েছে কি?'

'বাবার গাড়ি নিয়ে বাবা চলে গেছে। মার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, অ্যাক্সেল নাকি ভেঙেছে খাদে পড়ে। সারতে সময় লাগবে। আমার গাড়িটা নিয়ে যেতে বলেছে এখন। শোফার হতে হবে, বাজারে যাবে মা। শাসিয়ে দিয়েছে, জলদি জলদি না গেলে খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ।'

'কি আর করবে!' হতাশ কিশোরও হয়েছে। হাত নেড়ে বললো, 'যাও। আজ যা করার আমাকে আর রবিনকেই করতে হবে আরকি।'

ফিয়ারোতে চড়ে বেরিয়ে গেল মুসা।

'চলো, যাই,' রবিনের কাঁধে হাত রাখলো কিশোর।

ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে শহরতলীর দিকে গাড়ি হাঁকালো রবিন।

'কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইলো কিশোর।

'লিও গোয়েরার অফিসে।'

'কিন্তু আমাদের তদন্তের কথা তো বলা যাবে না।'

'দেখই না কি করি।'

শহরতলীতে বাজার এলাকার একধারে পুরনো একটা বাড়ির পেছনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকালো রবিন। গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে দু'জনে চলে এলো বাড়িটার সামনের দিকে। জীর্ণ হয়ে আসা বাড়িটাতে এলিভেটর নেই। আলোও নেই তেমন। শুধু সিঁড়ির মাথার ওপরে ছাতে লাগানো নোংরা স্কাই লাইট দিয়ে আসছে ম্লান আলো।

সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে বড় একটা হলঘরে ঢুকলো ওরা। মেঝেতে কার্পেট নেই। দুই পাশে দুই সারি দরজা, ছোট ছোট কেবিনের। পাল্লার নিচের অর্ধেকটা কাঠের, ওপরের অর্ধেকটায় কাঁচ লাগানো। আঁচড় আর নানারকম দাগ পড়ে আছে কাঁচগুলোয়। ধুলো তো আছেই। ডানের সারির শেষ মাথার দরজাটার সামনে এসে থামলো রবিন। ঠেলা দিয়ে খুললো পাল্লা। বাইরের দিকে একটা ঘর, এটা আউটার অফিস। ভেতরে আরেকটা ঘর আছে, সেটাতে বসে লিও গোয়েরা।

বাইরের ঘরে বসে রয়েছে উনিশ-বিশ বছরের একটা মেয়ে। সোনালি চুল। লম্বা একটা তালিকা টাইপ করছে। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে হাসলো। ভুরু নাচিয়ে ইশারায় জানতে চাইলো কি জন্যে এসেছে। রবিনকে চেনে।

'কেমন আছো, নিরা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'ভালোই আছি। খোশ গল্প করতে আসোনি তুমি। কি জন্যে?'

'মিস্টার গোয়েরার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'এখন তো তার লাঞ্চের সময়।'

'সেই জন্যেই তো এখন এলাম।'

একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা। আবার হাসলো। 'বড় বেশি আত্মবিশ্বাস?'

'হ্যাঁ। জানি তুমি আমাকে ঢুকতে দেবেই। তোমার ওপরই ভরসা করে

এসেছি' হাসলো রবিন। পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এ হলো কিশোর পাশা, আমার বন্ধু। কিশোর, ও নিরা লনচার। প্রাইভেট সেক্রেটারির জগতে একজন বিস্ময়। ওর মতো সেক্রেটারি সারা লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে কিনা সন্দেহ।'

'দূর, কি যে বলো!' বললো বটে নিরা, তবে খুশি যে হয়েছে, তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলো কিশোর। অবাক হয়ে আরেকবার ভাবলো, গানের কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে সামাজিকতার ব্যাপারে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে মুখচোরা বইয়ের পোকা রবিনের। কি সহজে পটিয়ে ফেললো মেয়েটাকে!

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস লনচার,' বললো কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিলো।

'আমাকে অতো সৌজন্য দেখাতে হবে না। রবিনের বন্ধু তুমি। তিন গোয়েন্দার হেড, ভালো করেই জানি। আমাকে শুধু নিরা বলে ডাকলেই চলবে।'

'থ্যাংক ইউ।'

'তারপর, রবিন,' নিরা বললো। 'ব্যাপারটা কি বল তো? কিজন্যে এসেছো?'

'লজের একজন মক্কেল, লা বামবার একটা দল ভাড়া করতে এসেছে। বড় বেশি চাপাচাপি করছে,' রবিন বললো। 'কিন্তু এ-মুহূর্তে কোনো দলই বসে নেই আমাদের। একটাও দিতে পারলাম না। অন্য কিছু হলে চলবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। বললো, দু'রাত আগে অক্সনার্ডে একটা দলের গান শুনেছে। চমৎকার নাকি গেয়েছে। নামটা কি যেন বললো...ও হ্যাঁ, এল টিবুরন অ্যাণ্ড দা পিরানহাস।' সরাসরি নিরার চোখের দিকে তাকালো সে। 'ওরা কি সত্যিই গিয়েছিলো নাকি সেদিন? পরের দুটো দিন কোথায় গেয়েছে ওরা?'

মেয়েটা বললো, 'মিস্টার গোয়েরা চান না তাঁর কোন দল বসে থাকুক। খুব খাটাচ্ছেন। কিন্তু মিস্টার লজ তো চান সব চেয়ে ভালো জিনিস।'

'এখন কিছু করার নেই তাঁর। মক্কেল যখন চাইছে, তাকে খুশি করাই হলো আসল ব্যাপার। এল টিবুরনকে পাওয়া যাবে?'

'দাঁড়াও' বলে ভেতরের অফিসে চলে গেল নিরা।

'কি করতে গেল?' কিশোরের সন্দেহ।

'গোয়েরার দেয়ালে টাঙানো বুকিং চার্ট দেখতে। এই একই সিসটেম রয়েছে লজের অফিসেও। খুব দ্রুত জানা যায় কখন কোন দল কোথায় কাজ করছে। এক নজরে। কমপিউটারের চেয়ে দ্রুত।'

ফিরে এলো নিরা। 'হ্যাঁ, দু'রাত আগে অক্সনার্ডে গিয়েছিলো এল টিবুরন। দা ডিউসেস-এ গাইতে। পরের দুটো দিন দা শ্যাক-এ গেয়েছে' নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো সে। 'আপাতত ওদেরকে পাওয়া যাবে না। ব্যস্ত।'

হাঁপ ছাড়লো রবিন। পাওয়া যাবে না বলাতে। যাবে বললেই বরং পড়ে যেতো বিপদে।

'গোয়েরার সঙ্গে আর কথা বলার দরকার আছে?' নিরা জিজ্ঞেস করলো।

'নাহ্!' যেন নিতান্তই নিরাশ হয়েছে রবিন। 'আর কি লাভ?'

'সরি। কিছু করতে পারলাম না।'

'না না, ব্যস্ত থাকলে আর কি করবে তুমি? চলি, আবার দেখা হবে। মেনি মেনি থ্যাংকস।'
বাইরে বেরিয়েই কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো রবিন। 'কি বুঝলে?'
'পাবলিক ডিলিংসে ওস্তাদ হয়ে গেছ তুমি, রবিন, সত্যি!'
'কেন, তুমি কি ভেবেছিলে যোগ্যতাটা শুধু তোমার একলার?'
খোঁচাটা গায়ে মাখলো না কিশোর। দ্রুত নেমে চললো ধূলিধূসরিত সিঁড়ি বেয়ে।
রবিনের গুবরে পোকার আকৃতির গাড়িতে এসে উঠলো দু'জনে। স্টার্ট দিয়ে পার্কিং লটের বাইরে গাড়ি নিয়ে এলো রবিন। রাস্তায় উঠে বললো, 'তাহলে সত্যিই অক্সনার্ডে গিয়েছিলো এল টিবুরন।'
'আর দা শ্যাক হলো একটা সাধারণ পিজা কাফে,' কিশোর বললো, 'সহজেই ঢুকতে পারবো আমরা। চিনি। নিকি বেরোতে পারলে ব্রেকসানকে চিনিয়ে দিতে পারতো। না পারলে আমরাই যাবো। টিবুরনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবো।'
'কখন?'
'আজ রাতে। হেডকোয়ার্টারে জড়ো হবো আমরা। সেখান থেকে যাবো দা শ্যাকে। কথা বলবো হাঙর আর পিরানহাদের সঙ্গে। এল টিবুরন অ্যাণ্ড দ্য পিরানহাস! হুঁহ, নাম বটে!'

পাঁচ

রকি বীচের পুব প্রান্তে ছোট রেস্টুরেন্টটা। দা শ্যাক। আটটায় সেখানে পৌঁছলো রবিন আর কিশোর। মুসা আসতে পারেনি, মুক্তি দেননি তার মা। ধরে নিয়ে গেছেন কোন এক পার্টিতে, অবশ্যই শোফার হিসেবে।
'গাড়ি কিনেও তো হয়েছে এক জ্বালা!' বিরক্ত হয়ে বলেছে কিশোর, যখন ফোনে শুনেছে মুসার বিলাপের মতো সুর।
ছোট, নোংরা রেস্টুরেন্টটা হাই স্কুল আর জুনিয়র কলেজের ছাত্রদের আকর্ষণ করে বেশি। মিউজিক আর লিকার অনেক জায়গায়ই আছে, তবে সেখানে আইনেরও কড়াকড়ি। একুশ বছরের নিচের কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মদ গেলা তো দূরের কথা, গান শোনার জন্যেও বসা নিষেধ। কিন্তু এখানে গান শোনা বারণ নয়। কড়া মদ অবশ্য এখানে মেলে না, তবে সফট ড্রিংক খেতে খেতে গান শোনার জায়গারও তো অভাব এই শহরে, অন্তত ওই বয়েসীদের জন্যে।
তাই ঝাঁকে ঝাঁকে আসে কিশোর-কিশোরীরা। আজ অবশ্য এখনও আসেনি।
ভেতরে ঢুকলো দুই গোয়েন্দা। এককোণে ঝরঝরে একটা পুরনো পিনবল মেশিন বাজাচ্ছে দু'জন হাই স্কুলের ছাত্র। আরও দু'জন পিজা চিবুচ্ছে। নীরব একটা টিভি সেটের ওপর যেন সেঁটে রয়েছে চোখ। আয়তাকার ডান্স ফ্লোরের

একধারে একটা টেবিলে বসেছে চারটে ল্যাটিনো মেয়ে। ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে যারা, হয়তো ওদেরই গার্লফ্রেণ্ড হবে মেয়েগুলো। কারণ একমাত্র ওরাই তাকিয়ে রয়েছে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের দিকে।

ঘরটা প্রায় শূন্য। কিন্তু আওয়াজের চোটে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। ড্রাম বাজছে দিড়িম দিড়িম করে। আর বিকট গলায় গান গেয়ে চলেছে পাঁচটা ল্যাটিনো ছেলেঃ লা বামবা-লা বামবা-বামবা-বামবা-ইলেকট্রিক গিটার, বেজ, আর একটা কীবোর্ড বাজিয়ে চলেছে বাদকেরা, যেন মেকসিকান স্ট্রীট ব্যাণ্ড-মেকসিকোর পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায় যেসব যাযাবর গায়কের দল, অনেকটা তেমনি। আরও নানারকম বাদ্যযন্ত্র আছে। ঢাক বাদকেরা নিয়ম করে বাড়ি মারছে সেগুলোতে। পায়ের কাছে যেন সাপের মতো জড়াজড়ি করে রয়েছে তার। আরও রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার, পেডাল, আর পঞ্চাশটার মতো নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থার মাঝে কোনো মতে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে চলেছে ওরা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেঃ লা বামবা…লা বামবা…

এল টিবুরন অ্যাণ্ড দ্য পিরানহাস! ওরা চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, দাপাচ্ছে, বান মাছের মতো শরীর মোচড়াচ্ছে, টারজান সিনেমার আফ্রিকান জংলীদের মতো শূন্যে ঝাঁপ মারছে, যা ইচ্ছে তাই করছে নাচ আর গানের নামে। দরদর করে ঘামছে। উৎসুক চোখে তাকালো রবিন আর কিশোরের দিকে।

পেছনের একটা টেবিলে বসে পড়লো দুই গোয়েন্দা।

'পাগল না ছাগল!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'মোটেই সুবিধের লাগছে না আমার ওগুলোকে।'

'লজ বলেন, গাওয়ার চেয়ে চেঁচায় বেশি,' রবিন বললো। 'এই নাকি গান! দূপ!'

'শাদা সুট পরাটাই নিশ্চয় এল টিবুরন? লম্বা, গিটার বাজাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। একেবারে সামনের লোকটার কথা বলছো তো?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে লম্বা ল্যাটিনো লোকটার দিকে। তার আর বাদ্যযন্ত্রের জঙ্গলের মাঝে নাচতে বেশ কায়দা কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। স্লিম, হ্যাণ্ডসাম, শাদা স্যুট, লম্বা জ্যাকেট, আর বুক খোলা সিল্কের শার্টে মনে হচ্ছে গায়ক নয়, পোশাক কিংবা সুগন্ধী কোম্পানির মডেল। যতোটা ধোপধুরস্ত তার একআনাও গানের প্রতিভা থাকলে আরও অনেক ভালো গাইতো। তার পেছনে চারজন পিরানহাই তার চেয়ে খাটো। লাল আর কালো রঙের পোশাক পরনে।

'জায়গাটা ল্যাটিনোদের জন্যে নয়,' রবিন বললো। 'গোয়েরা যে কেন এদেরকে এখানে পাঠালো বুঝতে পারছি না।'

'আমারও একই প্রশ্ন।'

মাটি কোপানোর চেয়ে বেশি কষ্ট করছে গায়কের দল। সরাসরি ঢুকে পড়েছে রক 'এন' রোলে। খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে রয়েছে হাই স্কুলের ছাত্ররা। এক এক করে আরও ছেলে ঢুকতে শুরু করেছে। তবে ভিড় যাকে বলে তা এখনও হয়নি।

হঠাৎ পাশে ঝুঁকে কিশোরের হাতে হাত রাখলো রবিন। 'লিও গোয়েরা!'

বেঁটে, গাট্টাগোট্টা একজন লোক ঢুকেছে। পরনে দামী ধূসর রঙের স্যুট। বিশাল ভুঁড়ি। পকেট ঘড়ির চেনটা ঝুলে রয়েছে তার ওপর। ভারি গোলগাল মুখ। ফ্যাকাসে। দাড়ি কামিয়েছে ভালো করেই তবু মনে হয় আরেকটু কামালে ভালো হতো। একধরনের মুখ আছে, দাড়ি কামালেও মনে হয় ঠিকমতো শেভ করা হয়নি। গোয়েরারটা ওরকম।

'ভয়াবহ জীবন্ত' বাদকদের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলো গোয়েরা। পুরো ঘরে চোখ বোলালো। এখন অর্ধেক খালি।

'আমাদের চিনে ফেলবে না তো?' কিশোর বললো।

'চিনবে। টিবুরনের কাছে কি দরকার আমার, নিশ্চয় বলেছে নিরা।'

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গোয়েরা। তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বাদকের দলের দিকে। পছন্দ করতে পারছে না যেন। আরও লোক ঢুকলো। গান তখন শেষ পর্যায়ে। পাগল হয়ে গেছে গায়ক আর বাদকেরা। দেখে মনে হয়, ধরে এখন সব কটাকে পাগলা গারদে ভরলেও অনুচিত কাজ হবে না।

শেষ হলো গান। চোখের পলকে স্টেজ ছেড়ে মেয়েদের কাছে চলে এলো পিরানহারা। যেন চিরকালের মতো ত্যাগ করে এলো বাদ্যযন্ত্রগুলো। সেই চারটে মেয়ের কাছে, যারা সামনের টেবিলে বসেছে। ভিড় বাড়ছে। ওদের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে টিবুরন, মাঝে মাঝে থেমে হেসে কথা বলছে। চুরুট ধরালো লিও গোয়েরা। তারপর চোখ পড়লো রবিনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে ফেললো ভুরু। এগিয়ে এলো তার টেবিলের দিকে।

'এসেছো, না?' টেবিলের কাছে বসে পড়লো গোয়েরা। 'বার্টি তাহলে টিবুরনকে চাইছে! তা, চাক। দরকার হলে তো চাইবেই। কিন্তু আমার সোজা কথা, কোনো কমিশন দিতে পারবো না। যা রেট আছে তাতে নিয়ে গিয়ে নিজে পারলে বেশি আদায় করে নিক মক্কেলের কাছে।'

'লা বামবার ব্যাপারেও আগ্রহ জাগতে পারে আমাদের,' পাকা ব্যবসায়ীর মতো বললো রবিন। 'নিতে বলেননি মিস্টার লজ, শুধু টিবুরনকে দেখে যেতে বলেছেন আমাকে। লস অ্যাঞ্জেলেসে দল খুঁজছেন তিনি এখন। ওখানে পেয়ে গেলে...'

কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠলো গোয়েরা। 'নিরা কিন্তু আমাকে ওকথা বলেনি। বলেছে, একটা লোক নাকি দু'রাত আগে অক্সনার্ডে টিবুরনকে দেখেছিলো। তারপর থেকেই পাগল হয়ে আছে ভাড়া করে নেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু টিবুরনকে আমরা পাইনি এখনও,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবিন। 'পেলে আধাআধি বখরা হবে। রাজি?'

রাগে কালো হয়ে গেল গোয়েরার মুখ। 'সুযোগ আসবে, বুঝলে, আসবে! একদিন ওই বার্টিটাকে ঘাড় ধরে যদি শহর থেকে না বের করেছি আমি, আমার নাম গোয়েরা নয়। সবাই জানে লোক ঠকাচ্ছে সে। মিথ্যে কথা বলছে। ওখানে থাকলে তোমারও বারোটা বাজবে, ইয়াং ম্যান, বলে দিলাম। ঝরঝরে হয়ে যাবে

ভবিষ্যৎ।'

'আমার ভবিষ্যৎ বলে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ,' পিত্তি জ্বালানো মসৃণ কণ্ঠে বললো রবিন।

শুনলোই না যেন গোয়েরা। 'আমার কথা শুনলে বার্টির দল ছেড়ে আসো,' লম্বা টান দিলো চুরুটে। 'চাইলে এখনই একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'টাকা দেখতে সব সময়ই ভালো লাগে আমার,' হাসলো রবিন।

দুই বছরেই অনেক অনেক চালাক হয়ে গেছে রবিন, ভাবলো কিশোর। হাই স্কুলে উঠে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। ভালোই হয়েছে। তিন গোয়েন্দারও অনেক উন্নতি হবে এতে। জয়জয়কার আরও বেশি ছড়িয়ে পড়বে।

'বার্টির খবর-টবর বলতে হবে। ওই ইনফরমেশন যাকে বলে। ওর মক্কেল কারা কারা, কিভাবে দল জোগাড় করে, কাজ করে, এসব।'

'সর্বনাশ! এ-যে পুরো গুপ্তচরগিরি, মিস্টার গোয়েরা!' আঁতকে ওঠার ভান করলো রবিন।

'ব্যবসা করতে গেলে সবাই এরকম করে।'

'তাই নাকি? কই, শুনিনি তো। মাপ করবেন, বেঈমানী আমি করতে পারবো না।'

জ্বলে উঠলো গোয়েরার চোখ। 'এতো সাধুগিরি দেখিও না আমার কাছে। এতোই যদি ভালোমানুষ, এখানে এসেছো কেন? আমার তো মনে হয় না বার্টি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। টিবুরনকে নেয়ার জন্যে সে কাউকে পাঠাবে, একথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?'

হাসলো রবিন। 'সত্যি, মিস্টার লজ...'

তার পায়ে লাথি মারলো কিশোর। মিস্টার লজ যে তাদেরকে এখানে পাঠাননি, একথা কাউকে জানতে দিতে চায় না সে।

সন্দেহ ফুটলো গোয়েরার চোখে। তাকিয়ে রয়েছে রবিনের দিকে। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো টিবুরন।

'আমার কথা বলছেন মনে হয়?' গোয়েরার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলো সে। 'কানে এলো।' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার ফ্যান বোধহয়। আমাদের গান ভালো লেগেছে। তোমরা নিশ্চয় চাও...'

'আমরা...' শুরু করলো রবিন।

তাকে শেষ করতে দিলো না কিশোর। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'দারুণ বাজান আপনারা! গলাও খুব ভালো। বিশেষ করে আপনার। আপনিই এল টিবুরন?'

'হ্যাঁ।'প্রশংসা শুনে যেন ফেটে যাবে টিবুরন। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। কাছে থেকে তার চেহারাটা আরও স্পষ্ট দেখতে পেলো কিশোর। লম্বাটে মুখ। চামড়া এতো মসৃণ, যেন পালিশ করা সুটকেসের চামড়া। 'অটোগ্রাফ দেয়া ছবি চাও তো? মিস্টার গোয়েরা, দিয়ে দিন না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েরা। সন্দেহ ভারি হয়েছে দৃষ্টিতে। রবিনের সঙ্গে এই ছেলেটার কি সম্পর্ক বুঝতে পারছে না। সত্যিই যদি কিশোর একজন ভক্ত হয়ে থাকে, তাকে আহত কিংবা নিরাশ করতে চায় না সে। কিন্তু রবিনের সঙ্গে যদি এসে থাকে, শুধু সঙ্গ দিতে কিংবা দেখতে, তাহলে তার জন্যে কিছুই করার ইচ্ছে নেই তার। কাজেই কিশোরের ব্যাপারে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো। রবিন কে, সেকথাই বরং টিবুরনকে বোঝাতে সচেষ্ট হলো।

'ছবি গাড়িতে রয়েছে,' গোয়েরা বললো। 'পরে এনে দেয়া যাবে।' ইশারায় রবিনকে দেখিয়ে বললো, 'এই ছেলেটা ভক্তটক্ত কিছু নয়। সে কাজ করে...'

'কি যে বলেন,' বিশ্বাস করলো না টিবুরন। 'আমার ফ্যানদের আমি চিনি না?' ভ্রূকুটি করলো সে। দাঁত বের করে হাসলো। অনেকটা ইঁদুরের মতো দেখালো তাকে তখন। 'যান যান, ছবি নিয়ে আসুন। আমার ফ্যানদের আমি নিরাশ করতে চাই না।'

কিশোর আর রবিন দু'জনেই ভাবলো, বোমার মতো ফেটে পড়বে গোয়েরা। কিন্তু ওরকম কিছু করলো না লোকটা। শুধু ঢোক গিললো। কোনো মতে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল সামনের দরজার দিকে।

'আরও একটা ছবি কি পেতে পারি?' বিনীত হেসে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'আমার খালাতো ভাই নিকির জন্যে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার খালাতো ভাইও কি আমার ফ্যান?'

'না, ঠিক তা নয়। সে বলেছে, আপনাকে চেনে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছে আমাকে।'

'অন্য কোনো দলের লোক? অনেক দলের অনেককেই চিনি আমি।'

'না, তাও নয়। সে আপনার ভাইয়ের গাড়িটা রকি বীচে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আপনার ভাইকে খুঁজে বের করতে পারেনি।'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল টিবুরনের হাসি। তারপর ফিরে এলো আবার। তবে বদলে গেছে হাসিটা। এখন আর ইঁদুর মনে হয় না তাকে, মনে হয় হাঙর। 'হ্যাঁ, শুনেছি ফিরিঙ্গিটার কথা। গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। গল্প বলে বেড়াচ্ছে আমার ভাই নাকি তাকে ওই গাড়িটা আনতে বলেছিলো। লোককে তো দূরের কথা, পুলিশকেও বিশ্বাস করাতে পারেনি।' এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, যেন বেচারা নিকির জন্যে দুঃখ হচ্ছে। 'তাহলে নিকি তোমার খালাতো ভাই? ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড!'

'তাহলে গাড়িটার কথা কিছুই জানেন না আপনি?' প্রশ্ন করলো রবিন।

শব্দ করে হেসে উঠলো টিবুরন। 'কি বলবো তোমাদেরকে, আমার কোনো ভাইই নেই। গাড়ির কথা বলবে কি করে সে?' আর দাঁড়ালো না সেখানে গায়কদের দলপতি। হাসতে হাসতে চলে গেল তার দলের কাছে।

কিছুটা বোকা হয়েই কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। 'কিশোর, যদি ওর ভাইই না থাকে, তাহলে কে বললো, সত্যিই তো? তাহলে নিকিই মিথ্যে কথা

বলেছে?'

ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের চার পিরানহার চোখ এখন কিশোর আর রবিনের দিকে। একগাদা ফটোগ্রাফ নিয়ে ফিরে এলো গোয়েরা। দর্শকদের দিকে তাকালো একবার। তারপর ফিরলো এল টিবুরন আর পিরানহাদের দিকে। আবার গান গাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে বাদকের দল। স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলো সে।

'ওঠো,' জরুরী কণ্ঠে বললো কিশোর, 'কেটে পড়ি!'

'ছবি নেবে না?'

'না। ওঠো ওঠো!'

ভিড় বেড়েছে অনেক। আরও আসছে। ওদেরকে ঠেলেঠুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লো দু'জনে। ডিসপ্লে বোর্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা হাত বাড়িয়ে একটানে টিবুরনের ছবিটা ছিঁড়ে নিলো কিশোর। তারপর রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এলো ফোক্স ওয়াগনের কাছে।

যেন ঘোরের মধ্যে গাড়িতে উঠলো রবিন। কিশোরের তাড়াহুড়োর কারণটা বুঝতে পারছে না। বললো, 'ভাইয়ের ব্যাপারে টিবুরন মিথ্যে বলেনি, কিশোর। মিথ্যেটা তোমার ভাইই বলেছে।'

'আমার তা মনে হয় না। চোরাই গাড়ি ডেলিভারি দেয়ার কথা সত্যি হয়ে থাকলে মিথ্যেটা টিবুরনই বলেছে। সাধ করে আর কে পুলিশের হাতে ধরা দিতে চায়,' কিশোর কথা বলছে। রবিন এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। 'তবে, কেউ একজন যে মিথ্যে বলছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কে, কিশোর?' গাড়ি রাস্তায় এনে ফেললো রবিন। 'আর মিথ্যেটা কি?'

পেছনে তাকালো কিশোর। কারও আসার আশঙ্কা করছে। ধরা পড়ার আগেই পালাতে চেয়েছে, সে-জন্যেই বেরিয়ে এসেছে তাড়াহুড়া করে। কাউকে দেখলো না। বললো, 'এমনও হতে পারে, টিবুরন গল্পটাই শুধু শুনেছে। হতে পারে আনতিনো পেজ কিংবা তার কোনো লোকের কাছে। এর মানে ওরা টিবুরনকে চেনে, এবং মিথ্যে বলেছে শুধু আমাদের কাছে নয়, পুলিশের কাছেও।'

'ঠিকই বলেছো।'

'আর, আমরা অক্সনার্ডের কথা বলিনি। অথচ টিবুরন সেকথা বলে ফেললো। তারমানে জানে নিকি গাড়িটা পেয়েছে ওখানে।'

'তাই তো! নিকিই তো সত্যি বলেছে মনে হচ্ছে এখন। তো, কি করবো এরপর?'

'কি করবো?' আরেকবার পেছনে তাকালো কিশোর। 'গাড়ি ঘোরাও। শ্যাকের কাছে গিয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকবো, টিবুরন আর পিরানহাদের বেরোনোর অপেক্ষায়।'

ছয়

ফোক্স ওয়াগনে হীটিং সিসটেম নেই। গরম হয় না ভেতরটা। বসে বসে শীতে কাঁপতে থাকলো দুই গোয়েন্দা। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া অনেকটা মরুভূমির মতো। দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা। একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। সামনে দীর্ঘ রাত। শ্যাকের ভেতর থেকে আসছে জোরালো বাজনা।

মিউজিক বেরোতেই থাকলো। মাঝে মাঝে একআধজন করে লোক। এরকম চললো মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর নীরবতা। শেষ লোকগুলো বেরিয়ে এলো দু'জন তিনজন করে করে। হঠাৎ আবার বেজে উঠলো বাজনা। ড্রামের বিকট শব্দ যেন সব কিছু চুরমার করে দেয়ার শপথ নিয়েছে।

বেরিয়ে এলো লিও গোয়েরা। একটা মাত্র স্ট্রীট ল্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা এক লোকের উদ্দেশে হাত নাড়লো। কিশোরের মনে হলো ওই লোকটাই শ্যাকের মালিক। টিবুরন আর পিরানহারাও বেরিয়ে এসেছে। ঘিরে দাঁড়িয়েছে দাড়িওয়ালা লোকটাকে। নিচু গলায় ওদেরকে কি যেন বললো গোয়েরা, তারপর গিয়ে উঠলো একটা রূপালি-ধূসর রোলস রয়েসে। চলে গেল। ওপরের দিকে হাত তুলে ঝাঁকালো শ্যাকের মালিক, ভেতরে চলে গেল। টিবুরন আর পিরানহারা অদৃশ্য হয়ে গেল বিল্ডিঙের পেছনে।

'ওই যে, আরেকটা পার্কিং লট,' দেখালো রবিন। 'ওখান থেকেই বেরোবে ওরা।...কিশোর, রোলস রয়েসটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। কিন্তু তার পরেও অনেক দাম। ব্যাণ্ডের দালালী করে এতো টাকা কিভাবে জোগাড় করলো সে? লজ যে এতো টাকা কামাচ্ছেন, তা-ও তো কিনতে পারছেন না।'

আনমনে তখনও মাথা নেড়েই চলেছে রবিন, যখন ব্যাণ্ড দলের প্রথম গাড়িটা বেরোলো বিল্ডিঙের পেছনের পার্কিং লট থেকে।

চমকে গেল কিশোর। 'দেখ অবস্থা!'

বিরাট একটা সেডান গাড়ি। কাদের তৈরি, কোন্ বছরের, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। বডিটা মাটির খুব কাছাকাছি, আকারটাও অদ্ভুত। বডির ওপরে বেশ কায়দা করে আরেকটা খোলস পরানো রয়েছে।

'লো-রাইডার!' আবার বললো কিশোর।

মাটির মাত্র ছয় ইঞ্চি ওপরে রয়েছে গাড়িটার শরীরের নিচের অংশ। হয় স্প্রিং আর শক অ্যাবজরবারগুলো কেটে খাটো করে ফেলা হয়েছে, নয়তো হাইড্রলিক সিসটেমে কোনো কারিগরি করা হয়েছে, যাতে পুরো বডিটাই নিচে নেমে যায়। সেরকম কিছু হলে প্রয়োজনের সময় আবার ওপরে তুলে ফেলা যায়। এবড়োখেবড়ো পথে কিংবা হাইওয়েতে জোরে চালানোর সময় ইচ্ছেমতো ওপরে নিচে করে নিতে পারবে। সামনে পেছনে ইস্পাতের পাত লাগানো থাকে লো-রাইডারের তলায়, যাতে রাস্তার সঙ্গে ঘষা লাগলে আসল বডির কোনো ক্ষতি না হয়।

পেছনে মিছিল করে বেরোলো আরও চারটে লো-রাইডার। মোড় নিয়ে রওনা হলো ব্যারিও যেদিকে রয়েছে সেদিকে।

শুধু তরুণ ল্যাটিনোরাই লো-রাইডার চালায়। ব্যারিওর প্রাণ এসব গাড়ি। নিজেদেরকে আলাদা করে চেনানোর জন্যে এরকম করে ল্যাটিনোরা। আরও একটা কারণ আছে, মেয়েদের কাছে নিজেদের বিশেষত্ব দেখানোর জন্যে, ওদের চোখ ঝলসানোর জন্যেও একাজ করে ল্যাটিনো তরুণেরা। আর এই গাড়িতে চড়লেই বুঝতে হবে আরোহীরা আমেরিকান নয়। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয় লো-রাইডার। বার বার রঙ করা হয়, পালিশ করা হয়, বাইরে ভেতরে অলংকরণ করা হয়। ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হয়, যাতে দেখলেই নজর আকৃষ্ট হতে পারে। শনিবার রাতের প্যারেডে কিংবা গাড়ির প্রদর্শনীতেও নিয়ে যাওয়া হয় এসব গাড়ি।

তবে এই পাঁচটা লো-রাইডার একটু আলাদা ধরনের। তেমন সাজানো গোছানো নয়। গায়ে লেখা হয়েছে নানারকম লেখা। বেশির ভাগই বিজ্ঞাপন। এল টিবুরন আর পিরানহাদের প্রতিভার গুণগান। দশটা বিভিন্ন রঙে লেখা হয়েছে ওগুলো। দৃষ্টিকটু।

'বিজ্ঞাপন,' কিশোর বললো। 'ব্যাটাদের ট্রেডমার্ক ভালোই হলো। অনুসরণ করা সহজ হবে। চোখেও পড়বে, আর জোরেও চালাতে পারবে না।'

গাড়িগুলো কিছুদূর এগিয়ে গেলে পিছু নিলো রবিন। ধীরে ধীরে চলছে। গাড়ি এতো আস্তে চালালে কি আর ভালো লাগে? তবু বাধ্য হয়ে চালাতে হচ্ছে ওকে। অবশেষে ব্যারিওতে পৌঁছলো মিছিল। তবে ভেতরে ঢুকলো না। মোড় নিয়ে এগিয়ে গেল ট্যাকো বেল-এর একটা কার ওয়াশে। রকি বীচ হাই স্কুলের দুই ব্লক দূরে জায়গাটা। এতো রাতেও অনেক গাড়ি দেখা গেল ওখানে।

জায়গাটা ভালো করেই চেনে কিশোর আর রবিন। কার ওয়াশে ঢুকে থামলো গাড়ির মিছিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো গায়ক আর তাদের গার্লফ্রেণ্ডেরা। ইনডোর ওয়েইটিং এরিয়ায় চলে গেল। কিছু হালকা খাবার আর সফট্ ড্রিংকসের অর্ডার দিলো। আরও কয়েকজন তরুণ ল্যাটিনো এসে যোগ দিলো ওদের সঙ্গে।

'কি করবো?' জানতে চাইলো কিশোর।

'পার্কিং লটে ঢোকো। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে পড়ে যাবো।'

ঢুকে পড়লো রবিন। গাড়ি থামিয়ে নামলো দু'জনে। বেশির ভাগই এখানে ওদের বয়েসী ছেলেমেয়ে। ভিড়ে মিশে যেতে অসুবিধে হলো না। স্কুলের কয়েকজন বন্ধুকেও পেয়ে গেল। আলাপ জুড়ে দিলো ওদের সঙ্গে। একই সাথে চোখ রাখলো টিবুরন আর পিরানহাদের ওপর।

'চলো, কিছু খাই,' একসময় বললো কিশোর। 'খিদে লেগে গেছে।'

রবিনও একমত হলো। জানালার ধারে একটা টেবিলে এসে বসলো দু'জনে। এখান থেকে ভালোভাবেই চোখে পড়ে কার ওয়াশটা। টেবিলের ধারে বেঞ্চ থাকার কথা, বসার জন্যে, নেই। তাই আক্ষরিক অর্থেই টেবিলে বসলো ওরা। খাবার চিবুতে চিবুতে তাকিয়ে রইলো ওয়াশের দিকে।

অনেক রাত। এসময়ে বন্ধ হয়ে যায় কার ওয়াশে গাড়ি ধোয়া মোছার কাজ। ফুড কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বুড়ো লোক। কার ওয়াশের বাকি কর্মচারীরা চলে গেছে। এখানে যেন টিবুরনই সর্বেসর্বা, একমাত্র ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পিরানহারা আর মেয়েগুলো। সে কথা বলছে, ওরা শুনছে।

একটা মেয়ে উসখুস করছে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে কাউন্টারে চলে গেল সে। কিছু কেনার জন্যেই বোধহয়। রেগে গেল টিবুরন। লম্বা একটা আঙুল মেয়েটার দিকে তুলে চিৎকার করে বললো, 'জলদি এসো এখানে! আমি যখন কথা বলবো তখন কোনো কেনাকাটা নয়। তোমাকেও বলছি,' বুড়োকে বললো সে, 'ওই সময় কিছু বিক্রি করবে না।'

শ্রাগ করলো লোকটা। মাথা নাড়লো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে টিবুরনকে কিছু বললো মেয়েটা। লাফ দিয়ে উঠে তার কাছে চলে গেল টিবুরন। চেপে ধরলো মেয়েটার হাত। পিরানহা নয়, এরকম একজন প্রতিবাদ জানালো। সরিয়ে দিলো টিবুরনের হাত।

সবাই যেন নিথর হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল কার ওয়াশের ভেতরটা।

লোকটার শার্টের কলার চেপে ধরলো টিবুরন। থাবা মেরে তার হাত সরিয়ে দিলো লোকটা। ঘুসি চালালো টিবুরন। টলে উঠলো লোকটা। তবে পাল্টা আঘাত ঠিকই হানলো। প্রথমে বাঁ হাতে, তারপর ডান হাতে। মাথা নিচু করে প্রথম আঘাতটা এড়ালো টিবুরন, হাত তুলে দ্বিতীয়টা ঠেকালো, তারপর প্রচণ্ড আরেক ঘুসি মারলো লোকটাকে। পড়ে গেল সে। আর উঠলো না।

কি যেন বললো টিবুরন। হেসে উঠলো। সবাই হাসলো তার দেখাদেখি। শুধু মেয়েটা বাদে। ঝুঁকে বসলো লোকটার ওপর, যে তার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। ইজিচেয়ারে ফিরে এসে আবার বক্তৃতা শুরু করে দিলো টিবুরন, যেন কিছুই হয়নি।

ট্যাকো বেলের টেবিলে বসে পুরো ব্যাপারটাই দেখতে পেলো কিশোর আর রবিন।

'গায়কের মতো আচরণ করছে না ব্যাটা,' রবিন মন্তব্য করলো। 'করছে ডাকাতের মতো।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো কিশোর। 'মনে হয় ডাকাতদলের একটা অংশ ওই গানের দল। আমার মনে হয়...' মাঝপথেই থেমে গেল সে।

আরেকটা গাড়ি ঢুকেছে কার ওয়াশে। একজন লোক বেরিয়ে এসে লাউঞ্জের দিকে ইশারা করলো।

'আনতিনো পেজ!' কিশোর বললো।

লাউঞ্জের ভেতরে উঠে দাঁড়ালো টিবুরন। পিরানহাদের কিছু বললো। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে, পেজের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললো দু'জনে। বাইরে দূরে অপেক্ষা করছে দলের অন্যেরা।

'পেজই মিথ্যে বলেছে!' বলে উঠলো রবিন। 'টিবুরনকে ভালো করেই চেনে।

বাজি রেখে বলতে পারি ওর কাছেই চোরাই গাড়িটা পৌঁছে দেয়ার কথা ছিলো। ভাইটাই সব মিথ্যে কথা, নিকিকে বানিয়ে বলেছে টিবুরন।'

'হতেও পারে, না-ও হতে পারে,' কিশোর বললো। 'টিবুরনকে চেনে না, একথাটা মিথ্যে বলেছে পেজ, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাকি সবই মিথ্যে। হতে পারে টিবুরনকে রক্ষা করেছে ও, চোরাই গাড়ির কথা কিছু জানে না। কিংবা টিবুরন একটা গল্প বানিয়ে গিয়ে বলেছে নিকির কাছে, তাকে যা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে বলার জন্যে, আসল ব্যাপারটা না জেনেই। গাড়ি চুরির কথা কিছুই জানে না হয়তো।'

'কি করে শিওর হবো?'

'আরও তথ্য জানতে হবে আমাদের। আপাতত চোখ রাখি।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, ঘুমানো দরকার। আজ রাতেই যদি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফিরে আসেন লজ, কাল অফিসে যেতে হবে আমাকে। কাজ করতে হবে।'

'কিন্তু তথ্য বের করাটাও জরুরী। আমাদের জানতে হবে, গাড়িটা চোরাই মাল একথা টিবুরন জানতো কিনা। যদি জেনে না থাকে, পুতুল হয়ে থাকে, তাহলে জানতে হবে কে তাকে নিকিকে ওকথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলো, গাড়িটা বডিগায় ডেলিভারি দিতে বলেছিলো।'

'কিশোর!' হঠাৎ বলে উঠলো রবিন।

কিশোরও দেখলো। লাউঞ্জে ফিরে গেছে টিবুরন। ট্যাকো বেলের দিকে এগিয়ে আসছে পেজ।

'আমাকে চিনে ফেলবে!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। তার কণ্ঠে অস্বস্তি। লুকানোর মতো জায়গা খুঁজলো তার চোখ। নেই।

খদ্দের অনেক কমে গেছে। কয়েকটা টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অল্প কয়েকজন। পার্কিং লটে কড়া আলো। লোকজন নেই। ভিড়ের মাঝে যে গিয়ে লুকাবে ওরা, সে-উপায়ও নেই। হ্যাসিয়েণ্ডার মতো করে তৈরি বিশাল বাড়িটার ভেতরে লম্বা কাউন্টারের কাছেও কোনো খদ্দের নেই।

'জলদি!' নড়ে উঠলো রবিন। 'বসে পড়ো!'

টেবিলের নিচে মেঝেতে বসে পড়লো কিশোর। আর কিছু করার নেই। পারলে শুয়েই পড়ে। ওভাবে নয়, রবিন বুঝিয়ে দিলো কি করতে হবে। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে ঘোড়া হলো কিশোর। ডেনিম জ্যাকেটটা খুলে তার ওপর ছড়িয়ে দিলো রবিন। বসে পড়লো পিঠে, যেন বেঞ্চে বসেছে। মুচকি হাসলো। ওরকম করা ছাড়া কিশোরেরও আর কোনো উপায় নেই। করলো বটে, কিন্তু রাগে জ্বলছে। রাগটা কার ওপর জানে না। তার পিঠে জাঁকিয়ে বসে স্যাণ্ডউইচ চিবাতে লাগলো রবিন।

পেজ ঢুকলে নীরিহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো সে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো, লোকটার যাতে নজর না পড়ে এদিকে। তাহলে টেবিলের একপাশে বেঞ্চ যে নেই সেটা দেখে ফেলবে। আরেকটু ভালো করে তাকালে বুঝে যাবে, রবিন যেটার ওপর বসেছে সেটা বেঞ্চ নয়। কিন্তু সেরকম কিছু করলো না পেজ। তার

দিকে একবার তাকিয়েই চলে গেল কাউন্টারের কাছে।

চাপা গলায় কিশোর বললো, 'আরেকটু চাপ কমাও না! মেরে ফেলবে তো! তোমাকে আমরা রোগা রোগা বলি, আসলে তো একটন ওজন! বাপরে বাপ!'

'চুপ করে থাকো। ও এখনও যায়নি। কাউনটারে। আবার এদিকে তাকাতে পারে। নড়ো না।'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর।

নীরবে আবার হাসলো রবিন। 'দারুণ বেঞ্চ হে, তুমি। বেশ নরম। একেবারে গদিওয়ালা চেয়ারের মতো লাগছে।'

পিত্তি জ্বলে গেল কিশোরের। 'দাঁড়াও, সুযোগ আমারও আসবে! এক মাঘে শীত যায় না!'

জবাবে তার পাঁজরে আস্তে একটা খোঁচা মারলো রবিন। আরও রাগিয়ে দিলো। কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিশোর, তাকে চুপ করতে বললো সে। 'আবার আসছে! একদম নড়বে না!'

এবার আর ফিরেও তাকালো না পেজ। সোজা বেরিয়ে চলে গেল তার গাড়ির কাছে।

উঠে দাঁড়ালো রবিন। 'হয়েছে। ওঠো।'

উঠলো কিশোর। হাত আর প্যান্টের হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়লো। দুই কোমরে হাত রেখে পেছনে বাঁকা করলো শরীরটা, সামনে ঝুঁকলো, তারপর এপাশে একবার, ওপাশে একবার কাত হয়ে সোজা হলো আবার। রবিন এতোক্ষণ পিঠে বসে থেকে যে সমস্যাটা সৃষ্টি করেছিলো, সেটা দূর করলো।

রবিন ভেবেছিলো তার দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠবে, কিন্তু সেরকম করলো না কিশোর। বরং হাসলো। বললো, 'দারুণ একটা বুদ্ধি করেছিলে। আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছিলো না। ঠিক ধরা পড়তাম আজ। চলো, বেরিয়ে যাই। পিরানহারাও কেউ এদিকে চলে আসার কথা ভাবতে পারে।'

বেরিয়ে এলো দু'জনে। কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত এগোলো ফোক্সওয়াগনের দিকে।

ইয়ার্ডের গেটে কিশোরকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে চাইলো রবিন। বাধা দিলো কিশোর।

অন্ধকার ইয়ার্ড। গেটে তালা। বাড়িটাও অন্ধকার।

গেট খুলে ঢোকার অসুবিধে নেই। রিমোট কন্ট্রোল সাথেই রয়েছে। 'সবাই তো ঘুম,' বিড়বিড় করে বললো কিশোর। 'নিকিকে কি আনলো? দেখা যাক।'

নিঃশব্দে বারান্দায় উঠলো দু'জনে। নিচতলার ঘরটায় দেখলো, যেটাতে নিকিকে থাকতে বলেছিলেন মেরিচাচী। দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। ওপরেও থাকতে পারে, দোতলায় উঠে গেস্ট রুমটায় উঁকি দিলো কিশোর। ওটাতেও নেই।

'পুলিশ ছাড়েনি,' রবিন বললো। 'তার বিরুদ্ধে আরও কিছু হয়তো জোগাড় করে ফেলেছে।'

'হয়তো। রাতে আর জানা যাবে না। সকালে চাচীকে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আমি এখনও ভাবতে পারছি না নিকি মিথ্যে বলেছে।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'যাই হোক, বাড়ি যাও। সকালে হেডকোয়ার্টারে এসো।'

'আমি নাহয় এলাম। মুসা?'

'বলবো আসতে। যদি কাজ শেষ হয়। মা আটকে দিলে আর কিছু করার নেই। এটাই ভীষণ বিরক্ত লাগে, বুঝলে। স্কুলের সময় তো লেখাপড়ার জ্বালায়ই মুখ তুলতে পারি না। ছুটি হলে করতে হয় কাজ। আমারও, মুসারও। যেন কাজ করার জন্যেই জন্মেছি। তুমি বেঁচে গেছো, পার্টটাইম চাকরি নিয়ে।'

ফিক করে হাসলো রবিন। 'সেগুলো কি আর কাজ নয়?'

'কাজ, তবে আনন্দ আছে। কিন্তু বাগান পরিষ্কার আর লোহার মরচে ঘষার মধ্যে কি মজাটা আছে, বলো? আর ঘর যখন পরিষ্কার করতে বলে চাচী…দূর, যাও, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

নেমে গেল রবিন। গেট খোলাই রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে ঠেলে পাল্লা লাগিয়ে দিলেই আপনাআপনি লেগে যাবে স্বয়ংক্রিয় তালা। লাগানোর জন্যে আর বেরোতে হবে না কিশোরকে।

শোবার ঘরে এসে ঢুকলো সে। কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো, গাড়ি চোরদের কথা। তার ধারণা, প্রায় প্রতিরাতেই গানের একটা দল যারা উপকূল ধরে যায় আসে, গানের দলের ছদ্মবেশে চোরের দলের সঙ্গে যোগ দেয়াটা তাদের জন্যে সহজ। সুবিধে।

সাত

পরদিন খুব সকালে মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাড়ি থেকে পালালো মুসা। চলে এলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে। বিছানায় থেকেই ফোনে কিশোরের কথা শুনেছে। গত রাতে নাকি সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে রবিন আর কিশোর। সব কথা শোনার জন্যে তর সইছে না তার।

নাস্তার টেবিলে রয়েছে তখন কিশোর। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাও বসে আছেন। কারো অনুরোধের অপেক্ষায় থাকলো না মুসা। বাড়ি থেকে খেয়ে আসেনি। চেয়ারে বসে পড়ে একটা খালি প্লেট টেনে নিয়ে তাতে রুটি আর ডিম ভাজা বোঝাই করতে শুরু করলো। মুচকি হাসলেন মেরিচাচী। লম্বা গোঁফের একমাথা ধরে মোচড় দিলেন রাশেদ চাচা, আপাতত এটাই তাঁর হাসি।

'নিকিকে বের করা যায়নি,' খবরটা জানালো কিশোর।

কথাটা শুনেই হাসি চলে গেল মেরিচাচীর। 'এখনও কিছু করতে পারেনি উকিল। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসিকিউটরের আশঙ্কা, ছাড়া পেলেই নিকি পালিয়ে যাবে।'

মেরিচাচীর দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'তোমার কি সত্যিই মনে হয়

ছেলেটা নির্দোষ?'

'আমার মনে হয়, চাচা,' জবাবটা দিলো কিশোর। 'বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করেছি, বুঝে গেছি নিকি সত্যি কথাই বলেছে।'

'সেটা কেবল এখন প্রমাণ করা বাকি, তাই না?' কিশোরের দিকে তাকালো মুসা।

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'সাবধান,' হুঁশিয়ার করলেন রাশেদ পাশা। 'গাড়ি চোরেরা সাধারণ ক্রিমিন্যাল নয়।'

'সাবধানেই থাকবো আমরা,' কথা দিলো কিশোর। 'যাই। চাচী, একটু বাইরে বেরোবো। নিকি ছাড়া পেলে আমাদের অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ রেখে দিও। ফোন করলে যেন জানতে পারি।'

'আচ্ছা। দেখি, আরেকবার উকিলকে ফোন করবো এখুনি।'

মুসাকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে এলো কিশোর। আগের রাতে যা যা ঘটেছে বললো।

কিশোরের বেঞ্চ হওয়ার কথা শুনে হেসে উঠলো মুসা। বললো, 'তাহলে টিবুরনের কথা জানে পেজ। চেনে।'

'চেনে। এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এই টিবুরনই মারসিডিজটা অক্সনার্ড থেকে নিকিকে চালিয়ে আনতে বলেছিলো।'

'কোত্থেকে শুরু করবো?'

'ধরে নেবো, গাড়ি চোরের দলের একজন সদস্য আনতিনো পেজ। তার ওপর চোখ রাখলেই টিবুরনের সাথে তার সম্পর্ক বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোথায় যায় তাও জানতে পারবো।'

'হুঁ। তা বডিগায় কখন যাচ্ছি?'

'রবিন ফিরলেই।'

'বেশ। বসে না থেকে করভেয়ারটা রেডি করিগে।'

'ও, ভালো কথা মনে করেছো। আমার গাড়ি দেবে কবে?'

'বলেছিই তো। করভেয়ারটা রেডি করেই খুঁজতে বেরোবো। বেশি দেরি হবে না। এখন তাহলে রবিনের জন্যে অপেক্ষা করছি...'

'আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছো তুমি!'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' হাত তুললো মুসা। 'বললাম তো, দেবো খুঁজে একটা গাড়ি। আর কোনো কথা আছে?'

'না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলো দু'জনে। মুসা কাজ করতে লাগলো, কিশোর বসে রইলো পাশে। রবিনের আসার অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এলো না রবিন।

আধ ঘন্টা পরও যখন এলো না, অস্থির হয়ে উঠলো কিশোর। 'ব্যাপারটা কি বল তো? এতো দেরি করছে কেন?'

'এতে আর নতুন কি দেখলে? আজকাল তো ওরকমই করে ও,' এঞ্জিন থেকে মুখ না তুলেই বললো মুসা।

'আসলে নতুন চাকরিটা খুব পছন্দ হয়েছে ওর,' কিশোর বললো। 'মিস্টার লজের ওখানে কাজ করতে ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ। আজকাল আর পড়তেও বোধহয় তেমন ভালো লাগে না ওর। কেবল গানবাজনা নিয়েই মেতে আছে। আসলে কে যে কখন কোনটাতে ইনটারেস্ট পাবে আগে থেকে বলা মুশকিল। হয়তো দেখা যাবে একদিন গানের দলের ব্যবসা করেই বড়লোক হয়ে গেছে বইয়ের পোকা রবিন।'

'হলে অবাক হবো না।'

বনেটের ভেতর থেকে মাথা বের করলো মুসা। কিছু একটা বলতে যাবে, এই সময় দেখা গেল রবিনের লাল ফোক্সওয়াগন। গেট দিয়ে ঢুকছে।

'ওই যে, এসে গেছে,' বলে উঠলো মুসা। 'মরবে না। বাঁচবে অনেকদিন।'

কিন্তু রবিন নয়, রবিনের আম্মা। মেরিচাচীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁর গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। সেটা মেকানিকের গ্যারেজে রেখে অফিসে চলে যাওয়ার কথা রবিনের। মায়ের কাছে কিশোরের জন্যে মেসেজ দিয়েছে রবিন–মিস্টার লজ ফিরে এসেছেন। জরুরী কাজ আছে অফিসে। কখন ফিরবে বলতে পারছে না।

কি আর করবে। তাকে বাদ দিয়েই বডিগায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো কিশোর আর মুসা। নিকির কোনো খবর আছে কিনা মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর। তিনি জানালেন, নেই। উকিল এখনও কিছু করতে পারেনি।

মুসার ফিয়ারোতে করে বেরিয়ে পড়লো দু'জনে। ব্যারিওতে এসে বডিগা থেকে একটু দূরে কোণের একটা পার্কিং লটে গাড়ি রাখলো মুসা। দু'জনেই নামলো।

মুদী দোকানের দিকে এগোতে এগোতে কিশোর বললো, 'বেশি খোলা জায়গা। লুকাবো কোথায়?'

তবে যতোটা মনে করছে ততোটা আশঙ্কার কিছু নেই। রকি বীচের ব্যারিও লস অ্যাঞ্জেলেস কিংবা নিউ ইয়র্কের ব্যারিওর মতো বড় নয়, যেখানে সবাইই ল্যাটিনো। এখানে যদিও বেশির ভাগই ল্যাটিনো, অন্য দেশের লোকও আছে। এই যেমন স্প্যানিশ আর মেকসিকান। কিশোর আর মুসা দু'জনের কারোই শাদা চামড়া নয়। এই ব্যারিওতে নিগ্রো আছে, মুসা সহজে চোখে পড়বে না। আর বেশ কিছু বাদামী চামড়াও আছে, কাজেই কিশোরেরও নজরে পড়ে যাওয়ার কথা নয়। যদি অবশ্য পেজ না দেখে ফেলে।

কিন্তু দু'জনেই এখানে নতুন। বেশিক্ষণ থাকলে ছেলেদের চোখে পড়ে যেতেই পারে। কারণ ওদেরকে চেনে না ওরা।

হাত তুলে দেখালো মুসা, 'ওই দরজার আড়ালে লুকাতে পারি আমরা। বডিগায় চোখ রাখা যাবে ওখান থেকেও।'

'ঠিক। বাড়িটাও খালিই মনে হচ্ছে। লোকজন দেখছি না।'

'ভেতরে থাকতে পারে। তবু, চলো।'

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। ছায়া আছে এখানে। সকালটা কেটে যাচ্ছে। গোয়েন্দাগিরিতে এটাই সম্ভবত কঠিন কাজ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। কোনো নতুনত্ব নেই, উত্তেজনা নেই। ভোঁতা, ধীর, একঘেয়ে, বিরক্তিকর এই সময় কাটানো। দাঁড়িয়ে থাকো, চোখ রাখো, অপেক্ষা করো। তবে গোয়েন্দার জন্যে এটাই সব চেয়ে জরুরী।

দুপুরের দিকে সতর্ক হয়ে উঠলো কিশোর, 'মুসা!'

একটা লো-রাইডারে করে এলো তিনজন পিরানহা। মাটির কাছাকাছি নেই আর এখন গাড়ির বডি, তুলে দেয়া হয়েছে, হাইওয়েতে চালানোর জন্যে। গাড়ি রেখে বডিগায় গিয়ে ঢুকলো ওরা।

'মালটাল কিনতে এলো বোধহয়,' আন্দাজ করলো মুসা।

কিন্তু আধ ঘন্টা পর যখন বেরোলো তিনজনে, কারো হাতেই মালের প্যাকেট দেখা গেল না।

'হুঁ,' মাথা দোলালো মুসা। 'ব্যাটারা কিছু করছে। পেজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে পিরানহাদের।'

'এক জায়গায় থাকলেও সম্পর্ক হয়,' কিশোর বললো। 'পড়শীর সঙ্গে।'

আরও দুই ঘন্টা পেরোলো।

তারপর এলো একটা কমলা রঙের ক্যাডিলাক। দাঁড়ালো বডিগার সামনে। নেমে তাড়াহুড়ো করে ভেতরে চলে গেল ড্রাইভার। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এলো আনতিনো পেজ। গাড়িটায় উঠলো।

'এসো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

ফিয়ারোর দিকে দৌড় দিলো দু'জনে। গাড়িতে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিলো মুসা। ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাডিলাকটা। পিছু নিলো সে।

বেশি গতি নয় গাড়িটার। ধীরেই চলছে। দুই ব্লক পেছনে রইলো মুসা। পারলে আরও পেছনে চলে যায়, যাতে পেজের চোখে না পড়ে। কিন্তু পথ এখানে এমন, বেশি পেছনে গেলে দেখতে পাবে না। মোড়টোড় খুব বেশি। ফিয়ারোটাকে দেখলে পেজের চিনে ফেলার সম্ভাবনা আছে। যেদিন তাকে পিটিয়েছিলো কিশোর, সেদিন দেখেছে।

ব্যারিওর কাছ থেকে সরে এসে বাঁয়ে মোড় নিলো ক্যাডিলাক। ফ্রিওয়ের পেছনে কতগুলো নোংরা রাস্তা রয়েছে, তারই একটাতে উঠলো। দুই ধারে নানারকম ইয়ার্ড। বাড়িঘর তৈরির জিনিসপত্র, লোহালক্কড়ের দোকান, মোটর গাড়ির পুরনো বডি, আর এরকমই আরও নানা জিনিস বিক্রি হয় ওসব জায়গায়। আরও কয়েক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ওখানে। পিছে লেগে রয়েছে মুসা। আরও পিছিয়ে এসেছে। রাস্তা এখানে মোটামুটি সোজা। গাড়িও কম। সহজেই চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ডানে মোড় নিলো ক্যাডিলাক। গতি বাড়ালো মুসা। মোড়ের কাছে পৌঁছে দেখলো, লাল ইঁটের তিনতলা একটা বিশাল বাড়ির সামনে থামছে গাড়িটা।

জায়গাটা ফ্রিওয়েরে কাছাকাছি। নোংরা এলাকা থেকে অনেকটা ভালো।

'থামো,' কিশোর বললো। 'হেঁটে যাবো।'

মোড় পেরিয়ে গাড়ি পার্ক করার একটা জায়গা খুঁজে বের করলো মুসা। ক্যাডিলাকের হর্ন কানে এলো। অদ্ভুতই বলা যায়। একটা লম্বা, দুটো খাটো, একটা লম্বা, একটা খাটো। বাড়ির বিরাট গেট হাঁ হয়ে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলো ক্যাডিলাক।

সাবধানে এগোলো দুই গোয়েন্দা। ব্লকের বিল্ডিঙের সারির শেষ বাড়ি ওটা। নিচতলায় জানালা নেই। পরের দুটো তলায় যেসব জানালা রয়েছে, সবগুলোর কাঁচে রঙ করা। যে দরজাটা দিয়ে গাড়ি ঢুকেছে, ওটা আসলে গ্যারেজে ঢোকার পথ, সদর দরজা নয়। দরজার ওপরে বড় একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছেঃ

ফ্রিওয়ে গ্যারেজ

বডি শপ, পেইনটিং, ফুল সার্ভিস

নিচে ছোট আরেকটা সাইনবোর্ডে লেখাঃ

পার্কিং বাই দা উইক, মান্থ, অর ইয়ার

বিল্ডিংটার পাশ ঘুরে পরের ব্লকের সাইড স্ট্রীটে চলে এলো দু'জনে। আরেক সারি ইঁটের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে এখানেও। প্রথম ব্লকের শেষ বাড়ি আর দ্বিতীয় ব্লকের প্রথম বাড়িটা খুব কাছাকাছি, প্রায় গায়ে গা ঠেকে রয়েছে। গ্যারেজের ওপরে যেসব ঘর রয়েছে, মনে হলো ওগুলোতে অফিস। জানালার কাঁচে রঙ করা। দরজা ছাড়া গ্যারেজে ঢোকার আর কোনো পথ নেই।

'একটা ব্যাপার ভালোই,' মুসা বললো। 'এখানে থাকলে আমাদেরকে দেখতে পাবে না পেজ।'

'আমরাও পাবো না। ভেতরে ঢুকতে হবে।'

দ্বিধা করলো মুসা। 'কি করে যাবো, কিশোর? ভেতরে কি আছে কিছুই জানি না। ঢুকে বিপদে পড়ে যেতে পারি।'

'ভেতরটা দেখার আর কোনো বুদ্ধি আছে? বাইরে থেকে?'

শ্রাগ করলো মুসা। 'না, তা নেই। তবে এভাবে ঢোকাটা ভালো মনে হচ্ছে না আমার।'

'আর কোনো উপায় নেই। সাবধান থাকতে হবে আর কি।' গ্যারেজের সামনের দিকে যাওয়ার জন্যে হাঁটতে আরম্ভ করলো কিশোর। 'আগে তুমি ঢুকে দেখবে। তারপর বুঝবো কি করা যায়।'

'বাহ্, চমৎকার!' নিমের তেতো ঝরলো মুসার কণ্ঠে।

গ্যারেজের মূল দরজার মাঝের ছোট দরজাটা দেখিয়ে কিশোর বললো, 'ওটা দিয়ে একসাথে দু'জন ঢুকতে পারবো না। পেজ তোমাকে দেখেনি। আমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। 'আমাকে একা ঢুকতে বলছো?'

'না। তুমি আগে ঢোকো, আমি ঠিক তোমার পেছনেই থাকছি। দরজার ভেতরে ঢুকে দাঁড়াবে। কি আছে না দেখে আর এগোবে না।'

'আচ্ছা।'

লম্বা দম নিয়ে পা বাড়ালো মুসা। এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিলো ছোট দরজাটায়। ভেতরে পা দিয়েই পাল্লার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। তার পেছনে ঢুকলো কিশোর। আরেক পাশের পাল্লায় একই ভাবে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।

ভেতরে ম্লান আলো। কিছুই নেই। শুধু নীরবতা।

আট

ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এলো আলোটা, আরও পরিষ্কার হলো সবকিছু। বিশাল একটা ঘর। বড় বড় থাম। অনেক ওপরের ছাত থেকে ঝুলছে কয়েকটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব। নিচে সারি সারি গাড়ি। ডানে একটা র‍্যাম্প। পেছনের দেয়ালের কাছে একটা বড় এলিভেটর রয়েছে, গাড়ি তোলার জন্যে। শ্যাফটটা—অর্থাৎ যেটার ভেতর দিয়ে এলিভেটর ওঠানামা করে, তার তিনপাশে মোটা শিকের বেড়া, সামনের দিকে কাঠের খোপ খোপ দরজা।

ডান পাশে দরজা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির কাছে। বাঁয়ে কাঁচের দরজা, তারমানে অফিস। অফিসের ভেতরে আলো নেই। পেজ কিংবা আর কোনো মানুষকেও চোখে পড়লো না। কোনো নড়াচড়া নেই।

'সব চোরাই গাড়ি?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করলো মুসা।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না। এটা পার্কিং গ্যারেজ। চোরাই গাড়ির নয়। দেখছো না, পিলার আর দেয়ালে নম্বর লাগানো রয়েছে।'

'তাহলে অ্যাটেনডেন্ট কোথায়? আর সার্ভিস শপ? বডির কাজ করার ওয়ার্কশপ?'

'ভালো প্রশ্ন।'

ম্লান আলোয় গাড়ির সারিকে কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে। যেন দানবীয় গুবরে পোকা সব দিনের বেলা ঘুমোচ্ছে, রাতে জেগে উঠে বেরিয়ে পড়বে শিকারে। কান পেতে রইলো দু'জনে। কিছুক্ষণ পর মৃদু শব্দ শুনতে পেলো, ওপরে কোনোখান থেকে আসছে।

'খুবই সামান্য,' মুসা বললো। 'গাড়ির কাজ করলে আরও বেশি হওয়ার কথা।'

'বাড়িটা পুরনো, মনে রেখো। আর বিরাট। দেয়াল এতো পুরু, শব্দ হজম করে ফেলে। দোতলায় কেউ আছে।'

'উঠবো কি করে? ওই গাড়ির এলিভেটরে চড়ে?'

'সিঁড়িটিড়ি নিশ্চয় আছে। র‍্যাম্পের নিচের দরজাটার কাছে গিয়ে দেখা যাক।'

দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। একটানে খুলে ফেললো মুসা। ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। ভেতরে সিঁড়ি দেখা গেল। নোংরা হয়ে আছে ধুলোতে। ম্লান আলো জ্বলছে এখানেও। এখান থেকে ওপরের শব্দ আরেকটু ভালোমতো শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা পদশব্দ কিংবা কথা বলার আওয়াজ নয়। ইস্পাতের

তৈরি সিঁড়ি বেয়ে খুব সাবধানে উঠতে শুরু করলো ওরা। ওপরে উঠে গলা বাড়িয়ে তাকালো।

আরেকটা বড় হলঘর, অনেকটা গুহার মতো লাগছে দেখতে। বড় বড় থাম রয়েছে এখানেও। তবে আলো নিচতলার চেয়ে বেশি। অনেক গাড়ি দেখা যাচ্ছে। কোনোটাই আস্ত নেই। বিভিন্ন অংশ খোলা। মেরামতের জন্যে আনা হয়েছে। কোনো কোনোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন বহুদিনের পুরনো কঙ্কালের মতো। গাড়ি মেরামতের নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দেখা গেল—বেশির ভাগই ইলেকট্রনিক, তিনটে গাড়িতে লাগানো রয়েছে সেসব। যেন অপারেশন থিয়েটারে শোয়ানো রোগী। কিন্তু ডাক্তার নেই গাড়ির অপারেশন করার।

'মেকানিকেরা কোথাও গেছে,' মুসা বললো। 'খুব তাড়াহুড়ো করে। দেখ না, চালু করেই রেখে গেছে যন্ত্রপাতিগুলো।'

'নিচে নামেনি, এটা ঠিক। সিঁড়ি বেয়ে নামলে দেখতে পেতাম।'

'তাহলে কোথায় গেল? পেজ আর কমলা ক্যাডিলাকটাই বা কোথায়?'

'হতে পারে তিন তলায়।'

তিনতলায় ওঠার সিঁড়িও ওটাই। উঠতে শুরু করলো দু'জনে।

আরেকটা বড় হলঘর দেখা গেল। আলো এটাতে আরও বেশি। থামের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য গাড়ি। দোতলার চেয়ে বেশি। নিচতলার চেয়ে কম। এখানে বডি আর রঙের কাজ করা হয়।

কিন্তু এখানেও কাউকে দেখা গেল না।

স্যাণ্ডার, বাফার, এরকম সব যন্ত্রপাতির প্লাগ ঢোকানো রয়েছে ইলেকট্রিক সকেটে। রঙ করার জায়গাটা বোঝাই হয়ে আছে গাড়ির বডিতে, কমপ্রেশার চালু রয়েছে। গুঞ্জন করছে একজস্ট ব্লোয়ার। কিন্তু শ্রমিক নেই। পেজ কিংবা তার ক্যাডিলাকের চিহ্নও নেই। এখানেও।

'আশ্চর্য!' কিশোর বললো।

'ভূতের বাড়ি নাকি!' চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকালো মুসা, যেন ভূত দেখতে পাবে আশঙ্কাতেই। 'বাবার কথাটাই মনে হয় ঠিক। একটা কথা প্রায়ই বলে, কাস্টোমার তাকিয়ে না থাকলে নাকি মোটর গাড়ির গ্যারেজে কেউ কাজ করে না।'

'কি জানি। তবে এখানে যে কাজ করছিলো একটু আগেও, তার প্রমাণ রয়েছে। চলে গেছে কোনো কারণে। পেজও গেছে। কোথায় গেছে বোঝা দরকার।'

'কোথায়?'

'এখানে যখন নেই, অন্য কোথাও।'

'যদি ফিরে আসে?'

'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। এই বাড়িতেই কোথাও রয়েছে পেজ আর তার ক্যাডিলাক।'

আগে আগে চললো কিশোর। গাড়িগুলোর কাছাকাছি থাকছে, যাতে কেউ

বেরোলেও সহজে চোখে না পড়ে যায় ওরা। কেউ এলো না। পুরো ঘরটা ঘুরে দেখে আবার সিঁড়ির কাছে ফিরে এলো দু'জনে। আর কোনো দরজা কিংবা সিঁড়ি চোখে পড়লো না। এলিভেটরটা রয়েছে এই তলাতে, তবে ওরা ঢোকার পর ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয় না। র‍্যাম্পটাও ব্যবহার হয়নি।

'গেল কিভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না! চলো, নিচে গিয়ে আবার দেখি ভালোমতো।'

নিঃশব্দে দোতলায় নেমে এলো আবার ওরা। একজন মেকানিককে দেখা গেল এবার।

'এলো কোত্থেকে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'জানি না। ক্যাডিলাকটা যে কোথায় গেল! এখানে কিন্তু দেখা হলো না।'

'এখন দেখতে চাও! লোক রয়েছে যে।'

'থাক। শিওর হওয়ার আর কোন উপায় নেই।'

সিঁড়ির কাছ থেকে পা টিপে টিপে সরে এলো দু'জনে। গাড়ি আর থামের আড়ালে থেকে নিঃশব্দে এগোলো। যে কোনো মুহূর্তে দেখে ফেলতে পারে ওদেরকে মেকানিক। একটাই ভরসা, গভীর মনোযোগে কাজ করছে সে। আর যন্ত্রপাতির এমন আওয়াজ হচ্ছে, ওরা সামান্য শব্দ করে ফেললেও তার কানে যাবে না। একটিবারের জন্যেও মুখ তুলছে না লোকটা।

কমলা ক্যাডিলাকটাকে দেখা গেল না এই তলাতেও।

'আছে হয়তো নিচতলাতেই,' মুসা বললো। 'তখন খুঁজলেই দেখতে পেতাম।'

মেকানিক দেখতে পেলো না, নিরাপদেই আবার সিঁড়িতে চলে এলো ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে দাঁড়ালো। সাবধানতা। বলা যায় না, নিচতলাতে লোক চলে আসতে পারে। আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুললো মুসা। উঁকি দিলো ওপাশে। না, কেউ নেই। অফিসের ভেতরেও আলো জ্বলেনি।

এবং কমলা ক্যাডিলাকটাও নেই।

পুরো ঘরটায় খুঁজলো ওরা। গাড়ির প্রতিটি সারির ভেতর দিয়ে এগিয়ে দেখলো।

'কিশোর,' অবশেষে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'মেনে নাও আমার কথা! এটা ভূতের কাণ্ড!'

'না!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'মনে হয় বুঝতে পারছি...'

হঠাৎ হিসহিস শব্দ হলো, সেই সাথে খটাংখট। পাঁই করে ঘুরলো দু'জনে। কিসের শব্দ দেখার জন্যে। দেখলো। নেমে আসছে এলিভেটরটা।

'এই, এখানে কি?'

এলিভেটরে একটা কালো বুইক সিডানের ভেতর থেকে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠলো কালোচুলওয়ালা একজন লোক। তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। পাশের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে মুখ বের করে আছে আরেকজন, আনতিনো পেজ।

'সেই ছেলেটা, হ্যাম! বডিগায় গিয়েছিলো!' চিৎকার করে বললো পেজ।

'এই ছেলে, থামো, থামো!'

লাফিয়ে আলোর নিচ থেকে সরে গেল কিশোর। লুকিয়ে পড়লো একটা স্টেশন ওয়াগনের আড়ালে। মুসাও রয়েছে তার পাশে। এলিভেটর নামতেই দরজা খুলে গেল খাঁচার। গর্জন করে গাড়ির সারির মাঝের গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে এলো বুইকটা। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বেরিয়ে এলো পেজ। ড্রাইভারও নামলো। বেঁটে, পেশীবহুল শরীর, যেন একটা ভালুক।

'সারাক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলো পেজ!' মুসা বললো।

'এসব নিয়ে পরে আলাপ করবো,' নিচু গলায় বললো কিশোর, 'এখন বেরোনো দরকার।'

'সামলানো খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না,' মুসা বললো। 'পেজকে তো কাবু করতে পারবে তুমি, জুডো দিয়ে। আমি হ্যামের ওপর কারাতে চালাবো।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গাড়ির সারির দিকে তাকাচ্ছে দু'জনে। 'পালাতে পারবে না, খোকারা!' চেঁচিয়ে বললো ভালুকটা।

'এতো হেলাফেলা করো না, হ্যাম,' হুঁশিয়ার করলো পেজ। 'কোঁকড়াচুলো ছেলেটা জুডো জানে।'

কোমরের বেল্ট থেকে একটা কুৎসিত দর্শন পিস্তল টেনে বের করলো হ্যাম। 'এটার সঙ্গে জুডো চলবে না।'

ঢোক গিললো মুসা। 'এবার আর কিছু করতে পারবো না।'

'ওরা এখনও জানে না আমরা কোথায় আছি,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'চালাকি করতে হবে। আমি কায়দা করে পিস্তলওলাটাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো। পেছন থেকে হামলা চালাবে। গুলি চালানোর আগেই কাবু করার চেষ্টা করবে। তারপর বাকিটাকে চিত করে দিতে সময় লাগবে না।'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। শান্ত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলো আলোর নিচে।

ওকে দেখে ফেললো লোকগুলো। চিৎকার করে পেজ বললো, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। বুদ্ধি আছে। ভালো চাইলে চুপ করে থাকো।'

কিন্তু থাকলো না কিশোর। সরে যেতে লাগলো র‍্যাম্পটার দিকে, যেন পালানোর পথ খুঁজছে। ফাঁদটা বুঝতে পারলো না লোকগুলো। পা দিয়ে বসলো।

'আনতিনো, তুমি ওদিক দিয়ে যাও,' ভালুকটা বললো। 'আমি এদিক আগলাচ্ছি,' বলে বাঁ দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

ডানে দৌড়াতে শুরু করলো পেজ। কিশোরের সামনে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। ঘুরে অফিসগুলোর দিকে চললো কিশোর। তাকে ধরতে হলে এখন ঘুরে আসতে হবে পেজকে। আর হ্যামকে আসতে হবে সোজা, একটু আগে কিশোর যেখানে লুকিয়েছিলো, ওটার পাশ দিয়ে।

আরেকটু এগিয়ে এমন ভঙ্গি করলো কিশোর, যেন আটকা পড়ে গেছে। একবার এদিকে সরতে চাইছে, আরেকবার ওদিকে। ভান করছে আসলে সরার।

এগিয়ে আসছে দু'জনে।

মুসার কাছাকাছি চলে এলো হ্যাম। আর কয়েক পা বাড়ালেই পেরিয়ে

আসবে। পিস্তল উঁচিয়ে কিশোরকে বললো, 'অনেক হয়েছে। থামো এবার। যদি গুলি খেতে না চাও।'

আরেক পা বাড়ালো সে।

আরও এক পা।

চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে বেরিয়ে এলো মুসা। ঝট্ করে বেরিয়ে এলো ডান পা-টা, উঁচু হয়ে গেল ওপরের দিকে, একেবারে সোজা। কারাতের এই লাথিটাকে বলে ইয়োকো–গেরিকেকোমি। হ্যামের পিস্তল ধরা হাতে লাগলো পা। উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। হাত চালালো মুসা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে শাটো-উচি হানলো লোকটার ঘাড়ে। টুঁ শব্দ করতে পারলো না ভালুক। ময়দার বস্তার মতো ধপ করে পড়লো মেঝেতে।

মুসাকে ঠেকানোর জন্যে দৌড় দিলো পেজ। কয়েক পা এগিয়েই দেখলো তার দিকে ছুটে আসছে কিশোর। দ্বিধায় পড়ে গেল সে। কাকে সামলাবে? একজন তো ইতিমধ্যেই তাকে এক আছাড় মেরে দেখিয়েছে, কি করতে পারে। আরেকজন চোখের পলকে হ্যামের মতো একটা জোয়ানকে কাবু করে ফেললো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই মুসা। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো। কিশোরের আগেই পৌছে গেল পেজের কাছে। এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে শাঁ করে ঘুরলো একপাক। সেই অবস্থাতেই সোজা করে তুলে রেখেছে আরেক পা। ম্যাওয়াশি-গেরি। সহ্য করতে পারলো না পেজ। ভালুকের অবস্থা হলো তারও।

'চলো!' কিশোরকে বললো মুসা। 'আরও লোক চলে আসতে পারে!'

দরজার দিকে দৌড় দিলো দু'জনে।

নয়

গাড়িতে এসে উঠলো দু'জনে। মুসা যখন গাড়িটা রাস্তায় তুললো, ফিরে তাকালো কিশোর। গ্যারেজের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে পেজ আর হ্যাম। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ফিয়ারোটার দিকে। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঘুরে গিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

'তোমার কারাত খুব একটা কাজের নয়,' কিশোর বললো। 'বেশি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। আমাদের পিছু নেবে এখন।'

'মেরেছিই আস্তে,' বললো মুসা। 'যা-ই হোক, কি বুঝলে?'

'বুঝলাম? কমলা ক্যাডিলাকটা চোরাই গাড়ি। পেজের কাছে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। সে ওটা নিয়ে গেছে গ্যারেজে।'

'তাহলে এখন ওটা কোথায়?'

'গ্যারেজেই কোথাও রয়েছে।'

'পাগল! সব খানেই তো দেখলাম। কোনো তলায় বাদ দিইনি। ভেতরে বড় আর কোন দরজাও নেই, যেটা দিয়ে বের করা যাবে ওটাকে।'

'পেজও তো ছিলো। বেরোনোর আগে কি আমরা ওকে দেখেছি?'

'সে অফিসে লুকিয়ে থাকতে পারে। মানুষের জন্যে লুকানো সহজ। একটা গাড়ির জন্যে নয়।'

'হয়তো। কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি, ক্যাডিলাকটা চুরি করেই আনা হয়েছে। এখনও গ্যারেজেই কোথাও রয়েছে। শুধু বুঝতে পারছি না, কোথায়?'

বার বার পেছনে তাকাচ্ছে কিশোর, কিন্তু বুইকটা দেখলো না। তবে কি পিছু নেয়নি পেজ?

কথা বলতে বলতেই ইয়ার্ডে পৌছে গেল ওরা। অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'এই, কিশোর, নিকিকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জজ। চল, কোর্টে যাবো।'

সামনে থেকে নেমে গিয়ে পেছনের সীটে বসলো কিশোর। মেরিচাচীকে জায়গা করে দিলো। ওরা আদালতে পৌছতে পৌছতে চারটে বেজে গেল। লবিতে লম্বা একজন লোকের সঙ্গে কিশোর আর মুসার পরিচয় করিয়ে দিলেন মেরিচাচী।

'আমার উকিল, মিস্টার জোনস বেসিন,' বললেন তিনি। 'মিস্টার বেসিন, ও আমার ছেলে, কিশোর পাশা। আর এ-হলো ওর বন্ধু, মুসা আমান। নিকিকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছে ওরা।'

কিশোর আর মুসার সঙ্গে হাত মেলালেন বেসিন। 'কাজটা খুব কঠিন হবে। পুলিশের বিশ্বাস, নিকি চোরের দলের একজন। সান্তা মনিকা আর ভেনচুরার মাঝে কাজ করছে। সে-জন্যেই জজ সাহেবকে বাধ্য করেছে, যাতে জামিনের টাকার অঙ্ক অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়।' মেরিচাচীর দিকে তাকালেন তিনি। 'কাগজপত্র এনেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মেরিচাচী। 'কতো টাকা, মিস্টার বেসিন?'

'পঁচাত্তর হাজার ডলার। অস্বাভাবিক, তাই না? আমি অনেক তর্কাতর্কি করেছি, লাভ হয়নি। পুলিশের ধারণা, অসম্ভব ধূর্ত একটা চপ শপ রিং অপারেশন চালাচ্ছে। নিকি হলো তাদের প্রথম অ্যারেস্ট।'

'চপ শপ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'চপ শপ!' মেরিচাচী বুঝতে পারলেন না। 'ওটা আবার কি জিনিস?'

'গাড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়ে আস্ত বিক্রি করে না, পার্টস খুলে খুলে বিক্রি করে দেয়,' বুঝিয়ে বললো কিশোর। 'যেগুলোতে সিরিয়াল নাম্বার থাকে না।'

'খুলে সেগুলো পরিষ্কার করে, কাগজে মুড়ে বাক্সে ভরে নেয়,' যোগ করলো মুসা। 'দেখতে একেবারে নতুনের মতোই লাগে। সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে পরিচিত পার্টস বিক্রেতাদের কাছে। যাদের দোকান আছে।'

'ওরা জানে না জিনিসগুলো চোরাই?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'জানে,' বেসিন বললেন। 'তাতে কি। ওরা জানে পার্টসগুলো নতুন, নষ্ট হয়নি, তাছাড়া কম দামে পাচ্ছে। নিয়ে নেয়।'

'আর যেগুলোর সিরিয়াল নাম্বার আছে,' মুসা বললো। 'এই যেমন এঞ্জিন ব্লকস, সেসব পার্টস দেশের বাইরে বের করে নিয়ে যায় চোরেরা। ওখানে আর

কেউ প্রশ্ন করতে আসে না। বিক্রি করাটা সহজ।'

'আর এই ব্যবসায় টাকাও কামানো যায় বেশি,' কিশোর বললো। 'আস্ত গাড়ি বেচলে যা পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন মেরিচাচী। 'এই চুরি বন্ধ করাও তো মুশকিল। খুলে টুকরো টুকরো করে ফেললে গাড়িই চেনা যাবে না।'

'না, যাবে না,' বেসিন বললেন। 'সে-জন্যেই নিকিকে ছাড়তে চাইছে না পুলিশ। তাদের কাছে সে একটা মূল্যবান সূত্র। এসব চুরি ঠেকানোর একটাই উপায়, মাল সহ চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলা।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'সময় হয়েছে, মিস পাশা। চলুন। চেক বই আর দলিল এনেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'আপনি জানেন, নিকি পালালে আপনার টাকা মার যাবে?'

'জানি।'

'তাহলে চলুন। কিশোর, মুসা, তোমরা থাকো এখানে।'

বেসিন আর মেরিচাচী চলে গেলে মুসার দিকে ফিরলো কিশোর। হাসলো। 'চপ শপ রিং। চোরাই গাড়ি। গানের দলের ছদ্মবেশে এল টিবুরন আর পিরানহারাই করছে কাজগুলো।'

'কিন্তু কোন প্রমাণ নেই কিশোর। শুধুই অনুমান।'

'চোরাই একটা গাড়ি আমরা চিনি। নিকিকে দিয়েছে চালানোর জন্যে, একজন লোক। পেজের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে টিবুরনের। একটা ক্যাডিলাক গায়েব হয়ে গেছে।'

'তাতে কি হলো?'

জবাবটা না দিয়ে একই কণ্ঠে বললো কিশোর, 'আর এখন আমরা নিকিকে পাচ্ছি।'

নিকিকে নিয়ে আসতে দেখা গেল মেরিচাচী আর বেসিনকে। ক্লান্ত লাগছে তাকে। ফ্যাকাসে চেহারা। তবে মুখে হাসি ফুটেছে।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ভালো। তোমার করভেয়ারটা কেমন?'

'কাজ করার সময় পাইনি আর। তবে ভালোই আছে মনে হয়।'

'আসলে, চোরাই গাড়ির তদন্তেই ব্যস্ত আমরা। আর কিছু করার সময় পাচ্ছি না। 'গাড়ি চোরদের খুঁজছি।'

'তারমানে এই অঞ্চলে চুরি করে বেড়াচ্ছে একদল চোর।'

মাথা ঝাঁকালেন বেসিন। 'পুলিশের তাই ধারণা।'

'ও, এই কারণেই,' নিকি বললো। 'এতোক্ষণে বুঝলাম। কেন জামিন দিতে চাইছিলো না ওরা। তো, কদ্দিনের মধ্যে জানা যাবে আমার কপালে কি আছে?'

'আগামী হপ্তার মধ্যেই যা হওয়ার হয়ে যাবে। হয় তোমার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে, নয়তো তুলে নেয়া হবে। এর বেশি সময় পাবে না। পালানোর চেষ্টা করো না। আরও বেশি বিপদে পড়বে। অনেক কিছুই বিপক্ষে চলে যাবে তোমার।

বুঝেছো?'
ঘাড় দোলালো নিকি।
'তিন দিন পর দেখা করবো।'
চলে গেলেন বেসিন। নিকিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো অন্য তিনজন। মুসার ফিয়ারোতে উঠলো। সামনের সীটে বসলেন মেরিচাচী, পেছনের ছোট সীটে কিশোর আর নিকিকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো।
'এটা দিয়ে হবে না,' কিশোর বললো। 'গোয়েন্দাগিরি করতে হলে আরেকটু বড় গাড়ি দরকার। মুসাকে তো এজন্যেই বলছি, আরেকটা গাড়ি খুঁজে দাও। ও কানই দেয় না।'
'কে বললো দিই না...'
হেসে বললো নিকি, 'ঠিক আছে, আমি খুঁজে দেবো। এখন বল কি কি জানতে পারলে তোমরা। শুনলে তো, আগামী হপ্তার আগেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি নির্দোষ।'
যা যা জেনেছে বলতে লাগলো কিশোর। মন দিয়ে শুনছে নিকি। কিন্তু তার চোখ আটকে রয়েছে রিয়ারভিউ মিররে।
'সুতরাং, আমাদের বিশ্বাস,' কিশোর বলছে, 'এল টিবুরন আর পিরানহারাই গানের দলের ছদ্মবেশে গাড়ি চুরি করে বেড়াচ্ছে। পকেট থেকে একটা ছবি বের করলো সে। এই যে, টিবুরনের ছবি, শ্যাক থেকে চুরি করে এনেছি। এই লোকই কি আপনাকে মারসিডিজটা আনতে বলেছিলো?'
ছবিটা দেখলো নিকি। 'মনে হয়। তবে শিওর হতে পারছি না। সেরাতে অনেক মদ খেয়েছিলাম। তাছাড়া আলো খুব কম ছিলো, যেখানে বসে কথা বলছিলাম। প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া ছিলো। তবে ছবিটা ওই লোকের বলেই মনে হচ্ছে।'
'সে তাহলে তখন গানের দলে ছিলো না? গানটান গাইছিলো না?'
'না।'
'কোন ক্লাবে খেতে গেছিলেন?'
'বুকি কি যেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ব্লু লাইট।'
'দা ডিউসেস নয়?'
'না। ওরকম বোকামি করবে না টিবুরন। যেখানে সে গান গাইবে সেখানে বসেই কাউকে ভাড়া করবে, এটা হয় না,' গাড়ি চালাতে চালাতে বললো মুসা।
'লোকটাকে সামনাসামনি দেখলে, কথা শুনলে শিওর হতে পারবো,' নিকি বললো। 'টিবুরনই আমাকে ভাড়া করেছিলো কিনা,' ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।
'ব্যবস্থা করতে হবে,' কিশোর বললো। 'আজ রাতে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসবো আমরা। কিভাবে কি করা যায় ঠিক করবো।'
মুসার মাথার ওপর দিয়ে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকালো আবার নিকি। বললো, 'পিছু নিয়েছে। আদালত থেকে বেরোনোর পর থেকেই দেখছি। পুলিশ

'হতে পারে। চোখে চোখে রাখছে। চোরদের কেউও হতে পারে।'

পেছনে তিনটে গাড়ি দেখতে পেলো কিশোর। লাল একটা নিশান। একটা পোরশে। আর ওদুটোর মাঝে একটা কালো আমেরিকান সেডান।

'কালোটা কি বুইক?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'মনে হয় না,' জবাব দিলো নিকি। 'কোনো ধরনের জি এম হতে পারে।'

গ্যারেজে দেখে আসা কালো বুইকটার কথা বললো কিশোর। আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো নিকি। 'হতে পারে ওটাই। তবে পুলিশের চরও হতে পারে।'

'কি করবো?' জানতে চাইলো মুসা।

'নজর রাখবো,' নিকি বললো। 'আর কিছু করার দরকার নেই। খসানোর চেষ্টা করো না।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছলো ওরা। নিকিকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন মেরিচাচী। গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে চলে গেল মুসা। পাল্লার আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো গাড়িটা কি করে। সামনে দিয়ে চলে গেল কালো গাড়ি। বুইক নয়।

পাশে এসে দাঁড়ালো কিশোর। তাকে বললো সে, 'একটা ওল্ডসমোবাইল। মোড় পেরিয়েছে।'

'চলো, দেখি।'

ইয়ার্ডের উঠন ধরে দৌড় দিলো দু'জনে। চলে এলো আরেক ধারে। ফেলে রাখা কয়েকটা বাক্সের ওপর চড়লো। উঁচু বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি দিলো অন্য পাশে। ঠিক ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো গাড়িটা।

ওরা তাকাতেই চলতে আরম্ভ করলো।

'দেখে ফেললো নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'বোধ হয়।'

বাক্স থেকে নেমে এলো ওরা। ঘরে এসে নিকিকে জানালো ব্যাপারটা।

'পুলিশই মনে হচ্ছে,' নিকি বললো। 'দেখি কাল সকাল পর্যন্ত, কি হয়। তারপর যা করার করবো।'

খেয়েদেয়ে দোতলার গেস্ট রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো নিকি, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। মুসা গিয়ে করভেয়ারটায় হাত লাগালো। আর কিশোর গিয়ে বসলো ওয়ার্কশপে, কয়েকটা মিনি ওয়াকি-টকির কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে, সেটা সারার জন্যে।

সন্ধ্যার আগে আরও দু'বার কালো গাড়িটাকে দেখলো দু'জনে। একবার ধীরে ধীরে গেটের সামনে দিয়ে চলে যেতে, আরেকবার গেটের পাশে লুকিয়ে থাকতে।

দশ

পরদিন সকালে। জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিকি। কালো গাড়িটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তাকে। 'আছে কোথাও,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো সে। 'মন বলছে।'

'কে?' মুসার প্রশ্ন। 'পুলিশ, না চোরেরা?'

'যে কেউ হতে পারে,' জবাবটা দিলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' একমত হলো নিকি। 'কথা হলো, কারা পিছু নিয়েছে? পুলিশ, না চোর?'

'টিবুরন আর তার লোকদের জানার কথা নয়, আপনি বেরিয়ে এসেছেন। তাছাড়া ওরা এখন আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে চাইবে, পুলিশের নজরে পড়ার ভয়ে।'

'এক কাজ করা যায়,' প্রস্তাব দিলো মুসা। 'ভাগাভাগি হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি আমরা। দেখা যাক, কার পিছু নেয় ওরা।'

'ঠিক,' তুড়ি বাজালো কিশোর। 'আমারও কিছু কাজ আছে। আর ফ্রিওয়ে গ্যারেজে কাউকে নজর রাখতে হবে, ওখানে টিবুরন আর পিরানহারা যায় কিনা দেখার জন্যে। আজকেও বোধহয় রবিনকে পাওয়া যাবে না। তাহলে মুসাকেই যেতে হবে ওখানে। আমি আর নিকিভাই গ্যারেজের একটা পিকআপ নিয়ে বেরোতে পারবো।'

'তার মানে,' নিকি হাসলো। 'গাড়ি একটা তোমাকে কিনে দিতেই হচ্ছে।'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে গেল কিশোর। 'খুবই ভালো হয় তাহলে। মুসাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। দেয় না। যাই হোক,' আগের কথার খেই ধরলো সে। 'মুসা, গ্যারেজের বেশি কাছাকাছি যাবে না, বিশেষ দরকার না হলে।'

রাশেদ চাচাকে একটা জঞ্জালের স্তূপের আড়াল থেকে খুঁজে বের করলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, একটা পিকআপ নেয়া যাবে কিনা। ইয়ার্ডের কোনো কাজ থাকলে আর নিতে পারবে না। নিতে বললেন চাচা। মুসা গিয়ে চড়লো তার ঝরঝরে ফিয়ারোতে। নিকি এবং কিশোর প্রায় ফিয়ারোর মতোই পুরনো একটা ছোট ট্রাকে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো দুটো গাড়ি। ফিয়ারোটা আগে। ট্রাকটা পেছনে। ওটা নিকি চালাচ্ছে। তবে বেরিয়েই দু'দিকে মোড় নিয়ে চলতে লাগলো দুটো গাড়ি। একটা আরেকটার উল্টোদিকে। কালো গাড়িটা নজর রেখে থাকলে এখনই তার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়, কোনটাকে অনুসরণ করবে।

প্রথম মোড়টায় পৌঁছে গেল নিকি। গতি না কমিয়েই তীব্র বেগে মোড় ঘুরলো। একটা ইউ টার্ন নিয়ে আবার ফিরে চললো যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

ওদের সামনেই চলেছে কালো ওল্ডসমোবাইলটা। এমন একটা ভঙ্গি, যেন কাউকে অনুসরণ করছে না। কিন্তু নিকিকে বোকা বানাতে পারেনি। সে ঠিকই বুঝে ফেলেছে, ট্রাকের পিছুই নিয়েছিলো ওটা। কিশোরও বুঝেছে।

'তারমানে আমার ওপরই চোখ রেখেছে,' নিকি বললো। 'পুলিশ। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছেই কোথাও লুকিয়েছিলো। আমরা বেরোতেই পিছু লেগেছে। কিশোর, শক্ত হয়ে বসো। একটা গাড়ি খুঁজে দিতে যাচ্ছি তোমাকে। ওদেরকে বোঝানো দরকার, গাড়ি চোরেরা কেন পুরনো গাড়ি খোঁজে!'

প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালালো নিকি। আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লো বেচারা পিকআপ, কিন্তু নিকির করুণা হলো না। সে চালিয়েই গেল। রাস্তার ধারে প্রথম যে গাড়ির দোকানটা দেখতে পেলো, তার সামনেই থামলো। তারপর এক দোকান থেকে আরেক দোকানে। চললো এভাবে। কিশোরের কাছে যা টাকা আছে, তা দিয়ে একটা ভালো গাড়ি খুঁজে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কোথাও পায় না। শেষে বন্দরের কাছে এসে একটা ছোট দোকানে পাওয়া গেল একটা গাড়ি। দশ বছরের পুরনো একটা হোণ্ডা সিভিক।

দুই দরজার ছোট গাড়ি। মালিকের টাকা খুব দরকার না হলে পাঁচশো ডলারের বেশিই বিক্রি করতে পারতো। দিয়ে দিলো গাড়িটা। অনেক বকবক করলো, অনেক বিজ্ঞাপন করলো তার গাড়ির। জানালো, এঞ্জিনটা প্রায় নতুন। পঁচিশ হাজার মাইলেরও কম চলেছে। এঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখলো নিকি। কিশোরকে পাশে বসিয়ে দেখতে বেরোলো। একটান দিয়েই মাথা ঝাঁকালো। বললো, আর চালানোর দরকার নেই। আসলেই ভালো। মিথ্যে বলেনি দোকানদার।

গাড়িটা কিনে ফেললো কিশোর। ছোটোখাটো কিছু মেরামত রয়েছে, সেগুলো দেখিয়ে দিলো নিকি। দোকানদারকে বললো ঠিক করে দিতে। পরদিন এসে ডেলিভারি নেবে গাড়ি। এতোই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কিশোর, পারলে তখনই নিয়ে যায়। একটা জানালা ভাঙা আর কেবিনের একটা আলো নষ্ট হলে কি হয়? কিন্তু নিকি নিতে দিলো না তাকে। বললো, ওগুলো বদলে দেয়ার পরেই নেয়া হবে।

নীল-শাদা গাড়িটায় হাত বোলাতে লাগলো কিশোর। বিশ্বাসই করতে পারছে না ওটা তার। বিড়বিড় করে বললো, 'সত্যিই এটা আমার!'

হেসে উঠলো নিকি। 'দোকানদারের সামনে গিয়ে ওরকম করে বলো না। তাহলে একটা ছুতো দেখাবে। আটকেও দিতে পারে। মেমোটেমোগুলো নিয়ে নাও আগে,' কোমরে হাত রেখে তাকালো কিশোরের দিকে। 'একটা কাজ তো শেষ হলো। এবার কোথায় যাবো?'

হাসলো কিশোর। 'থানায়।'

ফ্রিওয়ে গ্যারেজের পেছনের রাস্তায় দাঁড়ালো মুসা। কালো ওল্ডসমোবাইলটাকে দেখতে পেলো না। তবু সাবধানের মার নেই। দুই ব্লক দূরে এসে একটা কাঠের আড়তের পেছনে গাড়ি পার্ক করলো। তারপর নেমে হেঁটে চললো গ্যারেজের দিকে। রাস্তার অন্যপাশে একটা খালি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার আড়ালে লুকালো।

সময় কাটতে লাগলো। গ্যারেজে গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। কেউ আসছে সার্ভিসিং করাতে, কেউ রঙ করাতে, কেউ মেরামত করাতে, কেউ বা পার্ক করতে। সবাই এসে দরজার বাইরে দাঁড়ায়। দুটো করে হর্ন দেয়। খুলে যায় দরজা। দরজায় ডিউটি দিচ্ছে হ্যাম। আন্দাজ করার চেষ্টা করলো মুসা, যেসব

গাড়ি আসছে, তার মধ্যে কোনটা কোনটা চোরাই। যারা ঢুকেই গাড়ি রেখে বেরিয়ে আসছে, তাদেরকে চোর মনে হলো তার। যদিও সেরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। চালকদের কাউকেই চোরের মতো লাগছে না।

তারপর দেখতে পেলো একটা ধূসর রঙের বি এম ডব্লিউ সেডান।

সাবধানে রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো ড্রাইভার। কেমন যেন শঙ্কিত, অস্থির। হর্ন বাজালো একবার লম্বা, দু'বার খাটো, একবার লম্বা একবার খাটো। গ্যারেজের দরজা খুলে গেল। গাড়ি নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

ড্রাইভারকেও চিনতে পেরেছে মুসা। আনতিনো পেজ।

লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে ফিয়ারোর কাছে দৌড়ে এলো মুসা। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এলো গ্যারেজের কাছে। গাড়িতে বসেই চোখ রাখলো দরজার ওপর।

দশ মিনিট পর বেরিয়ে এলো কালো বুইকটা। ভেতরে দু'জন লোক। মুসার সামনে দিয়েই পার হয়ে গেল, ফিরেও তাকালো না। চালাচ্ছে অন্য লোক। পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছে আনতিনো পেজ।

পিছু নিলো মুসা।

থানার সামনে এসে গাড়ি রাখলো নিকি। হেসে বললো, 'থানার লোকেরা বোকা হয়ে যাবে।'

'দেখুন!' দেখালো কিশোর।

তাদের সামনে দিয়ে যেন ধীর গতিতে ভেসে চলে গেল কালো ওল্ডসমোবাইলটা। একবার দ্বিধা করলো। বিশ্বাস করতে পারছে না, যাদের পিছু নিয়েছে তারা সত্যি সত্যিই থানায় এলো!

'কি জন্যে এসেছো?' জানতে চাইলো নিকি।

'এই অঞ্চলে গাড়ি চুরি হচ্ছে। থানায় রেকর্ড থাকবেই।'

'চাইলেই কি আর দেবে তোমাকে?'

হাসলো কিশোর। 'দেখুনই না।'

ভেতরে ঢুকে ব্যস্ত করিডর ধরে কমপিউটার রুমে চলে এলো সে। সার্জেন্ট উইলি আছেন কিনা জিজ্ঞেস করলো। আছেন। কমপিউটার কনসোলের সামনে বসে রয়েছেন খাটো, কালোচুল একজন অফিসার। দেখেই বলে উঠলেন, 'আরে, কিশোর যে! এসো এসো! কি ব্যাপার?'

শুধু গোয়েন্দা বলেই নয়, কিশোরের সঙ্গে উইলির সদ্ভাব আরেকটা বিশেষ কারণে। একটা ব্যাপারে দু'জনের প্রচণ্ড আগ্রহ, কমপিউটার। সুযোগ পেলেই এখানে আসে কিশোর। সার্জেন্টের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ চালায়। তার সুবিধে হয় অনেক। কারণ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অনেক দামী দামী যন্ত্র আছে। সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ পায় সে। গবেষণা করতে পারে।

নতুন আনা লেজার প্রিন্টারটা দেখালেন সার্জেন্ট। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো কিশোর, যেন ওটা একটা ইউ এফ ও। এইমাত্র মহাকাশের কোনো ভিনগ্রহ

থেকে এসে নামলো। অনেক প্রশংসা করলো ওটার। তারপর নিকির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'ও আমার খালাতো ভাই, নিকি। পুব থেকে এসেছে।'

নিকির দিকে তাকিয়ে হাসলেন উইলি। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তারপর কিশোর, কেস যখন আছে, নিশ্চয় কমপিউটার নিয়ে আলাপ করতে আসোনি। কি চাও, বলে ফেলো।'

কিশোর হাসলো। 'চোরাই গাড়ির রিপোর্ট। সান্তা মনিকা থেকে ভেনচুরার মাঝে যেসব গাড়ি চুরি হয়েছে, তার। গত একমাসের হলেই চলবে।'

'দিচ্ছি।'

একটা কমপিউটারের সামনে বসে দ্রুতহাতে চাবি টিপে চললেন সার্জেন্ট। থামলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লো তাঁর প্রিন্টার। খটখট করে করে প্রিন্ট করে চললো পুরো তিন মিনিট।

'এতো গাড়ি!' নিকি তো অবাক।

মাথা ঝাঁকালেন উইলি। 'গাড়ির দেশেই তো বাস করি আমরা। হবেই।' প্রিন্টআউট বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'থ্যাংকস,' নিতে নিতে বললো কিশোর। 'আপনি অনেক করেন।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, নাও।'

বেরিয়ে এলো নিকি আর কিশোর। কালো গাড়িটাকে দেখা গেল না। কিন্তু যেই ওরা আবার পিকআপে চড়ে রওনা হলো, কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো ওটা।

'আমরা যে দেখে ফেলেছি বোঝেনি,' নিকি বললো। 'থাকুক। দরকার হলে তখন খসাবো।'

ইয়ার্ডে ফিরে চললো পিকআপ।

বডিগায় গেল না আনতিনো পেজ। শহরতলীর একটা বাজার এলাকায় ঢুকে পুরনো, জীর্ণ একটা বাড়ির সামনে থামলো কালো বুইক। পেজ নেমে গেলে আবার চলতে শুরু করলো।

রাস্তার পাশে গাড়ি রাখলো মুসা। নেমে পিছু নিলো পেজের। বাড়িটায় এলিভেটর নেই। ধুলোয় ঢাকা সিঁড়ির অনেক ওপরে একটা পুরনো স্কাইলাইটের ময়লা কাঁচের ভেতর দিয়ে আবছা আলো আসছে। চারতলায় উঠলো পেজ। ডানে একসারি ঘরের শেষ মাথার দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।'

দরজায় সাইনবোর্ডে লেখাঃ লিও গোয়েরা। ট্যালেন্ট অ্যাণ্ড বুকিংস।

যা দেখার দেখেছে। দ্রুত নিচে নেমে এলো আবার মুসা। গাড়িতে উঠে ইয়ার্ডে ফিরে চললো। কয়েকবার করে তাকালো কালো ওল্ডসমোবাইলটা দেখার জন্যে, দেখলো না।

ইয়ার্ডে ঢুকে গাড়ি থেকে নেমে 'কিশোর! কিশোর!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওয়ার্কশপের দিকে দৌড় দিলো সে। ভেতরে বসে কিশোর আর নিকি গাড়ি চুরির লম্বা তালিকাটা দেখছে। মুসা বললো, 'আরেকটা গাড়ি চুরি করে গ্যারেজে নিয়ে

গেছে পেজ। তার পিছু নিয়েছিলাম...'

পাঁই করে ঘুরলো কিশোর। 'মুসা! একটা গাড়ি কিনেছি আমি! গাড়ি বটে! নতুন এঞ্জিন...'

'তাই নাকি? খুব ভালো। শোনো...'

'একটা হোণ্ডা সিভিক। আরও বড় গাড়ি হলে ভালো হতো। তবু, কিছু তো একটা পেলাম। তিনজনের তিনটে গাড়ি হলো, ছোট হলেও আর অসুবিধে হবে না। অনেক লোক জায়গা হবে...'

'পেজ লিও গোয়েরার অফিসে ঢুকেছে...'

'নীল সাদা রঙ ওটার। কালকে আনতে যাবো...।' হঠাৎ থেমে গেল কিশোর, 'কি বললে? পেজ কোথায় গেছে?'

'লিও গোয়েরার অফিসে!'

নিকি বললো, 'গোয়েরা! সেই এজেন্ট লোকটা?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর আর মুসা।

'যোগাযোগটা বাড়ছে,' নিকি বললো। 'আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে কার সঙ্গে কার যোগাযোগ।'

'কি করবো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'লিও গোয়েরার ওপর নজর রাখবো?'

'পরে, দরকার হলে। আগে এই তালিকাটা দেখি। গত একমাসে কোথায় কোথায় গেছে টিবুরন আর তার পিরানহারা, জানা থাকা ভালো।'

'কি করে জানবো?'

'সহজ,' জবাবটা দিলো রবিন, পেছন থেকে। এতোই উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা, রবিনের আগমন টেরই পায়নি।

'সহজ!' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে মুসা।

'হ্যাঁ। পানির মতো। লিও গোয়েরার অফিসে গিয়ে তার ব্যাণ্ড শিডিউলটা দেখলেই হয়ে যায়।'

'তা যায়,' কিশোর বললো। 'কিন্তু গোয়েরা ধরে ফেললে নিকিকে বাঁচানোর আশা শেষ।'

'পারবে না,' রবিনের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। 'তার সেক্রেটারি নিরাকে ফোন করে জেনে নেবো ওই সময়টায় গোয়েরা কোথায় থাকবে। যেসব দলকে পাঠায়, গান গাওয়ার সময় ওগুলোর তদারক করতে যায়। দেখে কোনো অসুবিধে আছে কিনা, মিস্টার লজের মতো। নিরাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে কোনো পিজা শপে নিয়ে যাবো আমি। খাওয়ার খুব লোভ মেয়েটার,' বলেই মুসার দিকে তাকালো সে। খোঁচাটা দিতে ছাড়লো না। 'তোমার মতো,' হাসলো। 'দরজা খোলা রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো। সেই সুযোগে ঢুকে পড়বে তোমরা।'

'রাতে আর আসতে পারছি না আমি,' বিষণ্ণ হয়ে গেল মুসা। 'একবার বাড়ি ফিরলে আর বেরোতে পারবো না। আমি শিওর, মা আটকাবে। গাড়িটা এখনও ঠিক হয়নি। উফ্, কেন যে গাড়ি কিনতে গেলাম! শোফার হয়েই দিন কাটাতে

হবে এখন!'

'তাহলে আমাকে একাই যেতে হবে,' কিশোর বললো।

'একা কেন?' নিকি বললো, 'আমিও যাবো তোমার সাথে।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ আবার কি?' বুঝতে পারলো না রবিন।

'সারাক্ষণ নিকিভাইয়ের পিছে লেগে থাকে,' কালো ওল্ডসমোবাইলটার কথা জানালো কিশোর।

'খসাতে হবে,' নিকি বললো। 'তা পারবো। দরকার হয়নি বলে কিছু করিনি। বুঝতে পারবে না কখন পিছলে বেরিয়ে গেছি।'

'ঠিক আছে,' রবিন বললো। 'আমি নিরাকে ফোন করি।'

শহরতলীতে পুরনো বাড়িটার সামনে গাড়ি রাখলো নিকি। নিরাকে বের করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে রবিন। বন্দরের কাছে কালো গাড়িটাকে খসিয়ে দিয়ে এসেছে নিকি। আশ্চর্য দক্ষতার সাথে। না দেখলে বিশ্বাসই করতো না রবিন। লোকটা শুধু এঞ্জিনের জাদুকরই নয়, গাড়ি চালানোরও জাদুকর। পোর্ট হুয়েনেমিতে চলে গেছে লিও গোয়েরা, একটা পাংক ব্যাণ্ডের তদারক করতে। দশটার আগে ফিরবে না। এখন নিরাকে নিয়ে রবিন বেরিয়ে গেলেই ঢুকে পড়বে কিশোর আর নিকি।

'ওই যে,' কিশোর বললো।

বেরিয়ে এলো রবিন আর নিরা। পাশাপাশি হাঁটছে। কি যেন বললো রবিন। হেসে উঠলো মেয়েটা। ফোক্স ওয়াগেনে চড়ে দু'জন চলে যেতেই গাড়ি থেকে নেমে এগোলো কিশোর এবং নিকি। রাস্তা পার হয়ে চলে এলো গাড়ির সদর দরজার কাছে। ঢুকে পড়লো ভেতরে। ঘরগুলো অন্ধকার। তবে করিডর আর সিঁড়িতে আলো জ্বলছে।

চারতলায় গোয়েরার অফিসও অন্ধকার। দরজা ভেজানো। তালা খোলা। ঢুকে পড়লো দু'জনে। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে ব্যাণ্ড শিডিউল। দেখে দেখে তারিখ আর জায়গার নাম বলতে লাগলো কিশোর, নিকি মিলিয়ে নিতে লাগলো থানা থেকে আনা তালিকার সঙ্গে।

একসময় থামলো কিশোর। মুখ তুললো নিকি। 'টিবুরন আর পিরানহারা যেখানেই গেছে, প্রায় সব জায়গা থেকেই চুরি হয়েছে গাড়ি। ওরাই চুরি করেছে, আমি শিওর।'

'কিন্তু পুলিশ তো শিওর হয় না।'

মাথা নাড়লো নিকি। 'না।'

'হাতে নাতে ধরতে হবে ব্যাটাদের। আরেকটা জিনিস দেখবো। গোয়েরার অন্য কোনো দল যেখানে যেখানে গান গাইতে গেছে সেখানে গাড়ি চুরি হয়েছে কিনা।'

বলতে লাগলো কিশোর। নিকি মেলাতে লাগলো। সেই একই কাণ্ড।

যেখানেই যেদিন গেছে, গোয়েরার আরও কয়েকটা দল, গাড়ি চুরি হয়েছে।

'গোয়েরা জড়িত,' নিকি মন্তব্য করলো। 'আর কোনো সন্দেহ নেই। বলা যায় না, পালের গোদা হয়তো সে-ই।'

'কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি না এখনও।'

'করতে হবে। যা করতে এসেছি তো হলো, এরপর?'

চার্টের দিকে তাকালো আবার কিশোর। 'লেমন ট্রি লাউঞ্জে গান গাইতে গেছে আজ টিবুরন। মালিবুর টপাঙ্গা ক্যানিয়নে ক্লাবটা। ওখানে যেতে পারি আমরা। হয়তো আজ রাতেই কেসের একটা সমাধান করে ফেলা সম্ভব হবে।'

এগার

নিরাকে বিদেয় করে হেডকোয়ার্টারে ফিরে রবিন দেখলো কিশোর আর নিকি বসে আছে। কি কি জেনেছে তাকে জানালো ওরা।

'লেমন ট্রি?' শুনে বললো সে। 'হ্যাঁ, চিনি। এটা ক্লাব। টপাঙ্গা ক্যানিয়নে বনের ভেতরে। পিরানহাদের জন্যে অনেক বড়। এতো বড় জায়গায় সাধারণত যায় না ওরা। তোমাদেরকে ঢুকতে দেবে না, কিশোর।'

'তুমি সাথে থাকলেও দেবে না?' জিজ্ঞেস করলো নিকি।

'তা হয়তো দেবে। কতোটা ভিড় হবে তার ওপর নির্ভর করে।'

'চলো, দেখা যাক,' কিশোর বললো।

ইয়ার্ডের পিকআপে চড়লো তিনজনে। রবিনের ফোক্স ওয়াগনের চেয়ে ভালো ওটা। টপাঙ্গা ক্যানিয়নে এসে একটা টু-লেন অন্ধকার রাস্তায় ঢুকলো ওরা, পর্বতের ভেতর দিয়ে গেছে পথটা। হাইওয়ে থেকে লেমন ট্রি লাউঞ্জ মাইল ছয়েক দূরে। লম্বা লম্বা ওক আর ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মরচে রঙের বাড়িটা। নাম রাখা হয়েছে লেমন ট্রি, কিন্তু লেবুগাছের চিহ্নও নেই কোথাও। চারপাশে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে বাজনা।

খুব ভিড় হয়েছে। দরজায় পাহারা আছে বলে মনে হয় না। ভেতরে ঢুকে পড়লো গোয়েন্দারা। চলে এলো এককোণে। ওখানটায় ভিড় কিছুটা কম। সবাই কথা বলছে, হাসছে, মদ খাচ্ছে। সবারই নজর এল টিবুরন আর পিরানহাদের দিকে। গান গাওয়ার জোগাড়যন্ত্র করছে ওরা।

শুরু হলো গান। দলের সামনে দাঁড়িয়ে ঝড়ে দুলন্ত সুপারি গাছের মতো দুলতে শুরু করলো টিবুরন। সুর করে গাইতে লাগলোঃ লা বামবা··· বামবা···বামবা···

'ওই লোক?' তাকে দেখিয়ে নিকিকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

তাকিয়ে রয়েছে নিকি। বললো, 'এখনও শিওর হতে পারছি না। অন্য রকম লাগছে। এরকম পোশাক ছিলো না তো তখন। তবে ওই লোকটার মতোই লাগছে। আসলে লোকের নাম, চেহারা কিচ্ছু মনে রাখতে পারি না আমি।'

'চেয়ে থাকুন,' রবিন বললো। 'হয়তো মনে পড়ে যাবে। চিনে ফেলতে পারবেন।'

তিনজনেরই চোখ টিবুরনের দিকে। পিরানহাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করছে না। গান শুনতে তো আর আসেনি ওরা। সামনের ডান্স ফ্লোরে সেই চারটে মেয়ে বসে রয়েছে, প্রথমদিন যাদেরকে দেখেছিলো কিশোর আর রবিন। তালে তালে পা মেলাতে শুরু করলো ল্যাটিনো নারী-পুরুষেরা, জোড়ায় জোড়ায়। নাচের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ড্রিংকের অর্ডার দেয়ার জন্যে লোক খুঁজতে লাগলো নিকি। কিছুই না খেয়ে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিসদৃশ। ওয়েটার খুঁজতে লাগলো সে। কাউকে দেখতে পেলো না। তারমানে নিজেরটা নিজে এনে খেতে হবে। লম্বা কাউন্টারে গিয়ে একটা বিয়ার আর দুটো কোক নিয়ে ফিরে এলো।

প্রথম সেট শেষ হলো। চিনতে পারলো না টিবুরনকে নিকি। পরের সেট শেষ হলে টিবুরন আর পিরানহাদের অনুসরণ করে পার্কিং লটে বেরিয়ে এলো গোয়েন্দারা। বিশ্রাম নিতে আর সিগারেট ফুঁকতে ওখানে বেরিয়েছে গায়করা।

'অনেকটা শিওর হচ্ছি এখন,' নিকি জানালো। 'তবে পুরোপুরি নয়।'

তৃতীয় সেটের পরেও ভিড় কমার লক্ষণ দেখা গেল না। এমনকি টিবুরন যখন শেষ সেটটা শেষ করে আনছে তখনও একই রকম রইলো। লম্বা একটা টান দিয়ে শেষ করলো সে। কপালে চকচক করছে ঘাম। এমন কিছুই বের করতে পারলো না গোয়েন্দারা, যার সঙ্গে গাড়ি চুরির সম্পর্ক আছে।

'গাড়ি চোরের মতো ব্যবহার করছে না,' নিকি বললো।

'হ্যাঁ,' রবিনও হতাশ হয়েছে। 'ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে তো আর গাড়ি চুরি করা যায় না। যদি অলৌকিক কোনো ক্ষমতা না থাকে।'

'ওদের পেছনে লেগেই থাকবো আমি,' কিশোর বললো। 'হয়তো গানের শেষে বাড়ি ফেরার আগে কাজটা সারবে।'

বাইরে চাঁদ উঠেছে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো গোয়েন্দারা। বনের ভেতরে ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে যাচ্ছে বাতাস। মিউজিক শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, তবু, একজনও বেরোলো না ক্লাব থেকে। তারমানে লেমন ট্রির প্রধান আকর্ষণ গানবাজনা নয়, এ-জন্যেই পাত্তা পেয়েছে টিবুরনের দল। আসলে কে গাইতে এলো-গেল সেটা নিয়ে মাথাই ঘামায় না কর্তৃপক্ষ।

চারপাশের পর্বতে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করেছে চাঁদের আলো। আঁকাবাঁকা গিরিপথ ধরে চলে গেল কয়েকটা গাড়ি। দূরে একটা কুকুর ডাকলো। এসব আর বাতাসের কানাকানি বাদ দিলে, একটানা যে শব্দ আসছে, তা হলো ক্লাবের ভেতরে জনতার গুঞ্জন।

অবশেষে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো টিবুরন আর পিরানহারা। মাঠের কোণে দূরে পার্ক করা রয়েছে ওদের লো-রাইডারগুলো, আর বাদ্যযন্ত্র বয়ে নেয়ার একটা গাড়ি। ভ্যানে যন্ত্রপাতিগুলো সব তুলে যার যার গাড়িতে উঠলো গায়করা। এবারে পাঁচটার বেশি গাড়ি এসেছে ওদের। মেয়েগুলোও আজ নিজের গাড়ি

এনেছে।

'চুরি করতে এসেছে বলে তো মনে হয় না,' রবিন বললো।

রঙচঙে গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। পার্বত্য অঞ্চলে এই বুনো এলাকায় কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছে বিচিত্র বাহনগুলোকে। 'চলো, কাছে গিয়ে দেখি,' বললো সে।

'আমাদের দেখে ফেললে?' নিকি বললো, 'সাবধান হয়ে যাবে।'

জবাব দিলো না কিশোর। চলতে আরম্ভ করেছে। পার্ক করা গাড়ির আড়ালে আড়ালে দ্রুত এগিয়ে চললো সে। পেছনে একই ভাবে এগোতে লাগলো রবিন আর নিকি। বেরোনোর পথটার কাছে চলে যেতে থাকলো। টিবুরন আর তার দলের মিছিল ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগলো পার্কিং ফীল্ড থেকে।

'ওদের গাড়িগুলো কিন্তু লো-রাইডার পজিশনে নেই,' রবিন বললো। 'স্বাভাবিক উচ্চতায় রয়েছে এখন বডি।'

'থাকবেই,' বললো নিকি। 'যেতে হবে পাহাড়ী এলাকার ভেতর দিয়ে। রাস্তা ভালো না।'

হঠাৎ কি মনে হতে বসে পড়লো কিশোর। তারপর একেবারে শুয়ে পড়লো মাটিতে।

'কিশোর!' চমকে গেছে রবিন।

'কিশোর!' নিকিও চেঁচিয়ে উঠলো।

'চুপ!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'একটা জিনিস দেখলাম! ওই গাড়িগুলোর নিচে! দেখুন!'

নিকি আর রবিনও শুয়ে পড়লো। ওদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে লো-রাইডারগুলো। হাইড্রলিক পাম্পের সাহায্যে স্বাভাবিক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওগুলোর বডি, স্বাভাবিক গাড়ির মতোই চলছে এখন।

'আর দশটা গাড়ির মতোই তো লাগছে,' রবিন বললো। 'গায়ের লেখাগুলো বাদ দিলে।'

'হ্যাঁ,' উত্তেজনা চেপে রাখতে যেন কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। 'আর দশটা গাড়ির মতোই। আরেকটু ভালো করে তাকিয়ে দেখ, নিচে। কি নেই দেখতে পাচ্ছো!'

তাকিয়ে রয়েছে রবিন আর নিকি। এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে গাড়িগুলো।

'কই, কিছু তো দেখছি না,' রবিন বললো।

'দেখেছি!' কিশোরের মতোই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে নিকি। 'বাম্প প্লেটগুলো নেই! সামনেও না, পেছনেও না! লো-রাইডার হতেই পারে না! স্বাভাবিক গাড়ি!'

'স্বাভাবিক গাড়ি, অথচ দেখতে লাগছে লো-রাইডারের মতো,' কিশোর বললো। 'কি গাড়ি, দেখুন তো? ভালো করে দেখে বলুন।'

রবিন বললো, 'একটা মারসিডিজ! আর দুটো ভলভো!'

'একটা বি এম ডব্লিউ আর আরেকটা মারসিডিজ!' বললো নিকি।

'মারসিডিজ আর ভলভোগুলো চিনতে পেরেছিলাম আমি!' কিশোর বললো।

'ওগুলোর আকার দেখে। শ্যাকে যেগুলো চালাতে দেখেছি ওদেরকে, সেগুলো ভিন্ন গাড়ি ছিলো। বাজি রেখে বলতে পারি, গায়কেরা গাড়ি চুরি করে না। ওরা শুধু চালিয়ে নিয়ে যায় রকি বীচে। কেউ ভালো মতো নজর করে দেখতে যায় না। কে আর দেখবে? একদল গায়ক গান শেষে লো-রাইডারে করে ফিরে চলেছে, এখানকার পরিচিত দৃশ্য এটা।'

শেষ গাড়িটা চলে যাওয়ার পর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। 'জলদি! কোথায় যায় দেখতে হবে!'

দৌড়ে এসে পিকআপে উঠলো তিনজনে। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো ট্রাকটা। অসমতল মাটিতে দুলছে, ঝাঁকাচ্ছে, খনখন ঠনঠন নানারকম বিচিত্র আওয়াজ তুলছে। লো-রাইডার চালাচ্ছে না এখন টিবুরন আর তার দল, কাজেই জোরে চালাতেও অসুবিধে নেই। কিন্তু নিকির সঙ্গে পারার কথা নয় ওদের, নতুন গাড়ি নিয়ে পুলিশই পারেনি। দেখতে দেখতে ধরে ফেললো মিছিলটাকে।

'চোরাই গাড়িই যদি হয় এগুলো,' রবিন বললো। 'পার্কিং লটে গেল কি করে? আর ওদের আসল গাড়িগুলোই বা কোথায়?'

'আমার ধারণা,' কিশোর বললো। 'চুরি করে গাড়িগুলোর গায়ে আলগা খোলস পরিয়ে, লেখাটেখা লিখে এনে রেখে গেছে দলের অন্য লোকেরা।'

'হ্যাঁ,' তার সাথে একমত হলো নিকি। 'গাড়ি চুরি করতে অভিজ্ঞতা লাগে। অনেক ছেলেছোকরা শুধু চড়ার লোভে গাড়ি চুরি করে। বেশিক্ষণ রাখতে পারে না। ধরা পড়ে যায়। কিন্তু প্রফেশনালরা দ্রুত হজম করে ফেলে, খুঁজেই পাওয়া যায় না আর গাড়িটা। কিশোর ঠিকই বলেছে। গাড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়ে রঙ করে, লো-রাইডারের খোলস পরিয়ে, পার্ক করে রেখে গেছে। গায়কের দল গান শেষে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে।'

'কিন্তু দলটা তাহলে এখানে এলো কিসে চড়ে?' রবিনের প্রশ্ন।

শ্রাগ করলো নিকি। 'কেউ এনে দিয়ে যেতে পারে। ভ্যানে চড়ে আসতে পারে। কিংবা কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে চোরাই গাড়িগুলো জোগাড় করে নিয়েছে লোকগুলো, চালিয়ে চলে এসেছে এখানে।'

'কথা হলো, যদি প্রফেশনালরাই চুরি করে থাকে, টিবুরন আর পিরানহাদের দরকার হলো কেন তাদের? প্রফেশনালরা নিজেরাই গ্যারেজে নিয়ে যাচ্ছে না কেন খুলে ফেলার জন্যে?'

'কারণ প্রফেশনাল হতে হতে পুলিশের খাতায় নাম রেকর্ড হয়ে যায়। গাড়ি চুরি হতে শুরু করলেই তাদের ওপর নজর চলে যাবে পুলিশের, ধরতে আরম্ভ করবে। গাড়িসহ ধরতে পারলেই সোজা গারদবাস।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'চেনা অপরাধীদের ঝুঁকি বেশি।'

'সেই জন্যেই, চুরিটা প্রফেশনালরাই করে। কিন্তু নিজেদের কাছে বেশিক্ষণ রাখে না। এমনকি গ্যারেজে চালিয়ে নেয়ার ঝুঁকিটাও নেয় না। চাপিয়ে দেয় অন্যের ঘাড়ে, যাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না পুলিশ।'

'কারণ যা-ই হোক, একটা ব্যাপার শিওর, টিবুরনের দল চুরি করে না, শুধু

ডেলিভারি দিয়ে আসে। কাজেই তার পিছু নিলেই চোরদের হেডকোয়ার্টারের খোঁজ পেয়ে যাবো।'

'তাহলে,' আবার প্রশ্ন তুললো রবিন। 'মারসিডিজটার ব্যাপারে কি বলবে? নিকিভাইকে যেটা রকি বীচে চালিয়ে আনতে বলা হয়েছিলো? খোলস তো দূরের কথা, রঙ পর্যন্ত করা হয়নি ওটার।'

'না,' ভাবছে কিশোর। 'হতে পারে, আলাদা ভাবে ওটা একলা চুরি করেছে টিবুরন। সেরাতে গান গাওয়ার পর।'

'তাহলে খুব খারাপ করেছে,' নিকি বললো। 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে ভীষণ রেগে যায় বসেরা।'

'হ্যাঁ। যেহেতু গায়কদের ওটা চালিয়ে আনার কথা ছিলো না, সেহেতু রঙও করা হয়নি।'

'কিশোর!' সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো রবিন।

পাশের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বিশাল ট্রেলার। এসব রাস্তায় এইই হয়, প্রচুর ট্রেলার চলে। ছুটি কাটাতে আসে লোকে। বড় চক্কর নিতে গিয়ে এমন ভাবে রাস্তা আটকে দিলো, পাশ কাটিয়ে ওপাশে বেরিয়ে যাওয়ার আর কোনো পথ রইলো না। ধীরে ধীরে সোজা হলো ওটা, দু'পাশের লেন দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করতে পারলো আবার, কিন্তু ওটার পেছনে এমন ভাবে আটকা পড়লো পিকআপটা, সামনে যেতে পারছে না কোনোমতেই। খুব আস্তে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলো আঠারো চাকার দৈত্যটা।

অবশেষে বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে সোজা রাস্তায় পৌছলো গাড়ি। এবার পাশ কাটিয়ে আগে বাড়ার সুযোগ পেলো নিকি। পেয়ে আর দেরি করলো না। শাঁ করে বেরিয়ে চলে এলো। কিন্তু লো-রাইডারগুলোকে দেখা গেল না। কোনো চিহ্নই নেই ওগুলোর, যেন ছিলোই না। কোস্ট হাইওয়েতে পৌছে ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছাড়লো নিকি। অনেক রাত হয়েছে। যানবাহনের ভিড় খুব কম। কোথাও থামতে হলো না তাকে, কোনো বাধা পেলো না। সোজা চলে এলো রকি বীচে। কিন্তু টিবুরন বা পিরানহাদের কাউকে দেখা গেল না কোথাও।

'ওই কার ওয়াশ আর গ্যারেজে দেখতে হবে,' কিশোর বললো।

দেখা হলো। পাওয়া গেল না লো-রাইডারগুলো।

'এবার?' নিকির প্রশ্ন।

'কিছুই না,' হাত দিয়ে ডলে চুল সমান করতে করতে জবাব দিলো কিশোর। 'অন্তত আজকের রাতে আর কিছু করার নেই। কাল ভেবেচিন্তে একটা উপায় বার করবো, কিভাবে মালসহ হাতেনাতে চোরগুলোকে পাকড়াও করা যায়।'

বার

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা আর নিকি।

'আমি এখন নিশ্চিত,' ডেস্কের ওপাশ থেকে বললো কিশোর, 'চোরদের বস্

লিও গোয়েরা। সেটা প্রমাণ করতে হবে।'

একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলো ওরা। ভাবছে, কিভাবে ধরা যায় চোরগুলোকে।

'আমার জন্যে অনেক করছো তোমরা। কৃতজ্ঞই করে ফেলেছো,' নিকি বললো। 'কিন্তু ওটা একটা শক্তিশালী দল। ওরকম দলগুলো ভীষণ বিপজ্জনক হয়। যা যা জেনেছি পুলিশকে গিয়ে জানাতে পারি আমরা।'

'পুলিশ আমাদের কথায় কাজ করবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'বিশ্বাস করবে?' যোগ করলো মুসা।

মাথা নাড়লো নিকি। 'কোনোটাই করবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে যা করছি, করে যেতে হবে আমাদের,' কিশোর বললো। 'তোমাদের কি মনে হয়?' দুই সহকারীর দিকে তাকালো সে।

'ঠিক,' রবিন বললো।

'চালিয়ে যাবো,' বললো মুসা।

'বেশ,' হাত তুললো কিশোর। 'আগের কথায় আসি। আমরা জেনেছি, লো-রাইডারের লেবাস পরিয়ে গাড়িগুলোকে পার করে দিচ্ছে টিবুরন আর পিরানহারা। কোনো সন্দেহ নেই, ফ্রীওয়ে গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয় ওগুলো। পথের মধ্যে ওদেরকে আটকাতে পারিনি। গ্যারেজে গিয়েও কোনো লাভ নেই। ইতিমধ্যেই সে কাজ সেরে এসেছি।'

নিকি বললো, 'আর গ্যারেজে লুকানো চপ শপ থেকে থাকলেও পুলিশ হানা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে সব এমন করে দেবে, ঢুকে আর কিচ্ছু বুঝতে পারবে না পুলিশ।'

'তার মানে বাইরে থেকে কিছু করতে পারছি না আমরা,' রবিন বললো।

'এবং তার মানে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের,' বললো মুসা।

'সারা রাত আমি এই কথাটাই ভেবেছি,' কিশোর বললো। 'যেভাবেই হোক, আমাদের কাউকে দলের ভেতরে ঢুকতেই হবে।'

আবার নীরবতা। কপাল কুঁচকে ফেলেছে রবিন। বললো, 'কিভাবে সেটা সম্ভব, কিশোর? আমাদেরকে দেখেছে ওরা। চিনে ফেলবে।'

নিকি বললো, 'আমাকে তেমন দেখেনি ওরা, চিনবে বলে মনে হয় না। দাড়িগোঁফ শেভ করছি না কদিন, আরও কদিন না হয় না-ই করলাম…'

'হবে না,' বাধা দিয়ে বললো কিশোর। 'পেজ আর টিবুরন আপনাকে দেখেছে। চিনে ফেলবে। গেলে যেতে হবে আমাকেই।'

মুসা বললো, 'তোমাকে তো আরও ভালো করে চেনে। তবে আমি যেতে পারি।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। রবিন বললো, 'ও ঠিকই বলেছে, কিশোর।'

মাথা ঝাঁকালো নিকি।

'বেশ,' রাজি হলো কিশোর। 'তোমাকে কিভাবে ঢোকানো যায় সেকথা এখন

ভাবতে হবে।'

'গ্যারেজে একটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি,' মুসা বললো। 'মেকানিকের কাজের জন্যে।'

'বেশি রিস্কি হয়ে যাবে,' নিকি বললো। 'চপ শপের জন্যে অপরিচিত লোক নেবে না।'

'পার্কিং অ্যাটেনডেন্টের চাকরি হলে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা-ও হবে না। মনে হয়, শুধু ওই দারোয়ানটাকেই বিশ্বাস করে ওরা, হ্যাম না ড্যাম কি নাম। আর সে দেখেছে মুসাকে। চিনে ফেলতে পারে।'

'কার ওয়াশে ঢুকলে কেমন হয়?' রবিন বললো, 'ওখানেই গিয়ে আড্ডা মারে টিবুরনের গোষ্ঠি। আর ওখানে সব সময় লোক দরকার হয়, গাড়ি মোছার জন্যে। চাকরি নিলে আস্তে আস্তে টিবুরনের সঙ্গে খাতির করে ফেলতে পারবে মুসা। তারপর গ্যারেজে ঢোকার একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, এইটা হলোগে উপায়,' তুড়ি বাজালো নিকি। 'বার বার একটা কথাই শোনাবে, মেকানিক হতে চায় কোনো গ্যারেজে। বেশি টাকা আয় করতে চায়। তারপর কোনো এক সুযোগে টিবুরনকে দেখিয়ে দিতে হবে গাড়ির ব্যাপারে কতোটা জ্ঞান তার।'

'অনেক সময় লেগে যাবে তাতে,' কিশোরের পছন্দ হলো না বুদ্ধিটা। 'তবে...একটা কাজ করা যেতে পারে। টিবুরনের গাড়ি নষ্ট করে দিতে পারি আমরা। এমন ভাবে, যাতে গোলমালটা সহজে কোনো মেকানিক ধরতে না পারে, জানা না থাকলে। তারপর জাদুমন্ত্রের মতো ঠিক করে ফেলবে ওটা মুসা। তখন টিবুরনের ভক্তি এসে যাবে তার ওপর।'

'এঞ্জিনের নিচে ইলেকট্রিকের তার থাকে,' নিকি বললো। 'গোটা দুই ছুটিয়ে রাখলে সহজে কেউ বের করতে পারবে না খুঁতটা। জানা থাকলে লাগানো কোনো ব্যাপারই না।'

'তাহলে তা-ই করতে হবে,' বললো রবিন।

'কিন্তু টিবুরন যে গাড়ি কার ওয়াশে আনবে, তার ঠিক কি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'কিভাবে শিওর হওয়া যায়?'

'এটা একটা প্রশ্ন। তবে গাড়ি থাকলে তো আর হাঁটে না লোকে। আমার মনে হয় আনবে,' জবাব দিলো কিশোর। 'কিন্তু তার পরেও গ্যারেজের চাকরিতে ঢুকতে অনেক সময় লেগে যাবে তোমার। তাড়াতাড়ি জানতে হলে অন্য কিছু করতে হবে।'

'যেমন?' কিশোরের দিকে তাকালো রবিন।

'গ্যারেজে হপ্তাখানেকের জন্যে একটা গাড়ি রাখার জায়গা ভাড়া করবো আমরা। সেই গাড়িতে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবো, কি হচ্ছে না হচ্ছে। চপ শপ থেকে থাকলে সেটা কোথায় জানতে পারবো।'

'কার গাড়ি পার্ক করবে?' রবিনের দিকে তাকালো নিকি।

'আমি আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকবো,' রবিন বললো। 'মিস্টার লজের সঙ্গে

একজায়গায় যেতে হবে। তারপর একটা দল নিয়ে যেতে হবে এক পার্টিতে। মহিলাদের কি একটা অনুষ্ঠান।'

'তুমি পারবে না, আগেই জানি আমি,' কিশোর বললো। 'নিকিভাইও পারবে না। পুলিশকে ছাড়ানোই মুশকিল হয়ে যাবে তার জন্যে। আর পুলিশ পিছে পিছে গেলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে চোরের দল। আমিই যাবো। গাড়ি তো একটা কিনেছি। ওটা নিয়ে চলে যাবো। প্রথম দিনেই গোয়েন্দা-গিরির হাতে-খড়ি হয়ে যাক গাড়িটার,' চকচক করছে তার চোখ।

'আবার সেই একই কথা,' মুসা বললো। 'ওরা চিনে ফেলবে তোমাকে।'

'চেনা কেউ থাকলে যাবোই না। পেজকে দেখলেই পালাবো। আর হ্যামটা চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। দেখেছে তো উত্তেজনার সময়, তা-ও একবার। তাছাড়া আলো এতো কম ছিলো, চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়নি। মনে রাখতে পারার কথা নয়। তোমার কার ওয়াশে চাকরি নেয়ার চেয়ে এই প্ল্যানটা ভালো, মুসা।'

ঢোক গিললো মুসা। 'তাহলে দুজনেই চেষ্টা করি। আমি কার ওয়াশে যাই। তুমি গ্যারেজে। তাতে সফল হওয়ার আশা দ্বিগুণ।'

'আমি মেরিখালাকে বলে পিকআপটা ধার নেবো কয়েক দিনের জন্যে,' নিকি বললো। 'কার ওয়াশে গিয়ে চোখ রাখবো মুসার ওপর। পুলিশ আমার পিছু নেবে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারবে না। শুধু দেখবে, বার বার ট্যাকো বেলে খেতে যাচ্ছি আমি। পেটুক ভাববে আরকি, আর কিছু না।'

তিন গোয়েন্দার তহবিল থেকে টাকা বের করলো কিশোর, গাড়ি পার্কিঙের ভাড়া। তারপর তিনটে মিনি ওয়াকি-টকি বের করলো। বললো, 'মুসা, ওয়ার্কশার্ট পরে নিও। ওয়াকি-টকি রাখতে সুবিধে হবে। নিকিভাইয়ের কাছে থাকবে একটা। দরকার হলে কথা বলতে পারবে তার সঙ্গে। আরেকটা আমার কাছে থাকবে। লাগতে পারে।'

তিনটে গাড়ি একইসঙ্গে বেরোলো ইয়ার্ড থেকে, একটার পেছনে আরেকটা। রবিন চলে গেল লজের অফিসে, মুসা বাড়িতে শার্ট আনতে, আর পিকআপ নিয়ে নিকি আর কিশোর চললো হোণ্ডা সিভিকটা আনার জন্যে।

ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছে গাড়িটা। চড়তে একটা মুহূর্ত দেরি করলো না কিশোর। বার বার দেখে নিলো গাড়ির কাগজপত্র আর তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিক আছে কিনা। তারপর নিকিকে বললো, 'পরে দেখা হবে। হেড-কোয়ার্টারে।'

হাসলো নিকি। 'সাবধানে চালাবে। নতুন নতুন গাড়িতে চড়লে পাগল হয়ে যায় মানুষ, স্পীডের ঠিক-ঠিকানা থাকে না। অ্যাক্সিডেন্টটা তখনই বেশি করে।'

কিশোরও হাসলো। খেলনা হাতে পেলে বাচ্চা ছেলের যে অবস্থা হয়, ঠিক সেই রকম হয়েছে তারও। চমৎকার একটা গাড়ি। কথা বললেই যেন বোঝে। হাতের সঙ্গে সাড়া দেয়। কোনো প্রতিবাদ নেই, বেয়াড়াপনা নেই।

দেখতে দেখতে গ্যারেজের কাছে চলে এলো। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজালো। কিছুই ঘটলো না।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার বাজালো।

বড় দরজার ভেতরের ছোট দরজা খুলে বেরোলো একজন লোক। সেই পিস্তলধারী লোকটা। হ্যাম। 'কি চাই?'

ঢোক গিললো কিশোর। তাকে চিনে ফেললো না তো লোকটা? চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালালো। হেসে বললো, 'গাড়ি রাখার জায়গা আছে?'

ঘুরে দাঁড়ালো হ্যাম। 'নেই।'

যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, বললো, 'বেশির ভাগ সময় বাইরেই রাখবো। মাঝে মাঝে শুধু ভেতরে। হবে?'

ফিরে তাকালো লোকটা। 'ভাগো!'

ভেতরে চলে গেল লোকটা। কি করা যায়, ভাবতে লাগলো কিশোর। গাড়ি রাখার জায়গা না দিলে কিছুই করতে পারবে না। নজর রাখা সম্ভব না। কোনো বুদ্ধিই বের করতে পারলো না সে। মন খারাপ করে ফিরে এলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে। একমাত্র ভরসা এখন, মুসা।

ওয়ার্কশপে ঢুকে বসে বসে ভাবতে লাগলো সে। মুখে চিউইংগাম। সময় কাটে না, কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে এলো আবার। গাড়িটা মুছতে লাগলো। ইয়ার্ডে শুধু রোভার রয়েছে। মেরিচাচী বোধহয় বাজারে গেছেন। বোরিসকে নিয়ে রাশেদ পাশা গেছেন মাল কিনে আনতে।

রোভার কাজ করছে। তার এখন কথা বলার সময় নেই।

টেলিফোনটা যেন বাঁচিয়ে দিলো কিশোরকে।

'কিশোর!' নিকির কণ্ঠ। 'একটু আগে দু'জন লোক কাজ ছেড়ে চলে গেছে! মুসা গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেল কাজ দিতে। ...তুমি এখন ইয়ার্ডে?'

'কাজ হয়নি। জায়গা দেয়নি। আপনি কেন ভাবলেন আমি আছি?'

'ভাবিনি। মনে হলো একবার করেই দেখি; যদি থাকো।'

'তাহলে কাজ পেয়ে গেছে মুসা। ভালো। টিবুরন আর পিরানহাদের খবর কি?'

'আসেনি এখনও। আমি আছি। নজর রাখবো। তুমি কি করবে?'

'কি যে করবো সেটাই তো ভাবছি। কোনো কাজ নেই।'

'এক কাজ করো। চলো আবার যাই। আমিও যাবো সাথে। ঘুসটুস দিয়ে কাজ হয়েও যেতে পারে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম...ঠিক আছে। চলুন। কোথায় দেখা হবে?'

'তুমি চলে যাও গ্যারেজে। আমি আসছি।'

'নজর রাখবেন না?'

'আপাতত কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। তোমাকে দিয়ে আসতে সময় লাগবে না। চট্ করে দিয়েই চলে আসবো।'

'আচ্ছা, শুনুন, এভাবে না গিয়ে অন্যভাবে যাওয়া যাক। আমি ট্যাকো বেলে চলে আসি। আমার গাড়িটা আপনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন গ্যারেজে। আমি পেছনে লুকিয়ে থাকবো। আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। আপনি গাড়ি রেখে চলে আসার

পরেও ভেতরে থেকে যেতে পারবো।'

'পুলিশ?'

'খসাতে হবে।'

'বেশ, চলে এসো।'

পেছনের মেঝেতে শুয়ে পড়লো কিশোর। গাড়ি চালাচ্ছে নিকি। গাড়ি ভাড়ার টাকাটা তাকে দিয়ে দিয়েছে সে। পাঁচ ব্লক গিয়েই গাল দিয়ে উঠলো নিকি।

'কি হলো?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'কি আবার! পুলিশ! একটা নীল অ্যারাইস,' হাসলো নিকি। 'আচ্ছা, দেখাচ্ছি খেলা। কিশোর, শক্ত হয়ে থাকো।'

খেপা ঘোড়ার মতো আচমকা লাফিয়ে উঠে যেন রকেটগতিতে ছুটতে শুরু করলো হোণ্ডা সিভিক। পেছনের সীট খামচে ধরে রেখেছে কিশোর। কিন্তু স্থির থাকতে পারছে না কিছুতেই। মোড় ঘোরার সময় বেশি অসুবিধে। বস্তার ভেতরে ইঁদুর ভরে যেভাবে ঝাঁকিয়ে মারে লোকে, যেন সেভাবে মারার চেষ্টা চলছে তাকে। তবে নিজের জন্যে উদ্বিগ্ন হলো না সে। চেঁচিয়ে বললো, 'আরে আস্তে চালান না! আমার গাড়িটা শেষ করে দেবেন তো!'

হেসে উঠলো নিকি। 'এতো নরম না গাড়ি। চুপ করে থাকো। কিছু হবে না।'

ছড়ে-ছিলে যাচ্ছে কিশোরের চামড়া। কিন্তু জ্বালা টেরই পাচ্ছে না যেন। কেবল গাড়ির প্রতিটি আর্তনাদ শেলের মতো বুকে এসে বিঁধছে তার। রাস্তা ধরে যতোক্ষণ চললো, ততোক্ষণ কোনোমতে চুপ করে রইলো। কিন্তু রেলরোড আর চষাখেত যখন পেরোতে শুরু করলো গাড়ি, ওটার ঝাঁকুনি আর গোঙানি সইতে পারলো না আর। সব রাগ গিয়ে পড়লো পুলিশের ওপর। গালাগাল শুরু করলো ওদেরকে।

কয়েক যুগ পরে যেন একসময় অবশেষে বন্ধ হলো এসব অত্যাচার। হেসে উঠলো নিকি। 'খসিয়েছি।'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর, 'গাড়িটা ঠিক আছে?'

'এক্কেবারে,' আবার হাসলো নিকি। 'দারুণ গাড়ি। কিচ্ছু হয়নি।...ওই যে, গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে। মাথা নামিয়ে রাখো।'

শক্ত হয়ে গেল কিশোর। সেঁটে রইলো মেঝেতে। থামলো গাড়ি। হর্ন বাজালো নিকি।

বেরিয়ে এলো হ্যাম। 'কি চাই?'

'পার্কিঙের জায়গা। এক হপ্তা।'

'নেই।'

'আছে তো জানিই। এক হপ্তার ভাড়া কতো?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর জবাব শোনা গেল, 'পঞ্চাশ ডলার।'

'এতো কম। আমি তো ভেবেছিলাম কম করেও একশো লাগবে। ঠিক আছে, পুরোটাই দেবো। দেখুন, কোনো মতে জায়গা হয় কিনা।'

আবার নীরবতা। তারপর বললো হ্যাম, 'ঠেলেঠুলে করে দেয়া যায় হয়তো।'

খুলে গেল গ্যারেজের দরজা। গাড়ি ঢোকালো নিকি। একটা সারির পেছনে রাখার জায়গা দেখিয়ে দিলো হ্যাম। চলে গেল আবার দরজার কাছে, পাহারা দিতে।

'হলো তো। থাকো,' নিচু গলায় কিশোরকে বললো নিকি।

আবার গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। 'সবটাই খরচ করে ফেললেন! আমাদের তহবিলে ওই একশোই ছিলো!'

'আর কিছু করার ছিলো না, কিশোর। এর কমে ঢুকতে দিতো না ব্যাটা। নাম্বার ওয়ান শয়তান। যা হয়েছে হয়েছে, এখন কাজ হলেই হয়। টাকাটা আমি শোধ দিয়ে দিতে পারবো, সুযোগ পেলে। যাই, দেখি গিয়ে মুসা কি করছে। পাঁচটা নাগাদ আসবো আবার।'

নীরব গ্যারেজে একা হয়ে গেল কিশোর। ম্লান আলোর বিষণ্ণতার মাঝে চুপ করে পড়ে রইলো গাড়ির মেঝেতে।

তের

একমনে কাজ করে যাচ্ছে মুসা। তার সাথে আরও লোক রয়েছে। তবে তাদের সাথে কথা খুবই কম বলছে সে। একহাতে ক্লিনারের বোতল, আরেক হাতে মোছার কাপড়। কাজ করছে আর তাকিয়ে দেখছে টিবুরন কিংবা পিরানহারা এলো কিনা।

বিকেল গড়িয়ে গেল। এলো না ওরা। গাড়ির পর গাড়ি এসে ঢুকছে, ধোয়ামোছা হলে চলে যাচ্ছে, আরও ঢুকছে। ট্যাকো বেলে বসে কোক আর স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে নিকি।

কাজ করে চললো মুসা।

অপেক্ষা করতে লাগলো নিকি।

জানালার কাছে মাথা তুললো কিশোর। ম্লান আলোর নিচে নীরবে গুবরে পোকার মতো ঘাপটি মেরে রয়েছে যেন গাড়িগুলো। দোতলায় মেকানিকদের কাজ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনতলায় এয়ার কমপ্রেশরের আওয়াজও মৃদু মৃদু শুনতে পাচ্ছে এখান থেকে।

অন্য কিছু শোনার অপেক্ষায় কান পেতে রয়েছে সে। ভাবছে, এই বাড়িরই কোথাও অদৃশ্য হয়েছে কমলা ক্যাডিলাকটা। কালো একটা বুইকে করে কোথাও থেকে বেরিয়েছে পেজ আর হ্যাম। কোনখান থেকে?

ঘড়ি দেখলো নিকি। বিকেল চারটে। কিছুই ঘটেনি কার ওয়াশে। শুধুই গাড়ির আসাযাওয়া আর নিয়মিত কাজ। টিবুরন, পিরানহা কিংবা ওদের গার্লফ্রেণ্ডদের কেউই আসেনি এতোক্ষণে। যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। গ্যারেজে গিয়ে হোণ্ডা সিভিক আর কিশোরকে নিয়ে আসতে হবে।

দু'বার মাথা নিচু করে ফেলতে হয়েছে কিশোরকে। টহল দিতে দিতে ওই দু'বার তার সামনে দিয়ে গিয়েছিলো হ্যাম। সাড়ে চারটে বাজলো। আর বসে থাকতে পারলো না কিশোর। নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। পা টিপে টিপে এগোলো এলিভেটরের দিকে।

কান পেতে রয়েছে। হ্যামের কোনো সাড়া পেলেই লুকিয়ে পড়বে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না গ্যারেজে। আর কোনো গাড়িই ঢুকলো না।

সারাটা ঘর খুঁজে দেখার ইচ্ছে তার। দেখতে চায়, পয়লা বার তার আর মুসার চোখে কিছু এড়িয়ে গিয়েছিলো কিনা। অফিসের দরজাগুলোও খুলে দেখতে লাগলো। বাইরে থেকে অফিসের মতো লাগলেও আসলে ওগুলো স্টোররুম। কিংবা হয়তো আগে অফিসই ছিলো, এখন অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

সব দেখেটেখে আবার এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। প্ল্যাটফর্মটা নামিয়ে রাখা হয়েছে। চওড়া শ্যাফটটাতে আলো কম, গ্যারেজের মতোই।

ধড়াস করে উঠলো বুক! পায়ের শব্দ! হঠাৎ করেই বেরিয়ে এসেছে হ্যাম। র‍্যাম্পের কাছ থেকে।

লো-রাইডারে করে কার ওয়াশে এসে পৌঁছলো টিবুরন আর পিরানহারা। কাপড়ে-চোপড়ে ওয়েস্টার্ন ছবির ডাকাত মনে হচ্ছে। যেন এইমাত্র একটা ডাকাতি করে এলো। পাঁচটা বাজে। কার ওয়াশ বন্ধ করার সময় হয়েছে। মুসার মজুরি মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে, এই সময় অফিসে ঢুকলো টিবুরন।

'থ্যাংকস, স্যার,' এতো জোরে বললো মুসা, যাতে আশেপাশের সবাই শুনতে পায়। 'টাকা আমার খুব দরকার। বাবার চাকরি নেই। আপনার তো অনেক জানাশোনা। ভালো মেকানিক অনেকেই চায়। দয়া করে যদি কোথাও আমাকে লাগিয়ে দিতে পারতেন, বেঁচে যেতাম। কোনোদিন ভুলতাম না আপনার কথা।'

'দেখবো, মুসা। তোমার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। সত্যিই দেখবো আমি।'

'মেকানিকের কাজ করিয়েও দেখতে পারেন। আমি জানি, আপনি খুশি হবেন। টাকা আমার ভীষণ দরকার। যে কোনো কাজ করতে রাজি আছি।'

আড়চোখে দেখলো সে, টিবুরন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেরিয়ে এলো সে। বেশি অভিনয় করতে গিয়ে লোকটাকে সন্দিহান করে তুলতে চাইলো না। বাইরে হাঁটতে শুরু করলো তার ফিয়ারোর দিকে।

ট্যাকো বেল পেরোনোর সময় লক্ষ্য করলো, নিকি তার জায়গায় নেই।

দম বন্ধ করে ফেলেছে কিশোর। এগিয়ে আসছে লোকটা। হোণ্ডায় ফিরে যাওয়ার আর সময় নেই। সব চেয়ে কাছের গাড়িটায় যে গিয়ে ঢুকবে, তারও উপায় নেই।

এলিভেটর আর একটা গাড়ির সারির মাঝের গলি দিয়ে হাঁটছে এখন হ্যাম। বাঁয়ে একবার ভালো করে তাকালেই দেখে ফেলবে কিশোরকে।

আর কোনো পথ না দেখে তেলকালি আর ধুলো লেগে থাকা মেঝেতেই শুয়ে পড়লো কিশোর। গড়িয়ে চলে এলো কাছের গাড়িটার তলায়। চোখের সামনে দেখলো কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে হ্যামের বুটপরা পা। থেমে গেল পা দুটো। শূন্য গলিটা দেখছে হয়তো।

আস্তে আস্তে দম ফেলছে কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ওপরের তেল আর ঘাম মুছলো। তার মনে হচ্ছে কোনোদিনই বুঝি ওখান থেকে সরবে না হ্যাম। আরও কাছে এগিয়ে এলো বুট। হাত বাড়ালেই এখন ছুঁতে পারে কিশোর।

গ্যারেজে ঢোকার ছোট দরজাটা খুলে গেল। লম্বা বর্শার ফলার মতো ভেতরে এসে পড়লো বিকেলের একঝলক রোদ।

'কি চাই?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো হ্যাম।

জোরালো শোনালো নিকির গলা, 'আমি। হোণ্ডাটা নিতে এসেছি।'

'টিকেট দেখি?'

'এই যে।'

সরে গেল বুট। একটা মিনিট চুপ করে রইলো কিশোর। মিনিট এতো লম্বা তার কাছে খুব কমই লেগেছে। মনে হলো একটা দিন পেরোলো। গড়িয়ে গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে এসে তাকালো। দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে হ্যাম। নিকি দাঁড়িয়ে রয়েছে রোদের বর্শায় পিঠ দিয়ে।

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। হাত নাড়লো। তারপর ঝপ করে বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো গাড়িটার দিকে। আশা করলো, নিকি তাকে দেখতে পেয়েছে। কোনোভাবে কিছুক্ষণ আটকে রাখবে হ্যামকে, কিশোরকে গাড়িতে চড়ার সুযোগ করে দেবে।

'ছ'টায় বন্ধ করি আমরা,' হ্যামের গলা শোনা গেল। 'এখন গাড়ি নিলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। কালকের আগে রাখতে পারবেন না।'

'কালকের আগে রাখার দরকারও নেই। ফোন আছে?'

'ওখানে। দেয়ালে।'

'দেখিয়ে দেবেন, প্লীজ?'

'একশো টাকা দিয়েই মাথা কিনে ফেলেছেন মনে হয়!' রেগে গেল হ্যাম।

তবে এই কথাবার্তায় সময় গেল। হোণ্ডায় এসে উঠতে পারলো কিশোর। ফোন করতে আর গেল না নিকি। মিথ্যে কথা বলেছে। গাড়িতে এসে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিয়ে গেল দরজার কাছে। জানালার কাছে ঝুঁকে এলো হ্যাম। 'ছটার মধ্যে ফিরতে না পারলে কাল, মনে থাকে যেন।'

'কাল কখন?'

'সকাল সাতটায়। তখন আমার ডিউটি নেই। অন্য লোক খুলবে।'

যেন এটা একটা সাংঘাতিক রসিকতা, হেসে উঠলো নিকি। হ্যাম হাসলো না। এমন একটা ভঙ্গি করলো, যেন সকাল সাতটায় না আসাটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার।

বাইরে গাড়ি বের করে নিয়ে এলো নিকি। জিজ্ঞেস করলো, 'কিশোর, তুমি

ঠিক আছো?'

'আছি। কোনো লাভ হয়নি। কিছু দেখিনি।'

পেছনে বন্ধ হয়ে গেল গ্যারেজের দরজা। মোড়ের কাছে এসে পেছন থেকে বেরিয়ে নিকির পাশে বসলো কিশোর। 'কার ওয়াশে টিবুরন এসেছে?'

'এসেছে। পাঁচটার পর।'

ইয়ার্ডে পৌঁছেই হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো দু'জনে। মজুরির টাকা গুনছে মুসা। রেখে দিলো তিন গোয়েন্দার তহবিলে। রবিনকে ফোন করলো কিশোর। অফিসেও পাওয়া গেল না, বাড়িতেও না। কাজেই তাকে বাদ দিয়েই আলোচনায় বসতে হলো।

'আজ যা যা করেছি,' কিশোর বললো। 'কালও ঠিক তা-ই করবো। মুসা যাবে কার ওয়াশে। নিকি ভাই টিবুরনের গাড়ি নষ্ট করার চেষ্টা করবে। আমি নজর রাখবো গ্যারেজে।'

'কালও যদি পাঁচটার পর আসে,' নিকি বললো। 'কিছু করতে পারবো না। আজকের মতোই বেকার!'

পরদিন আগেই হাজির হলো টিবুরন। কিন্তু খোলসে ঢাকা লো-রাইডারের এঞ্জিন বিকল করতে পারলো না নিকি। কিশোর ওদিকে সারাদিন গ্যারেজে নজর রেখেও কিছু আবিষ্কার করতে পারলো না। একটা ব্যাপারেই শুধু অগ্রগতি হলো। মুসার হাসিখুশি আচরণ আর কাজের ক্ষমতা টিবুরনের নজর কাড়লো। পকেটে লুকানো ওয়াকিটকি মেসেজ পাঠালো। নিকিও শুনতে পেলো কথা।

'তুমি ছেলেটা খুব ভালো,' টিবুরন বললো। মুসা নিগ্রো না হয়ে শাদা চামড়ার আমেরিকান হলে অবশ্য এতো সহজে কথা বলতে আসতো না। 'তোমার জন্যে বেশি মাইনের একটা কাজ ঠিক করলে কেমন হয়?'

মুসা বললো, হলে খুবই ভালো হয়। কিন্তু সেদিন আর কিছু ঘটলো না। সময় চলে যাচ্ছে। ওদের স্কুলের ছুটি আছে আর মাত্র তিনদিন। আর নিকিও বেশিদিন মুক্ত থাকবে না।

তবে তার পরদিন সুযোগ পেয়ে গেল নিকি। সেদিন সকাল সকাল এসে হাজির হলো টিবুরন আর পিরানহারা। থামলো ট্যাকো বেলের সামনে। ভেতরে ঢুকে তর্ক জুড়ে দিলো শুরুতেই। কে কি খাবে এই নিয়ে। সময় পেলো নিকি। টুক করে গিয়ে ঢুকে পড়লো টিবুরনের লো-রাইডারের নিচে। দুটো তার কেটে দিলো। তারপর ওয়াকি-টকিতে মুসাকে বলে দিলো কি করতে হবে।

টিবুরন বেরিয়ে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলো। স্টার্ট নিলো না এঞ্জিন। কার ওয়াশে থেকে মুসা দেখতে পেলো সে আর পিরানহারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। প্রথমে গেল কার ওয়াশের মালিক। তারপর একজন বয়স্ক কর্মচারী। অবশেষে চিৎকার করে ডাকলো, 'এই, তুমি, নিগ্রো ছেলেটাকে ডাকছি...এদিকে এসো।'

একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে ট্যাকো বেলের দিকে এগোলো মুসা।

আমি?'

'হ্যাঁ। দেখা যাক কত বড় মেকানিক তুমি। চালু করে দাও তো গাড়িটা।'

খোলা হুডের ওপরে এসে ঝুঁকলো মুসা। এঞ্জিনের এটা ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলো কিছুক্ষণ। ব্যাটারি দেখলো, স্পার্ক প্লাগ দেখলো, কয়েকবার করে স্টার্ট দিতে বললো টিবুরনকে। তারপর টিবুরন যখন বিরক্ত হয়ে তার আশা প্রায় ছাড়তে বসেছে এই সময় বলে উঠলো মুসা, বুঝতে পেরেছে গোলমালটা কোথায়। গাড়ির নিচে ঢুকে গেল সে। তারগুলো দেখতে পেলো। সেখান থেকেই ডেকে বললো, 'এই একটা হাফ-ইঞ্চি রেঞ্চ এনে দেবেন কেউ?'

কার কাছে যন্ত্রপাতি আছে খোঁজ পড়ে গেল। কার ওয়াশের মালিক অফিস থেকে এনে দিলো যন্ত্রটা। আসলে ওটার দরকার নেই মুসার। তবু কাজ দেখানোর জন্যে এই ভাবভঙ্গি করতে লাগলো সে। বেশ কিছুক্ষণ খুটুর খাটুর করে শেষে বেরিয়ে এলো। কপালের ঘাম মুছে বললো, 'দেখুন তো এবার।'

সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন।

'বাহ্, ভালো কাজ জানো তো,' প্রশংসা করলো টিবুরন। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালো মুসার দিকে। 'কিছু জানাশোনা লোক আছে আমার, মেকানিক খুঁজছে। দেখি আলাপ করে। ভালো বেতন দেবে। কতো বেশি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তবে, কিছু গোপন ব্যাপার-স্যাপার আছে। মুখ বন্ধ রাখতে পারবে তো?'

'পারবো,' রাজি হয়ে গেল মুসা।

গাড়িতে শুয়ে থাকতে থকতে ঝিমুনি এসে গেল কিশোরের। এই সময় কানে এলো গ্যারেজের দরজার কাছে কেউ কথা বলছে।

'গাড়ি থেকে একটা জিনিস বের করে নিতে এলাম।'

'এতো বার বার আসেন কেন? এভাবে আসাটা পছন্দ করে না এখানে কেউ,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো হ্যাম।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে কিশোর। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

এমন ভাবে ঝুঁকে রয়েছে নিকি, যেন গাড়ির ভেতরে কিছু খুঁজছে। 'কাজ হয়ে গেছে। মুসাকে চাকরি দিয়ে ফেলেছে টিবুরন। বলেছে, একটা লোক এসে তাকে কাজের জায়গায় নিয়ে যাবে।'

'কখন?'

'আজকেই কোনো একসময়। এখানেই কোথাও চপ শপটা থাকলে ওকে দেখতে পাবে।'

নিকি চলে গেলে আবার অপেক্ষা করতে লাগলো কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এমন একটা জায়গায় বসলো, যাতে দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে, দেখতে পারে।

এক ঘন্টা পেরোলো। দুই ঘন্টা। পাঁচটা বাজলো। ছ'টা। কিশোরের কানে এলো দরজা লাগিয়ে তালা দিচ্ছে হ্যাম। কিন্তু তখনও মুসার দেখা নেই। কেউ

নিয়ে এলো না তাকে। তবে কি ভুল করলো ওরা? চপ শপটা নেই এখানে?

হঠাৎ সংকেত দিতে আরম্ভ করলো কিশোরের ওয়াকি-টকি। সুইচ টিপে দিলো সে। কানে এলো নিকির কণ্ঠ, 'কিশোর! সর্বনাশ হয়েছে! গোলমাল হয়ে গেছে! ভীষণ গোলমাল!'

চোদ্দ

'আমি তো আটকে পড়েছি,' কিশোর বললো। 'কি করে সাহায্য করবো? তালা দিয়ে চলে গেছে।'

নিকি বললো, 'ছোট দরজাটা দিয়ে বেরোতে পার কিনা দেখ।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো কিশোর। ম্লান আলোকিত গ্যারেজে গাড়ির সারির ভেতর দিয়ে এগোলো দরজার দিকে। বড় দরজাটা খোলার উপায় নেই, এমন ভাবে তালা লাগানো। তবে ছোটটা খোলা গেল। ভেতর থেকে শুধু হুড়কো আটকানো, আর কিছু নেই।

বেরিয়ে এলো সে।

'জলদি গাড়িতে ওঠো!' নিকি বললো।

'হয়েছে কি?'

গম্ভীর হয়ে আছে নিকি। 'মিনিট পনেরো আগে ছুটতে ছুটতে এসে ইয়ার্ডে হাজির হয়েছে রবিন। নিরা না কি নামের একটা মেয়ে, লিও গোয়েরার ওখানে কাজ করে। সে নাকি টিবুরনকে বলে দিয়েছে তিন গোয়েন্দার কথা। ওই মেয়েটা যে টিবুরনের গার্লফ্রেণ্ড, রবিন জানতো না। এখন টিবুরনের কানে যদি কথাটা কোনোভাবে চলে যায়?'

স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'রবিন একথা জানলো কি করে?'

'টিবুরনের আরও খোঁজখবর বের করার জন্যে নিরার ওখানে গিয়েছিলো। কথায় কথায় সব বলে দিয়েছে মেয়েটা।'

'বেশি কথা বলে! কিন্তু মুসাকে চিনবে কি করে নিরা?'

'রবিনের সঙ্গে দেখেছে। আগে।'

'মুসা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'তাকে নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। টিবুরন ফিরে এসে কথা বললো তার সঙ্গে। আমার দিকে ফিরে বুড়ো আঙুল তুলে বোঝালো মুসা, সে যাচ্ছে। কাজ হয়ে গেছে। তারপর ফিয়ারোতে করে টিবুরনকে নিয়ে চলে গেল।'

ইয়ার্ডে ঢুকে দেখা গেল রবিনের ফোক্সওয়াগেনের পাশে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা টয়োটা করোলা। হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো কিশোর আর নিকি। দেখলো, জিনা বসে রয়েছে।

'আরে, জিনা?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো কিশোর।

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছে,' জবাব দিলো রবিন। 'ওর গাড়িটাও চুরি হেয়ে গেছে। সেদিন যে জাগুয়ারটা দেখেছিলে, সেটা।'

'কখন?'

'আজ সকালে,' জিনা বললো। 'ইস্, কি ভালোই না ছিলো গাড়িটা! একেবারে নতুন। অনেক বলেকয়ে বাবার গাড়িটা নিয়ে এসেছি। কিশোর, দাও না আমার গাড়িটা বের করে!'

'এ-জন্যেই এসেছো?'

'কেন, আসার জন্যে এর চেয়ে বড় কারণ থাকতে হবে?'

'না, না, তা নয়...'

'শোনো, চোরগুলোকে আমাদের ধরতেই হবে,' জোর গলায় বললো জিনা। রবিনের কাছে আমি সব শুনেছি।'

'ও। জিনা, এ আমার খালাতো ভাই,' নিকির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো কিশোর। 'নিকিভাই ও জরজিনা পার্কার। অনেক কেসে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে।'

ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলো কিশোর। বললো, 'আসল কথায় আসি। মুসা তো চলে গেছে। যা শুনলাম, বিপদে পড়তে পারে। ওকে এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু কিভাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে দেয়ালের দিকে। যেন ওটার ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে মুসা কোথায় আছে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। আনমনে যেন নিজেকেই বলতে লাগলো, 'ধরা যাক, চপ শপে নিয়ে গেছে মুসাকে। তাতে আমাদের সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। চপ শপটা কোথায় তা-ই জানি না এখনও। ওটা বের করতে হবে,' দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরালো। একে একে তাকালো সবার দিকে। 'ফ্রীওয়ে গ্যারেজে নেই একথা বলতে পারবো না। থাকতেও পারে। কিন্তু জানি না কোথায় আছে। ভেতরে ঢুকে খুঁজতে হবে আবার।'

'আচ্ছা, শোনো,' নিকি বললো, 'ধরলাম ভেতরে আছে মুসা। আর চপ শপটা রয়েছে গ্যারেজের ভেতরে। কিন্তু ঢোকার দরকার কি? বাইরে থেকে যোগাযোগ করলেই পারি। ও আমাদেরকে বলতে পারবে না?'

'কি করে?' ভুরু কোঁচকালো জিনা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'তার কাছে ওয়াকি-টকি আছে!' তার পরেই নিরাশ হয়ে গেল আবার। 'না, উচিত হবে না। ওয়াকি-টকিতে কথা বলতে গেলে বিপদে পড়ে যেতে পারে। একা না-ও থাকতে পারে সে। কাছাকাছি লোক থাকলে ধরা পড়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তবে সেটা কার্যকরী করতে হলে টিবুরন আর পিরানহাদেরকে শহরের বাইরে থাকতে হবে। রবিন, তুমি জানতে পারবে...'

'পারবো কি, জানিই তো?' বলে উঠলো রবিন। 'আসলে আমাদের ভাগ্যটাই ভালো। এমনিতেই ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম, নিরার কাছে।

মালিবুতে গেছে গান গাইতে ।'

'ঠিক ভাগ্যও বলতে পারবে না একে,' কিশোর বললো। 'ওই যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, চান্স ফেভারস দা প্রিপেয়ার্ড মাইণ্ড। এমনিতে যাওনি। এতো বছরের গোয়েন্দাগিরির অভ্যাসই তোমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো। অবচেতন মন বলছিলো, খোঁজ নাও, কাজে লাগতে পারে।'

'যাই হোক, কাজ তো হলো। ওরা শহরের বাইরে থাকলে কি লাভ?'

'একটা জুয়া খেলতে চাই। দেখতে চাই, শুধু মারসিডিজটাই একমাত্র গাড়ি নয়, যেটা আলাদা ভাবে নিজে নিজে চুরি করেছে টিবুরন। আর, একা টিবুরনই বডিগায় গাড়ি পাঠায় না, আরও লোক আছে। অর্থাৎ তার মতো দলছুট একলা চোর আরও আছে। কমলা ক্যাডিলাকটা নিয়ে গিয়ে পেজকে দিতে দেখেছি।'

নিকি তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। 'এসব বলছো কেন?'

'টিবুরন শহরের বাইরে,' কিশোর বললো। 'একটা গাড়ি নিয়ে বডিগায় চলে যেতে পারি আমরা। পেজের কাছে হস্তান্তর করতে পারি। আমাদের ভাগ্য ভালো হলে সেটা নিয়ে গ্যারেজে চলে যাবে সে।'

'তাতে লাভ?' জিনার প্রশ্ন।

'গাড়িতে লুকিয়ে থাকবো আমরা দু'জন,' কিশোর বললো। 'এই প্ল্যানটার কথা আগেও ভেবেছি আমি। তখন বেশি রিস্কি মনে হয়েছিলো। কিন্তু মুসাকে বাঁচাতে হলে এখন আর উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়িতে লুকিয়ে থাকবে কে কে?'

'তুমিই একমাত্র লোক, যাকে পেজ চেনে না। তুমি গাড়ি চালাবে। আমি আর নিকিভাই পেছনে লুকিয়ে থাকবো।'

'গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে এসে কি করবো?'

'নিজের গাড়িতে চড়ে পেজকে ফলো করবো।'

'চোরাই গাড়িটাও আমি চালাবো। তাহলে আমার গাড়িতে করে তাকে অনুসরণ করবো কিভাবে?'

'জিনা ওটা নিয়ে যাবে, আমাদের পেছন পেছন। তুমি যখন ডেলিভারি দেবে, সে তখন লুকিয়ে থাকবে কাছেই কোথাও।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে কথাটা ভেবে দেখলো রবিন।

'কিন্তু গাড়ি কোথায় পাবো, কিশোর?' নিকি জানতে চাইলো। 'আমাদের যেসব গাড়ি আছে, সেগুলো চুরি করতে আসবে না ওরা। নতুন, ভালো গাড়ি দরকার।'

জিনার দিকে তাকালো কিশোর। 'জিনার বাবার গাড়িটা নেবো। ওটা নতুন। কি জিনা, অসুবিধে আছে?'

'আরে না না, নিয়ে যাও। শয়তানগুলোকে ধরা দরকার। বাবা কিছু বলবে না।'

'আমি জানতাম,' হাসলো কিশোর। 'তুমি আসায় ভালোই হলো, জিনা।'

'কিংবা বলো,' হাসলো জিনা, 'আমার গাড়িটা চুরি হওয়ায় ভালো হলো।

তবে একটুও চিন্তা করছি না আর। তিন গোয়েন্দা যখন খুঁজতে শুরু করেছে, গাড়ি আমার পাবোই। যদি ইতিমধ্যেই খুলে ফেলে না থাকে।'

'দেখা যাক। তারপর যাবো টিবুরনকে পরখ করতে।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালো সে। 'মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। মাঝরাতে যাবো ওর কাছে।'

মাঝরাতের পাঁচ মিনিট আগে রওনা হলো ওরা। চকচকে টয়োটাটা এসে ঢুকলো বডিগার সীমানায়। এখনও খোলা রয়েছে দোকান।

ট্রাঙ্কে ঢুকেছে কিশোর। ওখানে দু'জনের জায়গা হবে না। তাই নিকি শুয়ে পড়েছে পেছনে, মেঝেতে। গাড়ি ঢোকার একটা তেরপল টেনে দিয়েছে গায়ের ওপর। রবিন একটা বেজবল ক্যাপ মাথায় দিয়েছে, চোখে লাগিয়েছে চমশা। তবে কাঁচগুলোতে পাওয়ার নেই। ওদের পেছনে তার ফোক্সওয়াগেনে বসে রয়েছে জিনা।

হর্ন টিপলো রবিন। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো পেজ আর তার দুই দেহরক্ষী, পিকো এবং রিয়ানো। তাকিয়ে রইলো চকচকে গাড়িটার দিকে। জানালা দিয়ে মুখ বের করলো রবিন। 'শুনে যান। টিবুরন পাঠিয়েছে আমাকে।'

কাছে এলো তিনজনে।

'মালিবুতে দেখা। বললো, তার ভাইয়ের এই গাড়িটা এখানে পৌঁছে দিতে। একাজের জন্যে একশো ডলার দিয়েছে আমাকে। আপনিই তার ভাই?'

মাথা ঝাঁকালো পেজ। 'হ্যাঁ। গাড়ি রেখে চলে যাও।'

'শহর তলীতে যাবো। যদি পৌঁছে দিতেন কাউকে দিয়ে।'

'ট্যাক্সি ডেকে চলে যাও। তোমার পাওনা তোমাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাও, নামো।'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন গাড়ি থেকে নামলো রবিন। চকচকে টয়োটাটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মাথা নাড়লো বিষণ্ন ভঙ্গিতে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো পেজ আর তার দুই গুণ্ডা। একজন বললো, 'আরে, একটা তেরপলও রয়েছে ভেতরে।'

হাসলো পেজ। 'অসুবিধে কি? তেরপলের কি দাম নেই? বাড়তি পাওনা,' ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুললো। 'এখুনি নিয়ে যাই। ফেলে রাখা ঠিক হবে না। কখন পুলিশ এসে আবার হানা দেয়।' একটু থেমে বললো, 'এবারে ঠিকঠাক মতোই সারতে পারলো টিবুরন। আগের বারের মতো ঘাপলা বাধায়নি।'

গাড়িতে উঠলো রবিন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিনা জানতে চাইলো, 'সব ঠিক আছে তো?'

'পেজ বিশ্বাস করেছে।'

'ওই যে, চললো,' হাত তুললো জিনা।

'চালাও।'

'তোমার গাড়ি, তুমি চালাও। এটা একটা গাড়ি হলো নাকি? জগদ্দল পাথর!'
রাস্তার ওপর দিয়ে যেন পিছলে চললো টয়োটা। সেই তুলনায় রবিনের আদিম ফোক্সওয়াগেন যেন সত্যিই পাথর। তবে পিছে লেগে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো রবিন। তার আশঙ্কা, এঞ্জিন বন্ধ না হয়ে গেলেই হয় এখন।

যতো ভালো রাস্তায়ই হোক, গাড়ির ট্রাঙ্কে থাকাটা একটা ভয়াবহ যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে কিশোর। ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে, খোয়া বিছানো রাস্তায় চললে কি অবস্থা হবে! অবশেষে একসময় থামলো গাড়ি। হর্ন বাজালো পেজ, একবার লম্বা, দু'বার খাটো, একবার লম্বা, একবার খাটো।

দরজা খোলার শব্দ হলো। ভেতরে ঢুকলো গাড়ি।

'এটা বাড়তি,' কাকে যেন বললো পেজ। 'টিবুরন পাঠিয়েছে।'

'বস্ শুনলে খুব রাগ করবে। মারসিডিজটাই যথেষ্ট ভুগিয়েছে আমাদের,' হ্যামের কণ্ঠ চিনতে পারলো কিশোর।

প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে লোক ঢুকলো ভেতরে। তারপর আবার চলতে শুরু করলো গাড়ি। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কিসে যেন উঠতে গিয়ে ঝাঁকুনি খেলো, দুললো, তারপর স্থির হয়ে গেল।

ঘড়ঘড় ঘটাংঘট, নানারকম শব্দ হলো। এলিভেটরের কাঠের দরজা বন্ধ হয়েছে। ওপরে উঠতে শুরু করেছে দোলনার মতো লিফটটা।

ভেতরে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কিশোর, কতোটা ওপরে উঠছে। কিন্তু বোঝা গেল না। এভাবে বুঝতে পারার কথাও নয়।

থামলো এলিভেটর। স্টার্ট নিলো টয়োটা। চলতে শুরু করলো খুব ধীরে। পেছন দিকে।

'হারিয়ে ফেললে তো, রবিন!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো জিনা।

'যাবে কোথায়? ওই মোড়টার ওপাশেই আছে হয়তো,' বললো বটে রবিন, কিন্তু তার গলায় জোর নেই।

আশা করেনি সে, তবে সত্যিই পেয়ে গেল। একটা লাল ইঁটের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে টয়োটাটা।

'আমাদের দেখেনি তো?' উদ্বেগ কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না জিনা।

'দেখলে কি হবে? রাস্তায় কতো গাড়িই তো থাকে। আমার গাড়িটা চেনে না পেজ।'

এককোণে নিয়ে গাড়ি রাখলো রবিন। ফিরে তাকিয়ে দেখলো গ্যারেজের দরজা দিয়ে টয়োটাটা ঢুকে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা দরজার কাছে এগোতে এগোতে পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

'এবার কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো জিনা।

পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করলো রবিন। ঢুকিয়ে দিলো ছোট দরজাটার পাল্লা আর ফ্রেমের ফাঁকে। আধ মিনিটের মধ্যেই ভেতরের হুড়কো তুলে

ফেললো। জিনাকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ম্লান আলোকিত গ্যারেজে।

'এখানেই কিশোরের গাড়িটা কোথাও আছে,' রবিন বললো। 'জিনা, তোমাদের গাড়িটা কোথায় দেখ তো।'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে মাথা নাড়লো জিনা, 'কই? নেই তো!'

'চুপ! আস্তে!'

শব্দ করতে করতে নেমে এলো এলিভেটর। জিনার হাত ধরে একটানে গাড়ির সারির আড়ালে নিয়ে গেল রবিন। বসে পড়লো মেঝেতে। গাড়ির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলো এলিভেটরের দিকে। আনতিনো পেজ নেমে এসে সরু গলিপথ ধরে হেঁটে চলে গেল সামনের দরজার দিকে।

উঠে পড়লো জিনা আর রবিন। এলিভেটরের দিকে এগোলো।

'নিশ্চয় ওপরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' শ্যাফট দিয়ে ওপরে তাকিয়ে বললো জিনা।

'কিশোরের ধারণা, চপ শপটা এবাড়িতেই কোথাও আছে,' রবিন বললো। 'কোথায়?'

পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'চপ শপের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে ভুল করলে মিলফোর্ড। গানবাজনা নিয়েই থাকা উচিত ছিলো তোমার।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো দু'জনে। লিও গোয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে একটা কুৎসিত দর্শন পিস্তল। পাশে আরেকজন মোটা লোক। তার হাতের পিস্তলটা দেখতে আরও ভয়ংকর।

পনের

কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দই কানে এলো না কিশোরের। তারপর হঠাৎ করেই নানারকম ধাতব শব্দ শুরু হলো একযোগে। তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের দেয়ালে টোকা দিলো কিশোর। 'নিকিভাই?'

ধাতব দেয়ালের অন্যপাশ থেকে মৃদু ভাবে শোনা গেল নিকির কণ্ঠ, 'তুমি ঠিক আছো?'

'আছি। কোথায় আছি বলতে পারবেন?'

'দাঁড়াও, দেখি।'

অপেক্ষা করতে লাগলো কিশোর।

'আরেকটা গ্যারেজে এসে ঢুকেছি মনে হচ্ছে,' জানালো নিকি। 'অন্য ফ্লোরগুলোর মতো বড় নয়। এককোণে রাখা হয়েছে গাড়িটা। ঘরের ওপাশে একটা মাজেরাটি নিয়ে কাজ করছে তিনজন লোক। একজনকে মুসার মতো লাগলো।'

'বের করুন আমাকে।'

ট্রাঙ্কের তলায় চাবি ঢোকানোর মৃদু শব্দ হলো। উঠে গেল ডালা। দ্রুত বেরিয়ে এলো কিশোর। বসে পড়লো গাড়ির পাশে। ডালা নামিয়ে নিকিও বসলো।

লাল একটা গাড়ি খুলছে তিনজন লোক। দেখতে দেখতে খুলে ফেললো বডিটা। বেরিয়ে পড়লো গাড়ির কঙ্কাল।

তিনজনের একজন মুসা, কোনো সন্দেহ নেই।

'বাপরে বাপ, কি তাড়াতাড়ি খুলছে!' নিচু গলায় বললো নিকি।

'এসব করতে করতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে,' বললো কিশোর। 'যতো বেশি লোক হয়, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারবে। সেজন্যেই মুসাকে নিয়েছে ওরা। দূরেই রয়েছে ওই দু'জনের কাছ থেকে। ওয়াকি-টকির শব্দ মনে হয় ওরা শুনবে না।'

কাজ করছে আর কথা বলছে মেকানিকেরা। একজনের পকেটে ঠেলে রয়েছে একটা জিনিস। পিস্তলের বাঁট, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোর কিংবা নিকির।

ওয়াকি-টকির সুইচ টিপলো কিশোর। মুসার যন্ত্রে সামান্য একটা শব্দই সতর্ক করে দিলো তাকে। তবে চমকে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালো না। আগের মতোই কাজ করে চলেছে। তবে একজন মেকানিক মুখ তুললো। 'কিসের শব্দ?'

মাথা তুললো মুসা। 'আমার ঘড়ি। ডিজিটাল অ্যালার্ম। টাইম দিয়ে রেখেছিলাম। টিভিতে একটা শো আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কটা বাজে?'

'প্রায় সাড়ে বারো।'

'হাত চালাও, হাত চালাও। এটার পর টয়োটাটা খুলতে হবে,' জিনার বাবার গাড়িটা দেখালো সে। 'যে কোনো সময় টিবুরন এসে হাজির হতে পারে, আরও একগাদা নিয়ে।'

'খাইছে! এতো রাতে গাড়ি আনে?'

হেসে উঠলো অন্য দু'জন।

'এটা তো আপনারাই করছেন,' মুসা বললো। 'আমি টয়োটাটা গিয়ে ধরবো?'

'ধরো। নিয়ে এসো এখানে।'

টয়োটার কাছে এসে পড়লো মুসা, যেন গাড়ি পরীক্ষা করতে বসেছে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ওখানে? নিকি ভাই?'

'আমিও আছি,' কিশোর জবাব দিলো। 'জিনাদের গাড়ি এটা। সে আর রবিন বাইরে অপেক্ষা করছে। এটাই চপ শপ?'

'হ্যাঁ। মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে আমাকে। কিছু গাড়ি নাকি খারাপ হয়েছে। গোলমাল আছে। সেজন্যে খুলে ফেলা হবে ওসব গাড়ি। পার্টস খুলে বিক্রি করে ফেলা হবে।'

'দু'জনের কাছেই পিস্তল আছে?' নিকি জিজ্ঞেস করলো।

'না। একজনের কাছে।'

'তোমরা তিনজনই, না আরও মেকানিক আছে?'

সামনের দরজাটা খোলার জন্যে হাত বাড়ালো মুসা। 'আছে। এই গ্যারেজের সবাই চোরদের কাজ করে, টাকার জন্যে। মালিক জানে না এসব। সেদিন যে দুপুরবেলা হঠাৎ করে সবাইকে চলে যেতে দেখেছি, আসলে এখানে

চলে এসেছিলো। কমলা ক্যাডিলাকটা তাড়াতাড়ি খুলে দেয়ার জন্যে। ঝড়ের গতিতে কাজ করে ব্যাটারা।'

'চলো, ধরে নিয়ে যাই এই দু'জনকে,' কিশোর বললো। 'দেরি করলে টিবুরনের দল চলে আসতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালো মুসা।

'এই, এতো দেরি করছো কেন?' ডেকে বললো একটা লোক। 'এখানে নিয়ে এসো। আলোতে।'

'আনছি,' বলে গাড়িতে চড়লো মুসা। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। তারপর এগিয়ে চললো শামুকের গতিতে। ততোক্ষণে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কিশোর আর নিকি। একজন শুয়ে পড়লো মেঝেতে। আরেকজন পেছনের সীটে।

হঠাৎ ঘড়ঘড় করে ভারি শব্দ হলো। আলিবাবার জাদুর পাহাড়ের মতো যেন খুলে গেল দেয়ালের একপাশ।

'দরজা!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'এলিভেটরের শ্যাফটের পেছনে। আরেকটা ঘর। এটা দিয়েই ঢোকে।'

দেয়াল নয় আসলে। ইঁটের মতো রঙ করা কাঠের দরজা। দেখলে দেয়াল বলেই ভুল হয়।

'যে বাড়ি দিয়ে ঢুকেছি,' নিকি বললো। 'এটা সে বাড়ি নয়। পাশেরটা। একটা গোপন পথ আছে, দরজা খুললে দেখা যায়।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা।

লিও গোয়েরা আর হ্যাম ঢুকেছে। তাদের আগে আগে পিস্তলের মুখে রয়েছে রবিন আর জিনা। নিকি দেখে বললো, 'যা করার লোক কম থাকতেই করতে হবে। টিবুরনরা চলে এলে আর পারা যাবে না।'

'কিন্তু পিস্তল আছে তো ওদের কাছে,' কিশোর বললো।

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। গাড়ি থামিয়ে ফেললো। কি করবে? রবিন আর জিনাকে মেকানিকদের কাছে নিয়ে চলেছে গোয়েরা। কঠিন হয়ে গেছে চেহারা। 'ওবাড়িতে ধরলাম,' প্রায় গর্জে উঠলো সে। 'চপ শপটা খুঁজছিলো। ভাগ্য ভালো, পায়নি।'

'আমরা না পেলে কি হবে,' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলো রবিন, 'অন্যেরা পেয়ে গেছে। জানে। নিকি পাঞ্চ গেছে পুলিশ আনতে।'

'নিকি? মারসিডিজ চালিয়ে এনেছিলো যে ওই লোকটা?' হ্যাম বললো।

'গাধাগুলোকে আগেই বলেছিলাম,' আবার গর্জে উঠলো গোয়েরা, 'নিজে নিজে গাড়ি চুরি না করতে।'

'করলো তো মাত্র তিনবার।'

'তিনবারেই তো সর্বনাশ করে দিয়েছে! এখন এ'দুটোর ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হচ্ছে,' এদিক ওদিক চোখ বোলালো সে। 'নুতন ছেলেটা কোথায়?'

'ওই যে,' হাত তুললো এক মেকানিক। 'টয়োটাটার ভেতরে।'

নিচু গলায় কিশোর আর নিকিকে বললো মুসা. 'তৈরি থাকো। দেখে ফেলতে

পারে,' ধীরে ধীরে আবার গাড়িটা সামনে বাড়ালো সে।

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে গোয়েরা বললো, 'টয়োটা!'

'আধ ঘন্টা আগে পেজ এনে রেখে গেছে,' মেকানিক জানালো। 'টিবুরন নাকি পাঠিয়েছে।'

'নাহ, আর পারি না! কতোবার মানা করেছি...' মাথা নাড়তে লাগলো গোয়েরা।

এগিয়ে চলেছে মুসা। মাজেরাটিটার কাছে মেকানিকদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গোয়েরা আর হ্যাম। রবিন এবং জিনাকে সামনে পিস্তলের মুখে রেখেছে।

'কোথায় রাখবো?' জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

উজ্জ্বল হলো জিনা আর রবিনের মুখ।

'এই ছেলেটা এখানে কেন?' খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে আনতিনো পেজ। 'একটু আগে ও-ই তো টয়োটাটা নিয়ে এসেছিলো...'

'মুসা, শুরু করো!' চিৎকার করে উঠলো কিশোর।

গ্যাস প্যাডালে আচমকা চাপ বাড়িয়ে দিলো মুসা। লাফ দিয়ে সামনে এগোলো টয়োটা। টায়ারের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সোজা ছুটলো মাজেরাটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোকের দিকে।

ষোল

বরফ হয়ে গেছে যেন লোকগুলো। আতঙ্কে পিস্তল চালাতেও ভুলে গেছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে গাড়িটার দিকে।

তারপর হঠাৎ করেই যেন সচকিত হয়ে উঠলো। যে যেদিকে পারলো ডাইভ দিয়ে পড়ে বাঁচার চেষ্টা করলো। হাত-পা ভাঙে ভাঙুক, পরোয়া নেই, কিন্তু টয়োটার গুতো খেয়ে কিংবা চাকার নিচে পড়ে মরতে চায় না।

হ্যাম গিয়ে পড়লো একটা এঞ্জিন কেসিঙের ওপর। চোখা ধাতুতে কনুই লেগে ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো। পিস্তলটা হাত থেকে খসে গেল।

দু'জন মেকানিক পড়লো একজন আরেকজনের ওপর। যে লোকটার পকেটে পিস্তল ছিলো, সে-ও বের করতে পারলো না, তার আগেই খুইয়ে ফেললো। পড়ার সময়ই পকেট থেকে বেরিয়ে খুলে রাখা মাজেরাটির যন্ত্রাংশের স্তুপের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

মাথা ঠাণ্ডা রাখলো একমাত্র গোয়েরা। মেঝেতে পড়েই এক গড়ান খেলো, তারপর হাত তুলে পিস্তল উঁচু করে মুসাকে সই করে গুলি ছুঁড়তে গেল।

ধাক্কা দিয়ে জিনাকে একপাশে সরিয়ে দিলো রবিন। লাথি মারলো গোয়েরার পিস্তল ধরা হাতে। ছুটে গেল পিস্তলটা। মেঝেতে পড়ে পিছলে চলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে রবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল গোয়েরা। চোখের পলকে কনুই তুলে গোয়েরার মাথার একপাশে ঠেকিয়ে দিলো রবিন। ঝপাত করে আবার মেঝেতে

পড়ে গেল লোকটা।

মাজেরাটির কঙ্কালের কাছে এসে থেমে গেল টয়োটা। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে এলো মুসা। উঠতে যাচ্ছিলো গোয়েরা, আবার তাকে চিৎ করে ফেললো।

এতোগুলো ঘটনা ঘটতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। এখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পেজ। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছে। তার দিকে ছুটে গেল নিকি। কয়েক ফুট দূরে থাকতেই মাথা নিচু করে ডাইভ দিলো। পেজকে নিয়ে পড়লো মেঝেতে।

কিশোর ছুটে গেল রবিনকে সাহায্য করতে। আবার উঠে দাঁড়িয়েছে হ্যাম। ঝাঁপ দিলো পিস্তলটা তোলার জন্যে। পাশ থেকে লাথি চালানোর চেষ্টা করলো রবিন, টবি-ইয়োকো-গেরি, লাফিয়ে উঠে লাথি মারার একটা কায়দা। কিন্তু মারটা লাগাতে পারলো না, সরে গেল হ্যাম। ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালো পিস্তলের জন্যে।

তার গায়ের ওপর পড়লো কিশোর। আবার ফেলে দিলো মাটিতে। গাল দিয়ে উঠলো হ্যাম। আবার উঠলো। লাফ দিল কিশোর। পড়লো গিয়ে হ্যামের ওপর। কিশোরের ওপর পড়লো রবিন। গালাগাল করতেই থাকলো লোকটা। কিন্তু উঠতে পারছে না। দু'জনের ভার চেপে রয়েছে তার ওপর।

পরস্পরের জট ছাড়িয়ে দুই মেকানিকও উঠতে শুরু করেছে। থেমে গেল। তাকিয়ে রয়েছে জিনার হাতের দিকে। গোয়েরার পিস্তলটা তুলে নিয়েছে সে। দু'হাতে ধরে নিশানা করেছে ওদের দিকে।

'গুলি করো না, গুলি করো না!' কাঁপা গলায় বললো একজন।

'আমরা নড়বো না!' বললো আরেকজন।

এমন ভঙ্গিতে হাত তুললো জিনার দিকে, যেন বুলেট ঠেকাবে।

তলোয়ার চালানোর মতো করে হাত চালালো মুসা। গোয়েরার সোলার প্লেক্সাস বরাবর। কারাতের এই মারটাকে বলে নুকাইট। হাঁ হয়ে গেল চোরের দলের সর্দার। দম নিতে পারছে না। বুক চেপে ধরে মেঝেতে পড়ে গেল সে। গোঙাতে শুরু করলো।

পেজকে পিটিয়ে কাহিল করলো নিকি। তার পিস্তলটা নিয়ে নিজের বেল্টে গুঁজলো। তারপর এসে জিনার হাত থেকে নিয়ে নিলো অন্য পিস্তলটা।

বৈদ্যুতিক তারের অভাব নেই। একটা বাণ্ডিল খুলে হ্যামের হাত-পা বাঁধলো কিশোর আর রবিন। অসহায় হয়ে মাটিতে পড়ে গালাগাল করতে লাগলো লোকটা। এছাড়া আর কিছু করারও নেই তার। দুই মেকানিক আর পেজকেও বাঁধা হলো। তারপর ফিরলো ওরা গোয়েরার দিকে। এখনও মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে সে। যন্ত্রাংশের মাঝে পড়ে থাকা হ্যামের পিস্তলটা তুলে নিলো রবিন। বললো, 'যাক, অবশেষে ধরতে পারলাম শয়তানগুলোকে।

'প্রমাণও আছে,' খোলা মাজেরাটিটা দেখালো কিশোর।

এই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজায় দেখা দিলো টিবুরন। বলতে বলতে ঢুকছে, 'বস্, আরও··· থেমে গেল। তার পেছনে এসে দাঁড়ালো চারজন পিরানহা। ঘরের ভেতরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে সবাই।

এখনও টিবুরনের পরনে গায়কের শাদা পোশাক পরাই রয়েছে। তার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, 'খেল খতম, টিবুরন। তোমার বস্, হ্যাম, আনতিনো পেজ, সবাইকে আটক করেছি আমরা। সেই সাথে রয়েছে প্রমাণ। পুলিশকেও খবর দেয়া হয়ে গেছে,' শেষের কথাটা মিথ্যে বললো সে।

নিকি আর রবিনের হাতের পিস্তলের দিকে তাকিয়ে বললো টিবুরন, 'দেখ, ভুল করছো। আমি এসব কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু করিনি।'

উঠে বসলো গোয়েরা। হাঁসফাঁস করলো বার কয়েক, তারপর চেঁচিয়ে বললো, 'দাঁড়িয়ে দেখছো কি, গাধার দল! ধরো না এগুলোকে!'

শ্রাগ করলো টিবুরন। 'কি করে? হাতে পিস্তল রয়েছে ওদের। এর বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।'

'দেখছো না, কয়েকটা ছেলে!' ধমক দিয়ে বললো গোয়েরা। 'ওরা কি পিস্তল চালাতে জানে নাকি? ধরো, ধরো!'

'যদি জানে?' হাসলো ল্যাটিনো গায়ক। 'অন্য কথা ভাবছি, বুঝলেন। ভাবছি, দলটাকে টেনে তোলার এটাই উপযুক্ত সময় আমার।'

'অনেক টাকা দিয়েছি আমি তোমাকে! সেগুলো শোধ করবে না? তোমার ওই গাধামিই সর্বনাশ করেছে! কে বলেছে নিজে নিজে চুরি করতে?' টিবুরন আর তার পিরানহাদের মিলিয়ে একটা বিশ্রী গাল দিয়ে বসলো গোয়েরা। এবং ভুলটা করলো।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টিবুরন। পেছনে পিরানহারা বিড়বিড় করে কি বললো, রেগে গেছে ওরাও।

পরিবর্তনটা বুঝে সেটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করলো কিশোর। বললো, 'ও আপনাদের শুধু ব্যবহারই করেছে, বুঝলেন, কখনও ইজ্জত দেয়নি। ছোট করেই দেখেছে। তার কাছে আপনারা শুধুই কাজের যন্ত্র।'

ভুলটা বুঝে গেছে গোয়েরা। লাল হয়ে গেছে মুখ। তাড়াতাড়ি বললো, 'না না, আমি কখনোই ওভাবে দেখি না তোমাদের। সত্যি বলছি। এই ছেলেগুলোকে আটকাও। নাহলে কাজের সুযোগ আর কোনোদিনই পাবে না।'

'দরকারও নেই,' মাথা নাড়লো টিবুরন। 'আমরা বোকা গাধা, না? বেশ, তা-ই। আর কখনো টিবুরন আর পিরানহাদের সাহায্য তুমি পাবে না।' গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলো সে। 'ওর সম্পর্কে সব কথাই বলছি, মন দিয়ে শুনে রাখো, যাতে পুলিশকে বলতে পারো।'

'পুলিশকে বললে কি আর ওরা তোমাদেরও...'

নিকিকে কথাটা শেষ করতে দিলো না কিশোর। বললো, 'বলুন। যা যা জানেন সব বলে যান। আমরা জানি, আপনি শুধু গাড়িগুলো ডেলিভারি দিতেন এখানে। চুরি করতো অন্য লোকে।'

মাথা ঝাঁকালো টিবুরন। 'চালাক ছেলে। হ্যাঁ, চুরি করে নিয়ে খোলস পরিয়ে দিতো। তাতে সময় লাগতো না মোটেও। তারপর রেখে যেতো জায়গামতো, যাতে চালিয়ে নিয়ে আসতে পারি আমরা।'

'লাল মারসিডিজটার ব্যাপারটা কি তাহলে?' গম্ভীর হয়ে আছে নিকি। 'অক্সনার্ডে যেটা চুরি করেছিলে?'

শ্রাগ করলো টিবুরন। 'কয়েকটা গাড়ি আমি একলা চুরি করেছি। ওরা আমার জন্যে রেডি করে রাখেনি। বোকামি করেছি। গোলমালটা আমিই করেছি, বলতে কোনো দ্বিধা নেই।'

কিশোর বললো, 'এসব কথা আদালতে বললে, আর গোয়েরার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিলে, শাস্তি অনেক কমে যাবে আপনার। হয়তো ছেড়েও দিতে পারে। জানেন?'

'ওর কথা শুনো না!' চিৎকার করে বললো গোয়েরা। উঠে দাঁড়ালো। 'সাংঘাতিক চালাক! তোমার মুখ থেকে কথা আদায় করতে চাইছে! শোনো, টিবুরন, আমার কথা শোনো! ভালো হবে! ঠিক আছে, তোমাদের কমিশনও বাড়িয়ে দেবো আমি!'

গোয়েরার দিক থেকে নিকির দিকে ফিরলো টিবুরন, ফিরে তাকালো পিরানহাদের দিকে, তারপর আবার কিশোরের দিকে ফিরে বললো, 'বেশ, চলো, পুলিশের কাছে। সব কথাই বলবো।'

পিস্তল নামালো নিকি। মুসা হাসলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর আর রবিন।

কখন যে নিকির কাছে চলে এসেছে গোয়েরা, লক্ষ্য করলো না কেউ। এক থাবায় তার পিস্তলটা কেড়ে নিলো সে। তারপর লাফ দিয়ে চলে গেল জিনার কাছে। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তার হাত ধরে মুচড়ে নিয়ে এলো পিঠের ওপর। গর্জে উঠলো, 'খবরদার! এক পা এগোবে না কেউ! তাহলে মেয়েটা মরবে!'

কেউ নড়লো না। জিনাকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল গোয়েরা। বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো পাল্লা।

সতের

সকলের আগে নড়ে উঠলো মুসা। দৌড় দিলো দরজার দিকে। টিবুরনকে জিজ্ঞেস করলো, 'খোলে কি করে! জলদি বলুন!'

'আমি বলতে পারবো না। আমরা এলে খুলে দেয়া হতো।'

হেসে উঠলো আনতিনো পেজ। 'ভালো হয়েছে। নিজেরা ভেবে বের করো। নয়তো বসে থাকো।'

'বস্ কি আর তোমাদের মতো ছাগল,' হ্যাম বললো।

দুই মেকানিকের দিকে তাকালো মুসা। মাথা নাড়লো দু'জনে। বলতে পারলো না।

টিবুরনের দিকে তাকালো কিশোর। 'আপনি এখানে ঢুকলেন কিভাবে?'

'ওই ওদিকের অফিস দিয়ে,' টিবুরন জানালো। 'সব সময়ই ওখান দিয়ে বেরোতাম।'

'অফিস? কোথায়?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'চলুন। দেখান।'

কোমরে আরেকটা পিস্তল রয়েছে। সেটা টেনে বের করে নিকি বললো, 'চলো, আমিও যাচ্ছি। রবিন, তুমি থাকো এখানে। ব্যাটারা কেউ নড়ার চেষ্টা করলেই খুলি ছাতু করে দেবে।'

হ্যামের পিস্তলটা রবিনকে দেয়া হলো।

ঘরের এককোণে ওদেরকে নিয়ে এলো টিবুরন। একটা চোরকুঠুরি আছে সেখানে। একটা দরজা দেখা গেল। দেয়ালের একটা বাঁকের জন্যে কাছে না এলে দেখা যায় না দরজাটা।

পাল্লা বন্ধ। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে একটা ছোট ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সেটা ধরে টান দিলো টিবুরন। খুলে গেল দরজাটা।

ছুটে গেল মুসা আর নিকি। ছোট একটা অফিসে ঢুকলো। সেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। দৌড়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। চাঁদ উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে নীলচে শাদা জ্যোৎস্না। সেসব দেখার সময় নেই এখন ওদের। বাড়ির কোণ ঘুরে ছুটলো মুসা, তার ফিয়ারোটা যেখানে পার্ক করা রয়েছে। পেছনে নিকি।

চলে এলো গ্যারেজের সামনের দিকে। এখনও বন্ধ রয়েছে দরজা। 'ভেতরেই আছে!' বলে উঠলো মুসা। 'বেরোয়নি!'

'যদি আর কোনো পথ না থাকে বেরোনোর!'

ছোট দরজাটা টেনে দেখলো মুসা। খোলা। ঢুকে পড়লো গ্যারেজের ভেতরে। এতো বড় ঘরটায় আর কোনো আলো নেই, শুধু একটা বাল্ব জ্বলছে এলিভেটরের কাছে। অন্ধকার। কান পেতে রইলো সে। কিছুই শোনা গেল না।

'চলেই গেল, না-কি!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

নিকিও কান পেতে রয়েছে। 'শুনছো?'

মুসাও শুনতে পেলো। হালকা কোনো জিনিস দিয়ে যেন ধাতব কিছুতে বাড়ি মারা হচ্ছে। এলিভেটরের ডান পাশ থেকে আসছে শব্দটা। 'নখ দিয়ে টোকা দিচ্ছে মনে হয় গাড়ির বডিতে! জিনা!'

গাড়ির সারির ভেতর দিয়ে প্রায় দৌড়ে চললো মুসা। পেছনে নিকি। এলিভেটরের পেছনে একটা গলি। সেখানে এসে থামলো। কান পাতলো আবার।

ডানে দপ করে জ্বলে উঠলো হেডলাইট। ঠিক ওদের ওপর এসে পড়লো আলো। টায়ারের আর্তনাদ তুলে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো একটা গাড়ি।

শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে দু'পাশে সরে গেল নিকি আর মুসা। মিস করলো গাড়িটা। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো। কিন্তু হিসেবের গোলমাল করে ফেললো একটুখানি। নাক দিয়ে ধ্রাম করে বাড়ি মারলো একটা গাড়ির গায়ে।

'রোলস রয়েস!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। তাকিয়ে রয়েছে রূপালি গাড়িটার দিকে।

বিরাট চক্কর নিয়ে নাক ঘোরাতে শুরু করেছে গাড়িটা। আরও কিছু গাড়ির গায়ে বাড়ি মেরে ওগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে আবার এগোতে শুরু করলো

মুসাদের দিকে।

দৌড় দিলো মুসা। তার পেছনে লাগলো রোলস রয়েস। যেদিকেই যায়, সেদিকেই তেড়ে আসে। আরও গাড়ির সর্বনাশ হতে লাগলো। নিজের তো হচ্ছেই। বাম্পার খসছে, ফেণ্ডার ছিঁড়ে খুলে পড়ছে।

দুটো গাড়ির মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে নিকি। পিস্তল তুলে নিশানা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। কেবলই সরে সরে যাচ্ছে রোলস রয়েস।

নিকি যে পিস্তল তুলেছে চোখে পড়ে গেল মুসার। চেঁচিয়ে বললো, 'না না, গুলি করবেন না! জিনার গায়ে লাগতে পারে!'

'চাকায় লাগাতে চাইছি,' জবাব দিলো নিকি।

অবশেষে সুযোগ পেয়ে গেল সে। গুলি করলো, পর পর দু'বার। কিন্তু মিস করলো।

পাশ কাটালো রোলস রয়েস। গোটা চারেক গাড়ির ক্ষতি করে ছুটলো। এবার আর মুসা কিংবা নিকি কারও দিকেই এলো না। সোজা ছুটলো দরজার দিকে।

'বেরিয়ে যাচ্ছে! বেরিয়ে যাচ্ছে!' চিৎকার করে বললো মুসা।

'যাবে কোথায়? দরজা খুলতে হলে নামতে হবেই,' নিকি বললো। 'ক্যাঁক করে ধরবো তখন!'

কিন্তু গতি কমানোর কোনো লক্ষণই দেখালো না রোলস রয়েস। বরং বাড়ছেই। ভয়ানক শক্ত গাড়িটা। অনেক গাড়ির ক্ষতি করেছে বাড়ি মেরে, গুঁতো দিয়ে, কিন্তু নিজের তেমন একটা ক্ষতি হয়নি। কয়েক জায়গায় বডি কেবল দুমড়ে বসে গেছে, আর একটা বাম্পার বাঁকা হয়েছে, ব্যস।

'আরি!' অবাক হয়ে গেল নিকি। 'দরজা ভেঙে বেরিয়ে যাবে নাকি!'

নিচু গিয়ারে চলছে রোলস রয়েস। ঠিকই। দরজাই ভাঙতে চেয়েছে। জোরে গুঁতো লাগালো। মড়মড় করে ভেঙে গেল কাঠের দরজা, মস্ত একটা ফোকর হয়ে গেল নিচের দিকে। একটা গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

'খাইছে!' বলেই সেদিকে দৌড় দিলো মুসা। একছুটে বেরিয়ে গেল ফোকর দিয়ে গাড়িটার পিছু পিছু।

সোজা বেরিয়েছে রোলস রয়েসটা। এতো বেশি গতিতে, মোড় নেয়ার জায়গা পেলো না পুরোপুরি, লাগলো গিয়ে ওপাশের বেড়ার গায়ে। বেড়া ভেঙে নানারকম বিচিত্র শব্দ তুলে অবশেষে মোড় নিলো, আবার এসে উঠলো রাস্তায়।

ফিয়ারোর দিকে দৌড়ে চলেছে মুসা।

নিকিও দৌড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বললো, 'জলদি করো! নইলে ধরা যাবে না!'

কিন্তু ওরা গাড়িতে চড়ে স্টার্ট নেয়ার পরেও মোড়ের কাছেই পৌছতে পারলো না রোলস রয়েস। গুলি খাওয়া আহত হাঁসের মতো ঝাঁকি দিচ্ছে শরীর, এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে, যেন কোনো তাল পাচ্ছে না।

'খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়,' হাসলো নিকি। 'আর পালাতে হলো না…'

'না না, দেখুন!'

রোলস রয়েসের ভেতরে ধস্তাধস্তি চলছে।

'জিনা!' আবার বললো মুসা। 'ওকে থামানোর চেষ্টা করছে।' তার কথা শেষও হলো না, রোলস রয়েসের একপাশের দরজা খুলে গেল ঝটকা দিয়ে। রাস্তায় পড়ে গেল জিনা। শাঁ করে ছুটে চলে গেল গাড়িটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জিনা। সময়মতো সরিয়ে নিয়ে ফিয়ারোর ব্রেক কষতে না পারলে জিনার গায়েই গুঁতো মারতো গাড়ি। মুখ বের করলো মুসা, 'জিনা, ওঠো! ব্যাটাকে ধরতেই হবে!'

দরজা খুলে দিলো নিকি। উঠে পড়লো জিনা। আবার ছুটতে শুরু করলো ফিয়ারো।

তিন ব্লক পেরোতে না পেরোতেই নজরে চলে এলো রোলস রয়েস। মুসার চালানো দেখে নিকিও অবাক হয়ে গেল। কিছুই মানছে না মুসা, কোনো কিছুর পরোয়া করছে না, কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, তাকিয়ে রয়েছে রোলস রয়েসের দিকে। তার একমাত্র চিন্তা, যে করেই হোক ধরতে হবে সামনের গাড়িটাকে।

নির্জন রাস্তা ধরে ঝড়ের গতিতে ছুটছে দুটো গাড়ি।

যতো রকম ভাবে সম্ভব, চেষ্টা করে দেখছে রোলস রয়েসটা, কিন্তু কিছুতেই মুসাকে খসাতে পারলো না। অবশেষে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টাটা করলো গোয়েরা। ফ্রিওয়েতে পৌছতে চাইলো। বাঁয়ে একটা তীক্ষ্ণ মোড়, তারপরেই ফ্রিওয়েতে ওঠার প্রবেশপথ, একটা ওভারব্রিজের নিচ দিয়ে। একবার মনে হলো, সফল হয়ে গেল বুঝি।

কিন্তু মোড় নেয়ার সময় যেই গতি কমালো সে, অমনি শাঁ করে তার সামনে চলে এলো মুসা। পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো গোয়েরা। কিন্তু আরও চেপে এলো ফিয়ারো। পথ ছাড়লো না কিছুতেই। সাইডরোডে নেমে যেতে বাধ্য হলো রোলস রয়েস। সরতে সরতে এমন এক অবস্থায় চলে গেল, আর জায়গাই থাকলো না। আগে বাড়ারও উপায় নেই। থামতেই হলো ওটাকে।

চোখের পলকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিকি। একটানে খুলে ফেললো রোলস রয়েসের দরজা। কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলো গোয়েরাকে। ঠেলতে ঠেলতে এনে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিলো ফিয়ারোর পিছনের সীটে। নিজেও উঠে বসলো পাশে। গোয়েরার পিস্তল কোথায় কে জানে। হয়তো রোলস রয়েসেই রয়ে গেছে। তবে নিকির পিস্তলটা হাতে বেরিয়ে এসেছে। ঠেসে ধরলো গোয়েরার গলায়।

'চালাও,' মুসার পাশে থেকে বললো জিনা। 'এবার আস্তে চালাবে দয়া করে। যা চালান চালিয়েছো। আমি তো ভেবেছি ভর্তা হয়েই মরবো।'

হাসলো শুধু মুসা। গাড়ির মুখ ঘোরানোয় ব্যস্ত হলো।

আবার গ্যারেজে ফিরে এলো ওরা। বাইরে বেরিয়ে এসেছে সবাই। টিবুরন আর পিরানহারা অপেক্ষা করছে দরজার কাছে। বন্দীদেরকেও বের করে আনা হয়েছে। তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে রবিন। ওদের সাথে যোগ হলো আরও একজন, লিও গোয়েরা।

'পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো নিকি।

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'কিশোর ফোন করতে গেল এইমাত্র।'

জোরে একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল গ্যারেজের ভেতর থেকে। ছুটে গেল নিকি আর মুসা। গাড়ির সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। বেহুঁশ হয়ে যাবে যেন, এমনি ভাবভঙ্গি। ব্যাপার কি? তারপর বুঝতে পারলো ওরা ব্যাপারটা, যখন দেখতে পেলো।

'হোওা!' মুসা বললো।

অনেক গাড়ি নষ্ট করেছে গোয়েরা। তার মধ্যে রয়েছে কিশোরের নীল-শাদা গাড়িটা। চেনা যায় না আর।

'আমার গাড়ি!' কেঁদে ফেলবে যেন কিশোর। 'শেষ!'

তাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো নিকি আর মুসা। সান্ত্বনা দিতে লাগলো। নিকি বোঝাতে লাগলো, একবার যখন ভালো গাড়ি বের করে দিতে পেরেছে, আবারও পারবে। সময় পেলে এর চেয়ে ভালো জিনিস খুঁজে বের করে দেবে।

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই,' মুসা বললো। 'অতো ভেঙে পড়েছো কেন? তাছাড়া টাকাটাও তো আর মারা যায়নি। বীমা কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে যাবো।'

'আর আরও কিছু কাজ করবো আমরা সবাই মিলে,' নিকি বললো। 'যাতে কিছু বাড়তি পয়সা আসে। সেই টাকা তোমার পাঁচশো টাকার সঙ্গে যোগ করলে আরও ভালো গাড়ি কিনতে পারবো,' হাসলো সে। 'কিশোর, পুলিশকে ফোন করেছো?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'নাহ্। গাড়ির অবস্থা দেখে ভুলেই গেছি,' মলিন একটা হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'যাই হোক, নিকিভাই, আমার গাড়ি গেছে ক্ষতি নেই। আপনাকে তো নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়লাম।'

ফোন করা হলো।

রাস্তার দু'দিক থেকে হঠাৎ করেই যেন এসে হাজির হলো পুলিশের গাড়ি। পিস্তল হাতে লাফিয়ে নামলো কয়েকজন পুলিশ। দৌড়ে এলো বন্দিদের কাছে। সবার সামনে রয়েছেন জ্যাক কারলি আর সার্জেন্ট ডেনিস ডেনভার।

'সার্জেন্ট,' এগিয়ে গেল নিকি। 'হাতেনাতে বমাল ধরে দেয়া হলো আপনার আসামীদের। আশা করি এবার আমাকে মুক্তি দেবেন।'

মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো সার্জেন্ট। যেন নিকি খালাস পেয়ে যাওয়াতে খুশি হতে পারেনি।

তবে কারলি হাসলেন।

আর সেই সঙ্গে হাসি ফুটলো তিন গোয়েন্দার মুখে।

- ঃ শেষ ঃ -